Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বাধীনতা আন্দোলন, জিন্নাহ্ দেশ বিভাজন ও ভারতীয় মুসলমান

আবু রিদা
সম্পাদিত

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূচিপত্র

★ সম্পাদকীয় ৫

★ ভারতীয় জাতিতত্ত্ব

ভারতবর্ষ কি একটি জাতি, না বহুজাতির বাসভূমি? ♦ সুনীতি কুমার ঘোষ ৯

★ স্বাধীনতার আন্দোলনের সময়কালে

পাকিস্তান অথবা ভারত ভাগ ♦ বাবা সাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকর ১৩

★ জিন্নাহ্ ও ভারতীয় রাজনীতি

ভারতের রাজনীতিতে জিন্নাহ্‌র ছায়া ♦ সাইয়েদ শাহাবুদ্দীন ৩৭

★ জিন্নাহ্ ও দেশ বিভাজনের দায়

ভারত বিভক্তির জন্য কেবলমাত্র জিন্নাহ্‌কে দায়ী করা যায় না ♦ শত্রুঘ্ন কান্ত আচার্য ৪২

★ স্বাধীনতার সংগ্রামের মোড়ে মোড়ে জিন্নাহ্‌র পদচারণা

জিন্নাহ্ : রাজনীতির সন্ধিক্ষণে ♦ শ্যামাপ্রসাদ বসু ৪৭

★ জিন্নাহ্ ও ভারতীয় মুসলমান

ভারতীয় মুসলমান : ভারতবিভক্তি থেকে কাশ্মীর সমস্যা পর্যন্ত ♦ মেহদী বাকের ৬৭

★ ইতিহাসের আলোকে

জিন্নাহ্ ও নাগপুর কংগ্রেস ♦ অধ্যাপক আলাউদ্দীন আহমদ ৭১

★ মুসলিম লীগের উত্থান

নেহরু রিপোর্ট, সাম্প্রদায়িক জটিলতা এবং জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে মুসলিম লীগের উত্থান ♦ মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক প্রখ্যাত ইতিহাস রচয়িতা ৯৪

★ একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণা

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, অন্তবর্তী সরকার এবং কায়েদ-ই-আযম : একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণা ♦ আবুল হাশিম ১২৮

★ পরিশিষ্ট

শুরু হোক সংগ্রাম (১৯৪৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর প্রদত্ত প্রেসবিবৃতি) ১৫৩

★ জিন্নাহ্ ও সেকুলারিজম

জিন্নাহ্‌কে ইতিহাসের রূপকার ও সেকুলার আখ্যা দেওয়া ভুল নয়

♦ বেদ প্রতাপ বেদকর ১৬১

★ দেশ বিভাজনের দায়

উপমহাদেশের বিভক্তির দায়ভার বর্তায় কার ওপর কতটা?

♦ গুলামুল হুসনাইন কাইফ নূপানভী ১৬৫

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

★ দেশ বিভাজনের দায়

ভারত বিভক্তির দায় কার? ♦ এম. এ. বারী খান ১৬৯

★ জিন্নাহ্ ও সংঘ পরিবার

আদবানী, জিন্নাহ্ এবং ভারতীয় মুসলমান ♦ মাওলানা মুহাম্মদ ইসরারুল হক কাসেমী ১৭৪

★ ইসলাম ও দেশবিভক্তি

দেশভাগের জন্য ইসলামকে দায়ী করা এক মারাত্মক অভিসন্ধি

♦ গুলামুল হুসনাইন কাইফ নূগানভী ১৭৭

★ জিন্নাহ্ ও পাকিস্তানের অবস্থান

কায়েদ-ই-আযমের উদ্দেশ্য কি ছিল সেকুলার পাকিস্তান? ♦ জঙ্গ, করাচী-র প্রতিবেদন ১৮৪

★ দেশবিভক্তি ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংখ্যালঘু সমস্যা

দেশ বিভাজন, অনুপ্রবেশ, আসাম আন্দোলন : ৯০ বছরের সংখ্যালঘু রাজনীতি

♦ দীপঙ্কর নাথ চৌধুরী ১৮৮

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্পাদকীয়

১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশে পাকিস্তান নামক একটি নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টির পরে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ 'খলনায়ক' হয়েই ছিলেন অধিকাংশ সাধারণ ভারতীয়ের কাছে। কিন্তু ১৯০৫ সালে সংঘ পরিবারভুক্ত ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী কিছু অপ্রিয় সত্য কথা (যা তিনি এতদিন মুখে স্বীকার করতেন না, বরং এর বিপরীতটাই প্রচার করতেন অত্যন্ত জোরেসোরে) জিন্নাহ্ প্রসঙ্গে বলেন পাকিস্তান সফরে গিয়ে। আদবানীর এইসব মন্তব্য ছিল যেন চাকে খোঁচা দিয়ে ভীমরুলকে উন্মত্ত করে তোলার নামান্তর। বিরাট ধাক্কা খায় এতদিনের সুপরিকল্পিত পন্থায় প্রচারিত সংঘ পরিবারের মতবাদ এবং দারুণ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে তাদের সযত্নলালিত ধ্যান-ধারণা ফলে হৈচৈ পড়ে যায় সংঘ পরিবারের সংসারে। আদবানীকে তুলোধনা করতে থাকেন সংঘ পরিবারের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা। দেশজুড়ে মিডিয়ায় শুরু হয় ব্যাপক বিতর্ক, এই বিতর্কে পিছিয়ে থাকেনি পাকিস্তানের মিডিয়া। এই বিতর্কই এই সংখ্যার মূল প্রেরণা।

জিন্নাহ্ চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে জিন্নাহ্র সমসাময়িক কালের কিছু মনীষীর মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক :

- "হিন্দু মুসলিম ঐক্যের অগ্রদূত হিসাবে সরোজিনী নাইডু তাকে মুসলিম গোখলে বলে আখ্যায়িত করেন।"
- "১৯১৭ সালে ভারত সচিব মন্টেগু জিন্নাহ্র বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর ডায়েরিতে লেখেন, কী ভীষণ অন্যায় যে, এইরূপ একজন ব্যক্তিকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র পরিচালনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।"
- "ছিপছিপে গড়নের দীর্ঘদেহধারী কায়েদ-ই-আযমের আকর্ষণীয় চেহারা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সরোজিনী নাইডুর মন্তব্য, 'রাজকীয় অভ্যাস, অভিজাত চালচলন ও স্বীয় নীতিতে অটল ব্যক্তিত্ব।'
- "বেভারলী নিকলাস Verdict on India গ্রন্থে জিন্নাহ্কে 'এশিয়ার সর্বাধিক মনোযোগ আকর্ষণকারী ব্যক্তিত্ব' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
- "স্যার আগা খান তাঁর Memoris-এ লিখেছেন : "আমি আমার জীবনে চার্চিল, লয়েড জর্জ, মুসোলিনী ও গান্ধীর ন্যায় বড় বড় রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে মিলিত হয়েছি। কিন্তু জিন্নাহ্কে তাঁদের সকলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে পেয়েছি।"
- "প্রখ্যাত ইংরেজ চিন্তাবিদ স্যার স্ট্যাফার্ড ক্রিপস বর্ণনা করেছেন এভাবে :

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"মিস্টার জিন্নাহ্ তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা নীতির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের নমনীয়তা বরদাশত করতে পারতেন না। নিজ মতাদর্শের ওপর তিনি যেরকম কাঠোরভাবে অবিচল থাকতেন তা হতে এক অসাধারণ সাবধানতা ও চিন্তার কথাই মনে পড়ে যার দ্বারা তিনি ভারতীয় মুসলিমদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে নিয়োজিত ছিলেন এবং যার ভিত্তিতে তিনি কায়মনোবাক্যে চাইতেন যে, দেশের দূর-দূরান্তে বিচ্ছিন্নভাবে বাসরত এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পূর্ণ রাজনৈতিক নিরাপত্তা যেন অর্জিত হয়। এটা তার ইস্পাত কঠিন দৃঢ়চিত্ততারই ফসল যে, তিনি পরিস্থিতির সকল প্রতিকূলতা জয় করে নিজের জাতিকে স্বাধীনতার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন। অত্যধিক সাহসিকতা ও দৃঢ়তা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।"

- "ইংরেজ দৈনিক হিন্দুস্তান টাইমস-এর সম্পাদকীয়তে সেসময় মন্তব্য করা হয় : 'স্বীকার করতেই হবে যে, তার দৃঢ়চিত্ততার সামনে বাস্তব প্রতিকূলতা শূন্যে মিলিয়ে গেছে এবং একটি স্বপ্ন বাস্তব রূপ ধারণা করে পৃথিবীর সামনে হাজির হয়েছে। তিনি শক্তিশালী ইচ্ছা ও নির্ভেজাল মনোবাসনার অধিকারী ছিলেন। ইতিহাস তাঁকে কখনই ভুলতে পারবে না। কারণ তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।"
- "ফাতিমা জিন্নাহ্র ভাষায় : 'কায়েদ-ই-আযম জীবনের সকল যুদ্ধ দৃঢ় সংকল্প, উচ্চ মন ও সাহসিকতার সঙ্গে একাকী পরিচালনা করেছেন। তিনি যা সঠিক মনে করতেন তার জন্য তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টাকে এবং সেটা অর্জন করতে তাকে কোনো কিছুই বিচ্যুত করতে না পারাকে স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা ভুলক্রমে জিদ বা হটকারিতা মনে করত। তার দৃঢ়তা এত উচ্চ ছিল যে, তিনি তাঁর শোকে ও দুঃখে কাকেও অংশীদার করতে পছন্দ করতেন না। ধৈর্য, স্থৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে সমস্ত আপদ-বিপদের একাকী মুকাবিলা করতেন।"

এসব হলো খোদ জিন্নাহ্র সমসাময়িক কালের মনীষীদের কথা। পরবর্তীকালের কিছু বিশ্লেষক ও গ্রন্থকারের মতামত এবার উদ্ধৃত করা যাক জিন্নাহ্ ও দেশবিভাগ প্রসঙ্গে।

- প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা পণ্ডিত সুন্দরলাল-এর মতে : 'অনেকে গভীর বিস্মিত হবেন, এমনকী অনেকে বিশ্বাস পর্যন্ত করতে পারবেন না যে, মি. জিন্নাহ্ দেশভাগের পক্ষে ছিলেন না, দেশভাগ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর ওপর।'
- উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মি. চরণ সিং তাঁর একটি ভাষণে উল্লেখ করেন, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য আপনারা মুসলিমদের দায়ী করেন। কিন্তু বস্তুতপক্ষে মুসলিমদের চেয়ে আপনাদের হিন্দুদের ওপর এ দায় বর্তায়

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেশি করে। জাতপাতের অভিশাপ গেড়ে আছে আপনাদের মধ্যে গভীরভাবে। যখন মুসলিমরা দেখল যে, আপনারা নিজেদের হিন্দুভাইদের সঙ্গেই অস্পৃশ্য আচরণ করেন, তাদেরকে ঘৃণা করেন, স্বজনদের প্রতিও ইনসাফ করেন না—তখন তাদের মধ্যে এ আশঙ্কাও সৃষ্টি হয় যে স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ায় পরে আপনারা ইনসাফ করবেন না মুসলিমদের প্রতিও। এটা ছিল আপনাদের অসদাচরণ, আর এটাই ছিল পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য দায়ী।'

প্রসিদ্ধ আইন বিশারদ, শিক্ষাবিদ এবং দেশপ্রেমিক চমনলাল সিতলবাদ মন্তব্য করেন : 'পাকিস্তানের জন্মের আসল সম্পর্ক কংগ্রেসের সঙ্গে। কংগ্রেস যেভাবে সাম্প্রদায়িক বিষয় পরিচালনা করেছে, যখন ক্ষমতায় এসেছে তখন তারা যেমন আচরণ করেছে, তাতে মুসলিমদের মনে গভীর অনাস্থার সৃষ্টি করে। ১৯৩৫-এর অ্যাক্টের অধীনে যখন কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হয় তখন তারা দুঃখজনক হটধর্মীতা প্রদর্শন করে। তারা মুসলিমদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে এবং তাদেরকে শত্রুভাবাপন্ন করে তোলে।'

- জনৈক বিজেপি নেতার মতে : 'মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ছিলেন একজন কক্ষচ্যুত দেবদূত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা হওয়ার সকল যোগ্যতা তাঁর ছিল, কিন্তু তিনি কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ করলেন হয়তো কুরবানীর বকরী হওয়ার নিমিত্তেই।'

উপরোক্ত মতামতসমূহেরই বিচার-বিশ্লেষণ এই সংখ্যার পাতায়-পাতায়। সেসব থেকেই আসল সত্যকে গ্রহণ করতে হবে।

জিন্নাহ্র বাহ্যিক আচার-আচরণের প্রতি অনেকেই আঙুল তোলেন। যেমন তিনি মদ ও শুয়োরের মাংস খেতেন, নামায-রোযায় অভ্যস্ত ছিলেন না ইত্যাদি। কিন্তু এসব অভিযোগ কতদূর সত্য তা এখনো গবেষণার বিষয়। কারণ লন্ডন যাওয়ার আগে তাঁর প্রায় সব শিক্ষায়ই অর্জিত হয়েছে ইসলামী মাদ্রাসায়, ইসলামী আদর্শ বিচ্যুত যাতে না হন সেজন্য লন্ডন গমনের পূর্বেই তাঁকে বিয়ে দেওয়া হয় অল্প বয়সে, মুসলিম আইন ও জীবনবিধানের জন্য তিনি এক আল্লাহ ও এক কিতাবের কথা বলতেন, ব্রিটিশ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রথম সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পরে তিনি যে আওকাফ বিল প্রণয়ন করেন তা তাঁর ইসলামী ফেকাহ্র গভীর গবেষণার ফসল এবং আরও এই ধরনের বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। এসব ঘটনাক্রম উপরোক্ত অভিযোগসমূহকে সমর্থন করে না। ইতিহাসস্বীকৃত উন্নত চরিত্রের মানুষ হয়েও আওরঙ্গজেব ও টিপু সুলতানের ব্যক্তিচরিত্রে কম কলঙ্ক লেপিত হয়নি। জিন্নাহ্কে যে দ্বিতীয় আওরঙ্গজেব ও টিপু বানানো হয়নি তার নিশ্চয়তা কোথায়?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই সংখ্যায় পরিশ্রমসাধ্য উপাদানসমূহ সংগ্রহ করতে অনেক বিলম্ব হয়ে যায়। 'তালীম'-এর ধারাবাহিকতায় কিছুটা ছেদ পড়ে। তাই এ সংখ্যাটি বিশেষ যৌথ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হল।

আল্লাহ্ আমাদের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ করুন।

আবু রিদা

কলকাতা

১০.৫.২০০৫

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভারতবর্ষ কি একটি জাতি, না বহুজাতির বাসভূমি?

সুনীতি কুমার ঘোষ

প্রথম প্রশ্ন, ভারতবর্ষ কি একটি জাতি, না বহুজাতির বাসভূমি? ইতিহাস বলে অতীতে কখনো ভারতীয় জাতি বলে কোনো জাতির অস্তিত্ব ছিল না; ভারতবর্ষ কখনো একটি দেশ ছিল না। তার দীর্ঘ ইতিহাসে মৌর্য, গুপ্ত ও মোগল সাম্রাজ্যের উদয় হয়েছে কিন্তু সেইসব সাম্রাজ্য সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত ছিল না; এবং দীর্ঘকাল স্থায়ীও হয়নি। এক রাজবংশের পতনের সাথে সাথে এক একটি সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়েছে। এইসব সাম্রাজ্যের মধ্যেও বিরাট বিরাট অঞ্চল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে পৃথক অস্তিত্ব ও শাসন বজায় রেখেছে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের কোনও এক ভাষা ছিল না বা নেই—যে ভাষা তাদের এক জাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারত। কার্ল মার্কস বলেছেন, 'ব্রিটিশ তরবারি ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে দিয়েছে। তাও ব্রিটিশ ভারত' নামে বেশির ভাগ অংশ ইংরেজরা সরাসরি শাসন করত। বাকি ভারত প্রায় ৫৬২টা ছোট-বড় দেশীয় রাজ্যে বিভক্ত হয়ে ইংরেজের আজ্ঞাবহ দেশীয় রাজাদের দ্বারা শাসিত হত। কোনও যুগেই জনগণের মধ্যে সামগ্রিক ঐক্যবোধ ছিল না এবং এখনো নেই। জনতত্ত্ব (Ethinically) এবং ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে পশ্চিম য়ুরোপের জাতিগুলির মধ্যে যে ব্যবধান আছে তার থেকেও বেশি ব্যবধান আছে একজন ওড়িয়া ও পাঞ্জাবীর মধ্যে, একজন তেলেগু ও রাজস্থানীর মধ্যে।

ব্রিটিশ শাসন শুরু হবার আগেই ভারতবর্ষে কতকগুলি জাতিসত্তা—তামিল, তেলেগু, বাঙালি, মারাঠি, গুজরাটী ইত্যাদি প্রত্যেকে তার নিজস্ব অঞ্চলে, নিজস্ব জনতত্ত্বগত (Ethinic) বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব জীবনচর্যা, নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ঐক্যবোধ নিয়ে গড়ে উঠেছিল। জাতিগঠনের যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ভারতবর্ষে চলছিল তা ব্রিটিশ আমলে ব্যাহত হয়। বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলকে ব্রিটিশরাজের শাসন পরিচালনার স্বার্থে ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে অন্য ভাষাভাষী অঞ্চলের অংশের সঙ্গে এবং দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। যেমন, তামিল এবং তেলেগু, কানাড়ি ও মালয়ালমভাষী কম-বেশি অঞ্চল নিয়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়। আবার হায়দারাবাদ দেশীয় রাজ্যের মধ্যে ছিল তেলেগু-ভাষীদের একটা বড় অংশ এবং তার সাথে মারাঠি ও কানাড়িভাষী অঞ্চল। প্রত্যেক জাতিসত্তা বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। বাংলা থেকে বাংলাভাষী শ্রীহট্ট (সিলেট) ও অন্যান্য কিছু কিছু অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এক জাতিসত্তার মানুষদের মধ্যে যাতে জাতীয়তাবোধ না জন্মায় সেটাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি ছিল। আমরা দেখব এই উদ্দেশ্যেই ১৯০৫ সালে বাংলাকে ভাগ করা হয়েছিল।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সময়ে এবং তার প্রত্যক্ষ অবসানের পরে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী শাসকশ্রেণীদের অত্যাচারের ফলে অনেক জাতিসত্তা যারা আগে সুপ্ত ছিল তারা আজ জেগে উঠেছে বা উঠছে। কাশ্মিরী উন্মেষ দেখা যায় ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ অবসানের আগেই।[১] সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহী ভারতীয় শাসকশ্রেণীদের সম্প্রসারণবাদী নীতি, আক্রমণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বিভিন্ন নাগা কোমগুলিকে (tribes) একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্তায় পরিণত করেছে। তেমনি মণিপুরী, মিজো প্রভৃতি জাতিসত্তা উত্তর-পূর্ব ভারতে দেখা দিয়েছে।

'নিখিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদে'র তত্ত্ব ভারতের শাসকশ্রেণীদের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজনীয়। ভারতের শাসকশ্রেণী চেয়েছে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র (unitary state), তারা চেয়েছে একটি শক্তিশালী কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন জাতিসত্তাকে শাসন, দমন ও শোষণ করতে। ১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে ভারতের যে সংবিধান তারা গ্রহণ করে সে সংবিধান-অনুযায়ী ভারতরাষ্ট্র আজ বিভিন্ন জাতিসত্তার কারাগার। এই সংবিধান রচনার সময়ে সাংবিধানিক উপদেষ্টারা (constitutional advisers) তাঁদের তৈরি খসড়া সংবিধানে ভারতরাষ্ট্রকে 'ভারত যুক্তরাষ্ট্র' (federation of India) আখ্যা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সেই প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। শাসকশ্রেণীর নির্দেশে সংবিধানে 'ইন্ডিয়া'র নাম হল ভারত রাষ্ট্রসংঘ (Union of States)। 'ফেডারেশন'-এর অর্থ রাজ্যগুলি স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করেছে এবং নির্দিষ্ট কিছু শাসনসংক্রান্ত বিষয় বা ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের হাতে অর্পণ করছে, বাকি সমস্ত বিষয় তাদেরই কর্তৃত্বে থাকবে। রাজ্যগুলির সমস্ত অধিকার সংবিধানে খর্ব করা হয়েছে। সংবিধান রচনার সময়ে প্রস্তাব ছিল যে, রাজ্যের গভর্নর সেই রাজ্যের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। নেহেরু কর্তৃক সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। তার পরিবর্তে সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র গভর্নর নিয়োগ করে এবং সেই গভর্নরের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রে রাজ্যের নির্বাচিত আইনসভা ও মন্ত্রীসভাকে বাতিল করে দিতে পারে। শুধু গভর্নর নয়, বিভিন্ন রাজ্যের শাসনবিভাগে, বিচারবিভাগে এবং পুলিশবিভাগে উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা কেন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তারা কেন্দ্রের কাছেই জবাবদিহি করতে বাধ্য। সামরিক বাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী কেন্দ্রেরই শাসনাধীনে। বিভিন্ন রাজ্যের অর্থনৈতিক জীবনকেও পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার কেন্দ্রের আছে। কেন্দ্র রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত পরিবর্তন করতে পারে। আমরা এই সংবিধানের বিস্তৃত আলোচনায় যাব না।

'সমস্ত ভারতীয়রা এক জাতি' এই তত্ত্বের সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয় যে তাদের একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। রুশ লেখক ডায়াকোভ সঠিকভাবে মন্তব্য করেছিলেন যে the common cultural fund that has developed in India "is no greater than the common cultural fund of the different peoples of Europe, of the Far East and of the Middle East"[২] অর্থাৎ, ভারতের জনগণের যে একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে য়ুরোপের অথবা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দূরপ্রাচ্যের বা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জাতিদের যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে য়ুরোপের অথবা দূরপ্রাচ্যের বা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জাতিদের যে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার তার থেকে বেশি নয়। একজন রাজস্থানীর সংস্কৃতি ও একজন বাঙালির সংস্কৃতি, এ দুয়ে কিছু মিল থাকতে পারে কিন্তু অমিলটাই প্রধান। একজন ইংরেজ ও একজন জার্মান বা ওলন্দাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিল এর থেকে বোধহয় বেশি।

ভারতের সংবিধানে দেবনাগরী লিপিসহ হিন্দিকে যখন সমস্ত ভারতীয় জাতিসত্তার উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়[৩] তখন সংবিধান সভায় কংগ্রেসেরই দীর্ঘকাল কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, মহারাষ্ট্রের নেতা, শঙ্কররাও দেও বলেছিলেন : "... আর.এস.এস. (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ)-এর সর্বোচ্চ নেতা সংস্কৃতির নামে আবেদন করেন, কিছু কংগ্রেসীরাও সংস্কৃতির নামে আবেদন করেন। কেউ বলেন না যে এই 'সংস্কৃতি' শব্দটার অর্থ কি। আজ যেভাবে এর ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এবং বোঝা যাচ্ছে এর একমাত্র অর্থ হচ্ছে বহুর উপর মুষ্টিমেয়র আধিপত্য।"[৪] ডায়াকোভও বলেছিলেন, "একজাতি তত্ত্ব" ("one national concept") ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয়দের, প্রধানত গুজরাট ও মাড়োয়ারের পুঁজিপতিদের, কেন্দ্রমুখীনতার প্রকাশ। এই পুঁজিপতি গোষ্ঠী ভারতের বাজারের উপর আধিপত্য করার একচেটিয়া অধিকার চায়।"[৫]

ভারতের শাসকশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক প্রতিনিধিরাও জানতেন যে ভারতীয়রা 'এক জাতি' নন। তাঁরা স্বীকার করে গেছেন যে, ভারতীয় জাতির অস্তিত্বই নেই, তাঁদের মতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণের মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যদি এমন কোনও জাতি জন্ম নিয়ে থাকে তবে তার সবে অঙ্কুরোদগম হয়েছে। পুরনো বিভিন্ন জাতিসত্তাগুলিকে নির্মূল অথবা খর্ব করে এই ক্ষুদ্র চারাটির গোড়ায় জলসেচন ইত্যাদি করে একে ক্রমশ মহীরুহে পরিণত করতে হবে, এই দায়িত্ব নিয়েছিলেন তারা।[৬] নিখিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধ্বজা যিনি সবচেয়ে উচ্চে তুলে ধরেছিলেন সেই পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ১০ মে ১৯৫৬-তে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে চিঠিতে লিখেছিলেন যে, "মৌলিক সত্য হচ্ছে আমাদের এখনও ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে তোলা বাকি আছে।"[৭] আমরা দেখব, হিন্দু ও পার্শি বড় বুর্জোয়ার ও অন্যান্য সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রতিনিধি কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব যেমন নিখিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধ্বজা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল তেমনি তার পালটা মুসলিম বড় বুর্জোয়া ও অন্যান্য সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রতিনিধি মুসলিম লীগ ১৯৪০ সাল থেকে 'নিখিল ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধ্বজা ওড়াল। এই দুই জাতীয়তাবাদের লড়াইয়ে যে গরল উঠল তার ফলে ভারত ভাগ হল, বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ হল।

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক ফ্রাঙ্ক মোরেস বলেছিলেন : "ভারতবর্ষের ঐক্য যদি কৃত্রিম ছিল তো ভারতবর্ষের বিভাগও তাই। ভারতবর্ষ যদি বিভক্তই হতে হয় তবে জনতত্ত্বগত (ethnic) এবং সাংস্কৃতিক সংহতি ও ভাষার ভিত্তিতে যুক্তিসম্মতভাবে ভাগ হওয়া উচিত ছিল।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তথ্যসূত্র :

১. SWN, XV, 367 and fn 6; also 366, fn 3; A.C Bose "J and K's Accession- II", The Statesman, 20 Dec. 1995; see also Sunit Kumar Ghosh, India's Nationality Problem and Ruling Ckasses, 32-5

২. See Sarat Chandra Bose, "A Constitution of Myths and Denials", Indian Law Review, Jan. 1950 (reprinted in Sarat Chandra Bose Commemoration Volume); also Ghosh, op cit, 26-30

৩. A. M. Diakov, The National Question and British Imperialism in India (in Russian), Moscow, 1948, 47; cited in Selig S. Harrison, India : The Most Dangerous Decades, 157.

৪. See Ghosh, op cit, 39-40.

৫. Constituent Assembly Debates, IX. No. 33, p. 1430; cited in Selig Harrison, op cit, 283.

৬. Diakov, op cit, cited in Harrison, op cit, 158

৭. GOI, Report of the Linguistic Provinces Commission 1948, Delhi. 1948, 67-9; Report of the States Reorganization Commission. 1955, Delhi, 1955, 16, 43; see also Ghosh, op cit, 12-5

৮. Cited in S. Gopal, Jawaharlal Nehru, II, 267.

৯. Frank Moraes, Witness to an Era, 295.

'বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি রাজনীতি' থেকে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাকিস্তান অথবা ভারত ভাগ

বাবা সাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকর

বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর রচনাসম্ভারের অধ্যাপক আশিস সান্যাল লিখেছেন, "ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রাক্ মুহূর্তে যে ভয়ংকর উত্তাল উন্মাদনায় সমগ্র ভারত কম্পিত হচ্ছিল, তার এক আশ্চর্য বিশ্লেষণ ড. আম্বেদকরের 'পাকিস্তান অথবা ভারতভাগ' গ্রন্থটি। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নৈবর্ক্তিক দৃষ্টিতে বিষয়টির বিচার করেছেন। অনেকে হয়তো তার সঙ্গে একমত না-ও হতে পারেন। কিন্তু তিনি যে সব সমস্যাকে তুলে ধরেছেন, তার প্রাসঙ্গিকতা এখনও অস্বীকার করা যায় না।" এই গ্রন্থ থেকে আমরা নীচের যে অংশটি তুলে ধরেছি তা সত্যসত্যিই প্রাসঙ্গিক একালে এবং সেকালেও—সেই বিংশ শতাব্দীর ৩০-৪০ দশকে। সেই সময়ে পাকিস্তান বিতর্কের যে বাস্তব সত্য তিনি তুলে ধরেছেন তা অনেকে উপলব্ধি করতে পারেননি, অনেকে উপলব্ধি করেও বিরোধিতা করেছেন, অনেকে উপলব্ধি করেও স্বীকার করেননি, আবার অনেকে উপলব্ধি করার চেষ্টা পর্যন্ত করেননি। অথচ ড. আম্বেদকর বিশ্ব-রাষ্ট্রবিদদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দর্পণে উজ্জ্বল সত্যকে উন্মোচিত করেছেন। এককথায়, ৩০-৪০ দশকে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত পাকিস্তান বিতর্কের বাস্তব পরিস্থিতি ও নির্মোহ সত্য উপলব্ধি করার এক ঘনিষ্ঠতম সহায়ক ড. আম্বেদকরের এই রচনাংশটি।

—সম্পাদক

লীগ কী দাবি করছে?

এক

১৯৪০ সালের ২৬ মার্চ হিন্দু ভারত যেভাবে চমকে উঠেছিল, তেমন আর কোনও দিন হয়নি। ওইদিন মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়—

'১. সংবিধানগত প্রশ্নে সারা ভারত মুসলিম লীগে'র কাউন্সিল ও ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩৯-এর ২৭ আগস্ট, ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর, ২২ অক্টোবর এবং ১৯৪০-এর ৩ ফেব্রুয়ারি যে সিদ্ধান্তে এসেছে, তাতে সম্মতি জানিয়ে সারা ভারত মুসলিম লীগে'র এই অধিবেশন পুনরায় জানাচ্ছে যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বর্ণিত যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা এ দেশের বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে অযোগ্য ও অচল এবং তা মুসলমান ভারতের কাছে কোনও মতেই গ্রহণযোগ্য নয়'।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'২. অধিবেশন জোর দিয়ে আরও জানাচ্ছে যে, মহামান্য সম্রাটের সরকারের পক্ষে ভাইসরয় ১৯৩৯ সালের ১৮ অক্টোবর যে ঘোষণা করেছেন তা স্বস্তিকর এই কারণে যে তিনি জানিয়েছেন, যে নীতি ও পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে 'ভারত শাসন আইন' ১৯৩৫ রচিত, সেগুলি পুনর্বিবেচিত হবে ভারতের নানা দল, স্বার্থ ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে। কিন্তু মুসলমান ভারত সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না সমস্ত সংবিধানগত পরিকল্পনাটি আগাগোড়া পুনর্বিবেচিত হচ্ছে এবং কোনও সংশোধিত পরিকল্পনাই মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না এতে তাদের সম্মতি থাকে'।

'৩. সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে যে, সারা ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের সুবিবেচিত মতামত হল—কোনও সাংবিধানিক পরিকল্পনাই এ-দেশে কার্যকরী হবে না বা মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না এই মূল নীতিগুলি তার ভিত্তি হয়—যেমন ভৌগোলিকভাবে সংলগ্ন এলাকাগুলিকে নিয়ে অঞ্চল গঠন করা হচ্ছে এবং গঠন এমন হবে যাতে সংখ্যার দিক থেকে যেখানে মুসলমানরা বেশি, যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চল, তাদের একত্র করে 'স্বাধীন প্রদেশ' গঠিত হবে এবং প্রতিটি এলাকা স্বশাসিত এবং 'সার্বভৌম হবে'।

'৪. সংবিধানে সংখ্যালঘুদের জন্যে যথেষ্ট, কার্যকরী ও আবশ্যিক রক্ষাকবচ নির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করতে হবে, যাতে প্রতি এলাকায় তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে রক্ষিত হবে; ভারতের অন্য অংশে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু, সংবিধানে তাদের এবং অন্য সংখ্যালঘুর জন্য যথেষ্ট কার্যকরী ও আবশ্যিক রক্ষাকবচ নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে তারা তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ তাদের সঙ্গে আলোচনা মতো রক্ষিত হয়'।

'৫. এই অধিবেশন ওয়ার্কিং কমিটিকে পুনরায় এই দায়িত্ব অর্পণ করছে যে, তারা এই নীতিগুলির ওপর ভিত্তি করে সংবিধানের একটা প্রকল্প গঠন করবে, এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলি যাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, যোগাযোগ, শুল্ক এবং এরকম সব ব্যাপারে সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিতে পারে তার ব্যবস্থা থাকবে'।

এই সিদ্ধান্তের পেছনে কোন চিন্তা-ভাবনা কাজ করছে? তিন নম্বর অনুচ্ছেদে দেখা যাচ্ছে যে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, মুসলমান-প্রধান এলাকাগুলিকে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করতে হবে। স্পষ্ট ভাষায়, এর অর্থ হল পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিমের বেলুচিস্তান ও সিন্ধু এবং পূর্বের বাংলা ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশ না হয়ে তার বাইরে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হবে। এই হল মুসলিম লীগের সিদ্ধান্তের মূল কথা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এসব এই মুসলমান প্রদেশগুলি আলাদা ও স্বাধীন হিসাবে পরিগণিত হওয়ার পর একেকটি স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে, না সেগুলি মিলিতভাবে একটা রাষ্ট্র হবে, এ-ভাবনা সিদ্ধান্তে আছে কি?

এই ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্তটি পরস্পরবিরোধী না হলেও অস্পষ্ট। অঞ্চলগুলিকে স্বাধীন রাষ্ট্রে 'যেখানে অন্তর্গত অংশগুলি স্বশাসিত ও সার্বভৌম হবে' সেখানে পরিণত করা হবে। এখানে 'কন্সিটিউয়েন্ট ইউনিটস' বলতে বোঝায় যে একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণা। তা যদি হয় তবে এই ইউনিটগুলিকে 'সার্বভৌম' বলা অর্থহীন। অংশগুলির যুক্তরাষ্ট্র এবং অংশগুলির সার্বভৌমত্ব হল পরস্পরবিরোধী। এমন হতে পারে যে, একটা যৌথ রাষ্ট্রের (Confederation) কথা ভাবা হয়েছে। যাই হোক, এই মুহূর্তে এটা ভাবা অর্থহীন নয় এই স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি আমেল (Federation) তৈরি করবে, না যৌথ রাষ্ট্র তৈরি করবে। যা জরুরি, তা হল মূল দাবিটি—অর্থাৎ এই অংশগুলি ভারত থেকে বিযুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

সিদ্ধান্তের ভাষা এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে এই ধারণা হতে পারে যে, পরিকল্পনাটি খুবই নতুন। কিন্তু কোনও সন্দেহই নেই যে, সিদ্ধান্তে যে পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে তা আসলে ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে লখনউতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত স্যার মহম্মদ ইকবালের সভাপতি ভাষণের প্রতিধ্বনি। পরিকল্পনাটি সেই অধিবেশনে মুসলিম লীগ গ্রহণ করেনি। প্রস্তাবটিকে অবশ্য জনৈক মিস্টার রেহমত আলি কর্তৃক 'পাকিস্তান' নাম দেওয়া হয়েছিল, আর এই নামেই এটি এখন পরিচিত হয়েছে। মিস্টার রেহমত আলি, এম.এ., এল.এল.বি., পাকিস্তান আন্দোলন শুরু করেন ১৯৩৩ সালে। তিনিই ভারতকে দু'ভাগে, যথা পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান হিসাবে ভাগ করেন। তাঁর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান। দেশের বাকিটা ছিল তাঁর কাছে হিন্দুস্তান। তাঁর ধারণায় 'একটি' স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পাকিস্তান' গঠিত হবে উত্তরের পাঁচটি মুসলমান প্রদেশ নিয়ে। 'গোল টেবিল বৈঠকে'র সদস্যদের কাছে এই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সরকারিভাবে তা পেশ করা হয়নি। মনে হয় ব্যক্তিগত পর্যায়ে একটা চেষ্টা করা হয়েছিল যাতে ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন পাওয়া যায়। কিন্তু সরকার এই প্রস্তাব বিবেচনা করতে রাজি হয়নি কেননা, তাদের মনে হয়েছিল এর ফলে 'পুরনো মুসলমান সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান' ঘটবে।

এক্ষণে মুসলিম লীগ এই পুরনো পরিকল্পনাটিকেই বিশদভাবে পেশ করেছে। তারা পূর্বে আরও একটি মুসলমান প্রদেশ তৈরি করতে চেয়েছে যাতে বাংলা ও অসমের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কেবল এই বিষয়টি ছাড়া, প্রস্তাবটিতে আর যা বলা হয়েছে তা মূলগতভাবে এবং পরিকল্পনার কাঠামোর দিক থেকে স্যার মহম্মদ ইকবালেরই প্রস্তাব, যা রেহমত আলি প্রচার করেছেন। পূর্বের এই নতুন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলমান প্রদেশের কোনও নাম দেওয়া হয়নি। মিস্টার রেহমত আলির আদর্শের তত্ত্ব ও বিষয়গুলির দিক থেকে এর ফলে কোনও পার্থক্য ঘটেনি। মুশকিল হল এই যে, বিষয়কে বৃহৎ করতে গিয়ে মুসলিম লীগ দুটি মুসলমান প্রদেশের নামকরণও করেনি, যা উচিত ছিল। ফলে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের গালভরা ও চোয়াল-ব্যথা-করা নাম— পশ্চিমের মুসলমান রাজ্য ও পূর্বের মুসলমান রাজ্য বলে কাজ চালাতে হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানে আমার প্রস্তাব হল, দ্বিজাতি-তত্ত্বের আদর্শে গড়া পাকিস্তান নাম বজায় রেখে এবং ফলাফল হিসাবে ভারত ভাগ মেনে নিয়েই আমরা উত্তর পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বের দুই মুসলমান প্রদেশকে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান নামে ডাকতে পারি।

পরিকল্পনাটি হিন্দু ভারতকে শুধু মনোযোগী করেনি, বড় ধাক্কাও দিয়েছে। এখন এই প্রশ্ন করা স্বাভাবিক— এই পরিকল্পনার মধ্যে নতুন ও ধাক্কা দেওয়ার মতো কী আছে?

দুই

উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলিকে সংযুক্ত করার ধারণাটি কি খুব-ই ধাক্কা দেওয়ার মতো? তা হলে মনে রাখা দরকার যে, এই প্রদেশগুলিকে একত্র করার প্রকল্প খুবই পুরনো—অনেক ভাইসরয়, প্রশাসক ও সেনাধ্যক্ষরা আগেই এমন ভেবেছেন। উত্তর-পশ্চিমের পাকিস্তানি প্রদেশগুলির মধ্যে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১৮৪৯ সালে ব্রিটিশরা পাঞ্জাব দখলের সময় থেকে একই ছিল। এই দুটি প্রদেশ ১৯০১ সাল পর্যন্ত একটাই প্রদেশ ছিল। ১৯০১ সালেই লর্ড কার্জন তাকে দুটিতে বিভক্ত করে। আর পাঞ্জাবকে সিন্ধুর সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই যে, পাঞ্জাব দখলের আগেই সিন্ধু দখল না হয়ে যদি পরে হত, তবে সিন্ধুও পাঞ্জাবের সঙ্গে যুক্ত হত। এই দুটি জায়গা শুধু পাশাপাশি নয়, একই নদীর সঙ্গে সংযুক্ত। পাঞ্জাবের অবর্তমানে বোম্বাই-ই ছিল এমন জায়গা, যেখান থেকে সিন্ধুকে শাসন করা যাবে, তাই তাকে বোম্বাইয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। তাই বলে সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে বিযুক্ত করে পাঞ্জাবের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ইচ্ছেও বাতিল হয়নি। আর এমন প্রস্তাব মাঝে মাঝেই উঠেছে। প্রথম এই প্রস্তাব রাখা হয়েছিল লর্ড ডালহৌসির বড়লাট থাকার সময়, কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে কোর্ট অফ ডিরেক্টরস তা মঞ্জুর করেনি। সিপাহী বিদ্রোহের পর প্রশ্নটি আবার পুনর্বিবেচিত হয়েছিল, কিন্তু সিন্ধু নদীর তীর বরাবর যোগাযোগের অবস্থা খুবই অনুন্নত থাকার জন্য লর্ড ক্যানিং সম্মতি দিতে রাজি হননি। ১৮৭৬ সালে লর্ড নর্থব্রুকের উত্তরসূরী লর্ড লিটন সিন্ধু নদ পারের এলাকা নিয়ে একটা প্রদেশ গড়তে চেয়েছিলেন, যাতে যুক্ত হবে পাঞ্জাবের ছটি জেলা ও সিন্ধুর নদ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি। পাঞ্জাবের ছটি জেলা হলে— হাজারা, পেশওয়ার, কোহার্য্য, বাণু, দেরা ইসমাইল খান, দেরা গাজি খান

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এবং সিন্ধু নদের তীরবর্তী সিন্ধু অঞ্চল (করাচি বাদে)। তিনি আরও প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে মধ্যপ্রদেশের অংশ না পুরোটা বোম্বাইয়ের সঙ্গে যুক্ত হোক, যাতে সিন্ধু নদের তীরবর্তী অঞ্চল চলে যাওয়াটা পুষিয়ে যায়। এইসব প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র-সচিবের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। লর্ড ল্যান্সডাউনের ভাইসরয়ত্বে (১৮৮৮-৯৪) একটি প্রস্তাব অর্থাৎ পাঞ্জাবকে সিন্ধুর সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব, উত্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু 'বেলুচিস্তান এজেন্সি' গঠনের জন্য সিন্ধু আর সীমান্ত জেলা থাকেনি এবং প্রস্তাব তোলার পেছনে যে সামরিক কারণ ছিল তা প্রাসঙ্গিকতা হারায়; ফলে সিন্ধুকে আর পাঞ্জাবের সঙ্গে যুক্ত করা যায়নি। ব্রিটিশরা যদি বেলুচিস্তান দখল না করত এবং লর্ড কার্জন যদি পাঞ্জাব থেকে কেটে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠন না করতেন, তা হলে আমরা অনেক দিন আগেই একটি প্রশাসনিক একক হিসাবে পাকিস্তানের সৃষ্টি হওয়া দেখতে পেতাম।

বাংলাতে জাতীয় মুসলমান রাজ্য গঠনের প্রসঙ্গে ওই একই কথা— এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। অনেকেরই স্মরণে আছে যে ১৯০৫ সালে বাংলা ও অসম রাজ্যকে তৎকালীন বড়লাট দুটি রাজ্যে বিভক্ত করেছিলেন— এক অংশে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববাংলা ও অসম এবং অন্য অংশে কলকাতা রাজধানীসহ পশ্চিমবাংলা। নতুন সৃষ্টি পূর্ববাংলা ও অসম প্রদেশের অংশ হয়েছিল অসম ও পূর্ববাংলার ১. ঢাকা, ২. ময়মনসিংহ, ৩. ফরিদপুর, ৪. বাখরগঞ্জ, ৫. ত্রিপুরা, ৬. নোয়াখালি, ৭. চট্টগ্রাম, ৮. পার্বত্য চট্টগ্রাম, ৯. রাজশাহী, ১০. দিনাজপুর, ১১. জলপাইগুড়ি, ১২. রংপুর, ১৩ বগুড়া, ১৪ পাবনা এবং ১৫ মালদহ। পশ্চিমবাংলায় থাকল পুরনো বাংলা ও অসম প্রদেশের বাকি জেলাগুলি এবং মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর।

এই একটি প্রদেশকে ভাগ করে দুটিতে পরিণত করা যা, ভারতের ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত হয়েছিল এইজন্যে যাতে পূর্ববাংলায় একটি মুসলমান রাজ্য গঠিত হতে পারে, কেননা অসম বাদ দিলে, পূর্ববাংলা মূলত মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়েছিল ১৯১১ সালে ব্রিটিশরা হিন্দুদের দাবির কাছে নত হয়েছিল, কেননা হিন্দুরা বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিল। বঙ্গভঙ্গ যদি রদ করা না হত, তাহলে পূর্ববাংলার মুসলমান প্রদেশের বয়স হত আজ ৩৯ বছর[১]।

তিন

হিন্দুস্থান থেকে পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নকরণের চিন্তা কি খুব-ই অপ্রত্যাশিত? তা হলে শুরু করা যাক প্রসঙ্গটির সঙ্গে সংযুক্ত কিছু তথ্য, যেগুলি কংগ্রেসের নীতির মূল উৎস হয়ে আছে। এ-কথা স্মরণ করা যেতে পারে যে, মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস দল পুনর্গঠন করার পর দুটি জিনিস করেছিলেন যাতে দলের জনপ্রিয়তা বাড়ে। প্রথম হল আইন অমান্য আন্দোলন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভারতের রাজনীতিতে মি. গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্বে ক্ষমতার দাবিদার দলগুলি ছিল কংগ্রেস, উদারপন্থীরা, ও বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবীরা। কংগ্রেস ও উদারপন্থীরা একটাই দল ছিল, তখন এত পার্থক্য তাদের মধ্যে ছিল না। আমরা তাই নিশ্চিন্তে বলতে পারি যে, তখন দুটিই দল ছিল— উদারপন্থীদের দল ও সন্ত্রাসবাদীদের দল। দুটি দলেই যোগ দেওয়ার শর্ত খুব কঠিন ছিল। উদারপন্থী দলে যোগ দেওয়ার শর্ত শুধু শিক্ষাই ছিল না, ছিল জ্ঞানের এক উচ্চ ধাপে উন্নত হওয়া। সুতরাং জ্ঞানের পরিধি বিষয়ে খ্যাতি থাকলে, তবেই কেউ এই দলে যোগ দেওয়ার আশা করত। অশিক্ষিতদের ক্ষমতায় উত্তরণের পথে কার্যত বাধা ছিল। সন্ত্রাসবাদীরাও যতদূর সম্ভব শক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা রেখেছিল। যারা শুধু আদর্শের জন্যে প্রাণদানের ব্রত নিতে প্রস্তুত থাকত, তারাই শুধু দলের সদস্য হতে পারত। তাই কোনও দুষ্ট লোকের পক্ষে সন্ত্রাসবাদীদের দলে ঢোকা অসম্ভব ছিল। আইন অমান্যতে জ্ঞানের দরকার হয় না, জীবন বলিদানের দরকার হয় না। শিক্ষা নেই এবং আত্মত্যাগেরও তেমন সদিচ্ছা নেই, অথচ দেশপ্রেমিক হবার বাসনা আছে এমন বৃহৎ জনগণের কাছে আইন অমান্য আন্দোলন সহজ এক মধ্যপন্থা হয়ে উঠেছিল। এই মধ্যপন্থার ফলেই কংগ্রেস দল, উদারপন্থী ও সন্ত্রাসবাদীদের চেয়ে বেশি জনপ্রিয় হতে পেরেছিল।

দ্বিতীয় যে জিনিসটি মি. গান্ধী করেছিলেন তা হল, ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের নীতি প্রচলন। মি. গান্ধীর প্রেরণা ও সাহায্যে কংগ্রেস যে সংবিধান রচনা করেছিল, তাতে নিম্নলিখিত প্রদেশসমূহে ভারতকে বিভক্ত করার কথা বলা হয়েছিল :

প্রদেশ	ভাষা	প্রধান কেন্দ্র
আজমেড়-মারওয়ারা	হিন্দুস্তানি	আজমেড়
অন্ধ্র	তেলগু	মাদ্রাজ
অসম	অসমীয়া	গৌহাটি
বিহার	হিন্দুস্তানি	পাটনা
বাংলা	বাংলা	কলকাতা
বোম্বাই (শহর)	মারাঠি-গুজরাটি	বোম্বাই
দিল্লি	হিন্দুস্তানি	দিল্লি
গুজরাট	গুজরাটি	আহমেদাবাদ
কর্নাটক	কন্নড়	ধারওয়ার
কেরালা	মালয়ালম	কালিকট

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মহাকোশল	হিন্দুস্তানি	জব্বলপুর
মহারাষ্ট্র	মারাঠি	পুণে
নাগপুর	মারাঠি	নাগপুর
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	পুশতু	পেশওয়ার
পাঞ্জাব	পাঞ্জাবি	লাহোর
সিন্ধু	সিন্ধি	করাচি
তামিলনাড়ু	তামিল	মদ্রাজ
যুক্তপ্রদেশ	হিন্দুস্তানি	লখনউ
উৎকল	ওড়িয়া	কটক
বিদর্ভ (বেরার)	মারাঠি	আকোলা

এই বিভাজন অঞ্চল, জনসংখ্যা বা রাজস্বের দিকগুলিকে বিবেচনার মধ্যে আনা হয়নি। প্রত্যেকটি প্রশাসনিক এককের যে ন্যূনতম সভ্য জীবনের মান রক্ষা করার ক্ষমতা থাকবে এবং যে কারণে তার যথেষ্ট এলাকা, যথেষ্ট জনসংখ্যা এবং প্রচুর রাজস্ব থাকবে, এমন চিন্তার কোন স্থান প্রদেশ গঠনের জন্যে অঞ্চল ভাগের সময় ছিল না। মূল নির্ধারক হয়েছিল ভাষা। এমন কোন চিন্তা করা হয়নি যে, এই ধরনের প্রদেশ বিভাজনের ফলে ভারতীয় সমাজ জীবনের শিথিল গঠনের সুযোগ, বিভেদকামী শক্তির জন্ম দিতে পারে। সন্দেহ নেই যে, প্রকল্পটির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে কংগ্রেসের দিকে নিয়ে আসা। ভাষাগত প্রদেশ গঠনের এই চিন্তা দৃঢ় হয়েছে এবং এটিকে কার্যকরী করার দাবি এত প্রবল হয়েছে যে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর তাকে কার্যকরী করতে বাধ্য হয়েছে। ওড়িশা ইতিমধ্যেই বিহার থেকে পৃথক হয়েছে।[২] অন্ধ্রও মদ্রাজ থেকে আলাদা হওয়ার দাবি করছে। কর্নাটক সরে যেতে চাইছে মহারাষ্ট্র থেকে।[৩] একমাত্র ভাষাগত প্রদেশ যেটি মহারাষ্ট্র থেকে আলাদা হতে চাইছে না, সেটি হল গুজরাট। অন্যভাবে বললে গুজরাট আপাতত থেকে আলাদা হওয়ার চিন্তা ছেড়েছে। তা সম্ভবত এই কারণে যে, মহারাষ্ট্রের সঙ্গে একত্র থাকা যে, রাজনীতি ও বাণিজ্যিক কারণে গুজরাটের পক্ষেই মঙ্গলকর।

যাই হোক, ব্যাপারটি এই দাঁড়াল যে, ভাষার ভিত্তিতে বিভাজন এখন সর্বসম্মত নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কথা বলা অর্থহীন যে, ভাষাগত কারণে কর্নাটক ও অন্ধ্রের বিযুক্তি দরকার, কিন্তু পাকিস্তানের আলাদা হওয়ার কারণ সাংস্কৃতিক পার্থক্য। কোন পার্থক্য ছাড়াই এই প্রভেদ। সাংস্কৃতিক পার্থক্যের-ই অপর নাম ভাষাগত পার্থক্য।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কর্নাটক ও অন্ধ্রের আলাদা হওয়ায় যদি আহত হওয়ার কোনও কারণ না থাকে, পাকিস্তানের আলাদা হওয়ার দাবির মধ্যেই বা আহত হওয়ার কী আছে? এর ফলাফল যদি বিভেদকামী হয়, তবে তা হিন্দু প্রদেশ মহারাষ্ট্র থেকে কর্নাটকের বা মদ্রাজ থেকে অন্ধ্রের বিভাজনের চেয়ে বেশি বিভেদকামী নয়। একটি সাংস্কৃতিক অংশের নিজস্ব উন্নতি ও বৃদ্ধির স্বাধীনতা দাবি করার-ই অন্য নাম হল পাকিস্তান।

একটি জাতি চায় দেশ

বিভাজনের এই দাবির পেছনে যে কারণগুলি আছে অর্থাৎ প্রশাসনিক, ভাষাগত বা সংস্কৃতিগত, সেগুলির কথা সবাই স্বীকার করে ও বুঝেছে। এই দাবিগুলি সম্পর্কে কারও কিছু মনে করার কারণ নেই এবং অনেকেই এই দাবিগুলি মেনে নিতেও রাজি আছে। কিন্তু হিন্দুরা বলছে যে মুসলমানরা শুধু বিভাজন নয় আরও কিছু চাইছে— আইনগতভাবে তারা উভয়ের সাধারণ যোগটুকুও মুছে ফেলতে চাইছে এবং পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের বিভাজনের প্রশ্নটিও ভোলা হচ্ছে।

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে মুসলিম লীগের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণায় যে ভারতের মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র জাতি। মুসলিম লীগের এই ঘোষণাটিকে হিন্দুরা শুধু নিন্দেই করছে, না, বিদ্রূপও করছে।

হিন্দুদের এই ক্ষোভ স্বাভাবিক। ভারত একটি জাতি কি না এই বিষয়টি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ইঙ্গ-ভারতীয় ও হিন্দু রাজনীতিকদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ইঙ্গ-ভারতীয়রা এই কথা বলতে কখনও দ্বিধা করেনি যে, ভারত একটি জাতি মাত্র নয়। ভারতীয় বলতে শুধু ভারতের অধিবাসীদেরই বুঝায়। একজন ইঙ্গ-ভারতীয়ের ভাষায়— ভারতকে জানতে গেলে এ-কথা ভুলে যেতে হয় যে, ভারত বলে কিছু আছে। অন্যদিকে, হিন্দু রাজনেতা ও দেশব্রতীদের এটা বরাবরের বক্তব্য যে, ভারত একটি জাতি। ইঙ্গ-ভারতীয়রা যে ঠিক কথাই বলছে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকী বাংলার জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথও তাদের সঙ্গে একমত হয়েছেন। কিন্তু হিন্দুরা কখনও রবীন্দ্রনাথের কথাতেও হার মানতে চায়নি।

এর কারণ হল দ্বিবিধ। প্রথমত, হিন্দুরা স্বীকার করতে লজ্জা পায় যে, ভারত এক জাতি নয়। পৃথিবীতে যখন জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ জনগণের বিশেষ গুণ হিসাবে পরিগণিত হয়, তখন এটা হিন্দুদের কাছে এই ধারণা খুবই স্বাভাবিক যে, এইচ.জি.ওয়েল-এর ভাষায়, প্রকাশ্য স্থানে বস্ত্রহীন অবস্থায় কোনও মানুষের যে দশা হয়, জাতীয়তাহীন অবস্থায় ভারতের দশাও তদ্রূপ অশোভন। দ্বিতীয়ত, সে অনুভব করেছে যে, স্বায়ত্তশাসনের দাবির সঙ্গে জাতীয়তার বিষয়টিও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সে জেনেছে যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এটি সর্বজনস্বীকৃত নীতি যে, জনসাধারণ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জাতি হিসাবে পরিগণিত হলে তাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার জন্মে এবং কোনও দেশপ্রেমিককে স্বায়ত্তশাসন চাওয়ার সময় প্রমাণ করতে হয় যে তারা একটা জাতিতে পরিণত হয়েছে। এই কারণে একজন হিন্দু ভারত একটি জাতি কি না এই প্রশ্নকে সর্বদাই এড়িয়ে গেছে। কখনও সে চিন্তা করে দেখেনি যে জনসাধারণ নিজেদের জাতি হিসাবে মনে করলেই জাতীয়তা তৈরি হয় কিংবা জাতি হয়ে উঠলে তবেই জাতীয়তা প্রশ্ন ওঠে। সে একটি বিষয়-ই জানে যে ভারতে যদি স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করার দাবিকে জয়যুক্ত করতে হয়, তাহলে তাকে, প্রমাণ সাপেক্ষ হলেও, এ-কথা বলে যেতে হবে যে, ভারত একটি জাতি।

তার এই ঘোষণায় অন্য কোনও ভারতীয়ের কাছ থেকে বিরোধিতা আসেনি। সবাই এতটাই একমত যে ইতিহাসের বিচক্ষণ ভারতীয় ছাত্ররাও এর পক্ষে প্রচারধর্মী রচনা লিখতে এগিয়ে এসেছে। কোন সন্দেহ নেই, এর পেছনে দেশপ্রেমের আবেগই কাজ করছে। হিন্দু সমাজ সংস্কারকরা এই তত্ত্বের ভ্রান্তি সম্পর্কে অবহিত থাকলে খোলাখুলিভাবে এর বিরোধিতা করেননি। কারণ হল, এই চিন্তার বিরোধিতা যেই করবে, তাকে ব্রিটিশ শাসকদের হাতে ক্রীড়ানক এবং দেশের শত্রু বলে চিহ্নিত করা হবে। হিন্দু রাজনীতিক অনেক দিন ধরে তার এই মতকে প্রচার করার সুযোগ পেয়েছে। তার বিরোধী, ইঙ্গ-ভারতীয়রাও প্রত্যুত্তর দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে। ফলে তার প্রচার প্রায় সম্পূর্ণভাবেই সফল হয়ে এসেছিল, এমন সময়েই এসেছে মুসলিম লীগের এই ঘোষণা। এটি যেহেতু ইঙ্গ-ভারতীয়দের কাছ থেকে আসেনি, তাই তা মারাত্মক আঘাত হয়ে এসেছে। এতদিন ধরে হিন্দু রাজনীতিক যা তৈরি করেছেন তা ধ্বংস হবার মুখে। মুসলমানরা ভারতে যদি স্বতন্ত্র জাতি হয়, তা হলে ভারত নিশ্চয় এক জাতি নয়। এই ভাবনা হিন্দু রাজনীতিকের পায়ের নীচে থেকে সমস্ত মাটি সরিয়ে ফেলেছে। সুতরাং এটি স্বাভাবিক যে, তারা খুব বিরক্ত হবে এবং একে পিছন থেকে ছুরি মারার সঙ্গে তুলনা করবে।

ছুরি মারা হোক না হোক, কথা হল—মুসলমানদের কি একটা জাতি বলে মনে করা হবে? আর সবকিছু এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এবার প্রশ্ন তোলা যায়—জাতি কী? এই বিষয়ে গাদা গাদা লেখা হয়েছে। কেউ আগ্রহী হলে সেসব পড়ে দেখতে পারেন এবং এ সম্পর্কে যেসব ভাবনা আছে এবং তার নানাদিক আছে সেগুলি অধ্যয়ন করতে পারেন। তবে এটুকু জানা এখানে যথেষ্ট যে, জাতীয়তা একটি সামাজিক অনুভূতি। এটি একতার সামগ্রিক প্রকাশ-যারা এতে প্রাণিত, তারা অনুভব করেন যে, সবাই আত্মীয় একে অপরের। এই জাতীয় অনুভূতি হল দ্বিমুখী। একদিকে, আত্মীয়তাসূত্রে সবার প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ, অন্যদিকে যারা আত্মীয় নয় তাদের প্রতি অ-ভ্রাতৃত্ববোধ। এটি এমন এক সচেতন ভাবনা যা একদিকে সমভাবাপন্ন সবাইকে এত দৃঢ়ভাবে বন্ধনে আবদ্ধ করে যে, সামাজিক বিভেদ বা সামাজিক শ্রেণীভেদের সব পার্থক্যের ঊর্ধ্বে তারা উঠতে পারে, অন্যদিকে, যারা সমভাবাপন্ন নয়, তাদের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করায় অন্য কোনও দলভুক্ত না থাকার ইচ্ছে এতে তৈরি হয়। এই হল জাতীয়তা বা জাতীয় ভাবনার মূল বিষয়।

এখন এই ভাবনাটিকে মুসলমানদের দাবির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাক। ভারতের মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী, এটি সত্য, না সত্য নয়? তাদের মধ্যে এক ধরনের চেতনা কাজ করে, এটি সত্য না সত্য নয়? প্রতিটি মুসলমানের আকাঙ্ক্ষা তার নিজস্ব গোষ্ঠীতে থাকা এবং অ-মুসলমান গোষ্ঠীতে না থাকা— এটি সত্য, না সত্য নয়?

যদি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ-সূচক হয়, তবে বিতর্কের অবসান হওয়া দরকার এবং মুসলমানদের দাবি যে তারা একটি জাতি, তা মেনে নেওয়া উচিত।

হিন্দুদের প্রমাণ করতে হবে যে, সামান্য কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে, যাতে তারা একটি জাতি হিসাবে পরিচিত হতে পারে। অর্থাৎ সহজভাবে বলতে গেলে, এমন মিল রয়েছে যাতে তারা একত্বের আকাঙ্ক্ষা করতে পারে।

মুসলমানরা নিজেরাই আলাদা জাতি এই চিন্তার সঙ্গে সহমত পোষণ করে না যেসব হিন্দু, তারা ভারতীয় সমাজজীবনের এমন কতকগুলি বিশেষত্বের ওপর নির্ভর করে, যেগুলিকে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাধারণ ঐক্যের সূত্র বলে মনে করা হয়।

প্রথমত, একথা বলা হয় যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে 'রেস' বা জাতিগত কোনও কি পার্থক্য নেই? বলা হয় যে, পাঞ্জাবি মুসলমান ও পাঞ্জাবি হিন্দু, ইউ.পি.-র মুসলমান ও ইউ.পি.-র হিন্দু, বিহারের মুসলমান ও বিহারের হিন্দু, বোম্বাইয়ের মুসলমান ও বোম্বাইয়ের হিন্দু জাতিগতভাবে এক। কোনও সন্দেহ নেই যে 'রেস' বা এই জাতিগত দিক থেকে খুবই মিল রয়েছে একজন মাদ্রাজি মুসলমানের সঙ্গে মাদ্রাজি ব্রাহ্মণের, যতটা মিল একজন মাদ্রাজি ব্রাহ্মণের সঙ্গে একজন পাঞ্জাবি ব্রাহ্মণের নেই। দ্বিতীয়ত, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভাষাগত ঐক্যের ওপর জোর দেওয়া হয়। বলা হয় যে, মুসলমানদের নিজের কোনও ভাষা নেই, যাতে ভাষাগত দিক থেকে তারা হিন্দুদের থেকে আলাদা গোষ্ঠীতে পরিণত হবে। বরং উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাষাগত ঐক্য বিদ্যমান। পাঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমান উভয়েই পাঞ্জাবিতে কথা বলে। সিন্ধুতে উভয়েই কথা বলে সিন্ধিতে, বাংলায় উভয়েই বাংলায় কথা বলে। গুজরাটে তারা গুজরাটি বলে আর মহারাষ্ট্রে মারাঠি। সব প্রদেশেই একই অবস্থা। শুধুমাত্র শহরগুলিতে, মুসলমানরা উর্দু বলে। আর হিন্দুরা বলে তাদের প্রদেশের ভাষা। কিন্তু বাইরে, মফঃস্বলে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাষাগত ঐক্য আছে। তৃতীয়ত, এও বলা হয়েছে যে, হিন্দু ও মুসলমান শত শত বছর ধরে ভারতে একসঙ্গে বসবাস করছে। এই দেশ শুধুমাত্র হিন্দুদের নয়, কিংবা শুধুমাত্র মুসলমানদেরও নয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জাতিগত ঐক্যের ওপরই শুধু জোর দেওয়া হয়নি, জোর দেওয়া হয়েছে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যেকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কিছু বৈশিষ্ট্যের ওপর, উভয় গোষ্ঠীতে যেগুলির দেখা মেলে।

এ-কথা বলা হচ্ছে, যে অনেক মুসলমানের সামাজিক জীবন হিন্দু প্রথার সঙ্গে ঘনসন্নিবদ্ধ। যেমন হিন্দু নামের অনেক পদবি মুসলমানদের মধ্যেও দেখা যায়। চৌধুরী হিন্দু পদবি হলেও যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও দেখা যায়। বিবাহের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, কোনও কোনও মুসলমান নামমাত্রই মুসলমান, রীতিগত কোনও প্রভেদ নেই। অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র হিন্দুরীতি অনুসরণ করে অথবা হিন্দুরীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠান সমাপ্ত করে কাজিকে ডাকে। কোনও কোনও মুসলমানের ক্ষেত্রে হিন্দু আইন প্রযোজ্য হয় বিবাহের সময় অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকারের বিষয়ে। শরিয়ৎ আইন গৃহীত হওয়ার আগে একথা পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ক্ষেত্রেও সত্য ছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে জাতপাতের শ্রেণীব্যবস্থা হিন্দু সমাজেও যেমন, মুসলমান সমাজেও তেমনি। ধর্মের ব্যাপারেও বলা হয়ে থাকে যে, অনেক মুসলমান পিরের হিন্দু শিষ্য ছিল; এবং তেমনিভাবে কিছু হিন্দু যোগীদেরও মুসলমান চেলা থেকেছে। বিরোধী দুই বিশ্বাসের গুরুদের মধ্যে বন্ধুত্বের ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

পাঞ্জাবের গিরোটে জামালি সুলতান ও দিয়াল ভবন নামে দুই যোগীর কবর পাশাপাশি রয়েছে, এঁরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সদ্ভাবের সঙ্গে বাস করেছেন এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই দ্বারা পূজিত হয়েছেন। বাওয়া ফাতু নামে এক মুসলমান যোগী যিনি ১৭০০ সাল নাগাদ বেঁচে ছিলেন, তার কবর আছে কাংড়া জেলার রাণীতলে—তিনি হিন্দু যোগী, শোধি গুরু গুলাব সিংয়ের আশীর্বাদ 'ঈশ্বর প্রেরিত' উপাধি লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে, বাবা সাহানা নামে একজন হিন্দু সাধু যার ধর্মমতের অনুগামীরা আছেন জঙ জেলায়, তিনি নাকি এক মুসলমান পিরের চেলা এবং তার হিন্দু শিষ্যের নাম পালটে নাম রেখেছিলেন মির শাহ।

এসব নিশ্চয় সত্যি। মুসলমানদের এক বৃহৎ অংশ যে হিন্দুরা যে গোত্রের সেই গোত্রেরই, তাতে সন্দেহ নেই। এ-কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, সমস্ত মুসলমান-ই একভাষাতে কথা বলে না এবং হিন্দুরা যে-ভাষাতে কথা বলে, সেই ভাষাতেই তারা কথা বলে। এ-কথাও ঠিক যে, উভয়ের-ই সামাজিক প্রথায় অনেক মিল আছে। কিছু কিছু ধর্মীয় আচারেও যে মিল আছে, এও সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হল— এই সবকিছু থেকে কি এই সিদ্ধান্তে আসা যাবে যে হিন্দু ও মুসলমানরা এই কারণে এক জাতির অন্তর্গত এবং এইসব কিছু কি তাদের মনে এই অনুভূতি তৈরি করে যে তারা উভয়ে একে অপরের?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিন্দুদের বক্তব্যে অনেক ত্রুটি আছে। প্রথমত, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যমূলক যেসব সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলি কিন্তু সামাজিক মিশ্রণ ঘটানোর লক্ষ্যে একে অপরের রীতি-নীতি গ্রহণ করার সচেতন প্রচেষ্টা নয়। পক্ষান্তরে, এই সাদৃশ্য হলো শুধুমাত্র কিছু কৃত্রিম কারণের ফলশ্রুতি। এগুলির আংশিক কারণ হলো অসমাপ্ত ধর্মান্তকরণ। ভারতের মতো দেশে যেখানে মুসলমান জনসংখ্যার বেশির ভাগই উচ্চবর্ণ ও বর্ণবহির্ভূত হিন্দু দ্বারা গঠিত, ধর্মান্তরিত এইসব মানুষের ইসলামীকরণ সম্পূর্ণভাবে ফলপ্রসূ হয়নি— এর কারণ হতে পারে বিদ্রোহের ভীতি কিংবা যথেষ্ট প্রচারের অভাব। এই কারণে অবাক হবার কিছু নেই যদি মুসলমান জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশের মধ্যে তাদের ধর্ম ও সমাজজীবনে হিন্দু উৎসের কিছু বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ পায়। এটিকে অংশত ব্যাখ্যা করতে হবে এইভাবে, যে এসব উভয় সম্প্রদায়ের এক-ই পরিবেশে শতাব্দী ধরে বসবাসের ফল। সদৃশ পরিবেশের প্রভাবে সদৃশ বৈশিষ্ট্য দেখা দিতে বাধ্য। সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যকে অংশত এভাবেও ব্যাখ্যা করতে হবে, যে এগুলি সম্রাট আকবরের হাতে যার সূচনা সেই হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় মিশ্রণের যুগের অবশিষ্টাংশ।

ভাষা ও এক-ই দেশজাত ঐক্যের ভিত্তিতে জাতির যে যুক্তি তৈরি করা হয়েছে, সে সম্পর্কে বলা যায় যে বিষয়টির ক্ষেত্র ভিন্ন। এই সমস্ত বিবেচনাগুলি যদি কোনও 'নেশন' বা জাতিগঠনের নির্ধারক হত, তাহলে হিন্দুরা একথা বলতে পারত যে জাতি, ভাষাগোষ্ঠী ও বাসস্থানের কারণে হিন্দু ও মুসলমানরা এক জাতির অন্তর্গত। ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে জাতি বা ভাষা বা দেশ কিছুই জনগণকে একটা নেশন-এ পরিণত করতে পারেনি। এই যুক্তি এত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন রেনান, যে অন্য কোনওভাবে তা এর চেয়ে ভালো করে প্রকাশ করা যাবে না। অনেক দিন আগে তাঁর "জাতীয়তা" নামক প্রবন্ধে রেনান লিখেছেন :

> জাতি'-কে 'নেশন'-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। সত্য হল এই যে, খাঁটি জাতি' বলে কিছু নেই; এবং রাজনীতিকে ধারাবাহিক বিশ্লেষণের কাজে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হল তাকে একটা দৈত্যের চেহারা দেওয়া... জাতিগত সত্য, প্রথম দিকে যত গুরুত্বপূর্ণই হোক, ক্রমশই তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলার প্রবণতা দেখা দেয়। মানব ইতিহাসের সঙ্গে প্রাণীবিদ্যার মৌলিক পার্থক্য আছে। 'জাতি'-ই সবকিছু নয়।...'

ভাষার বিষয় বলতে গিয়ে রেনান অভিমত প্রকাশ করেছেন :

> ভাষা পুনর্মিলনের আহ্বান জানায়, কিন্তু তাকে বাধ্য করে না। আমেরিকা ও ইংল্যান্ড, স্পেনীয় আমেরিকা ও স্পেন এক-ই ভাষায় কথা বলে অথচ এককভাবে জাতি হয়ে ওঠেনি। পক্ষান্তরে, সুইজারল্যান্ডে জাতি তৈরি হয়েছিল তার অন্তর্গত তিন-চারটি ভাষার সম্মতিতে। মানুষের মধ্যে ভাষার অধিক বড়

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছু আছে— ইচ্ছা। ভাষার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ইচ্ছেই সুইজারল্যান্ডকে এক করেছে, এটিই ভাষার সাদৃশ্যের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

একই দেশে বসবাসের প্রশ্নে রেনান বলেছেন :

'কোনও ভূখণ্ড জাতি তৈরি করে না। দেশ একটি ভিত্তিমাত্র— যুদ্ধ ও কর্মের স্থান; মানুষ-ই তাকে প্রাণ দেয়; জনগণ নামক সেই পবিত্র বিষয়টি গঠনে মানুষ-ই সব। এর জন্য কোনও বস্তুই যথেষ্ট নয়'।

দেখা গেল যে 'জাতি' ভাষা ও দেশে জাতি গঠনের জন্য যথেষ্ট নয়। রেনান এবার। খুব তীক্ষ্ণ প্রশ্ন রাখছেন, জাতি গঠনের জন্য তাহলে কী প্রয়োজন? তার প্রশ্নের উত্তর তার ভাষাতেই দেওয়া যেতে পারে :

একটি জাতি হল জীবন্ত আত্মা, এক আধ্যাত্মিক নীতি। দুটি জিনিস, যা সত্যের কাছে এক-ই, এই আত্মা, এই আধ্যাত্মিক নীতি প্রণয়নে সাহায্য করে। একটি আছে অতীতে, অন্যটি বর্তমানে। একটি হল স্মৃতির ভিতরের ঐশ্বর্যে মিল, অন্যটি হল প্রকৃত সম্মতি, একত্রে বাস করার ইচ্ছে, এবং অবিভক্ত ঐতিহ্যে সংরক্ষণের যৌথ সংকল্প। ব্যক্তির মতো জাতিও দীর্ঘ অতীতের প্রচেষ্টা, আত্মত্যাগ ও বলিদানের ফসল। পূর্বপুরুষের পুজো তাই স্বাভাবিক, কেননা আমরা যা, তা তারাই তৈরি করেছে। বীরত্বপূর্ণ অতীত, মহান ব্যক্তি, গৌরব—এসব হল সামাজিক পুঁজি-যার ওপর জাতীয়তার ধারণার ভিত্তি তৈরি হয়। অতীত গৌরবের সাদৃশ্য, বর্তমানে সংকল্পের সাদৃশ্য, একসঙ্গে ভালো কাজ করার ইচ্ছে—এসবই হল একটা জাতি তৈরির প্রয়োজনীয় শর্ত।

অতীতের গৌরব ও দুঃখবোধকে একত্রে ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছে থাকতে হবে, এবং একটা সদৃশ আদর্শ ভবিষ্যতের মধ্যে খুঁজে পেতে হবে, একসঙ্গে আনন্দ ও কষ্ট পাওয়ার, আশা-আকাঙ্ক্ষার অভ্যাস থাকতে হবে। জাতি ও ভাষার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এসব কিছুকে অনুধাবন করতে হবে। আমি এইমাত্র বলেছি, একসঙ্গে কষ্ট সহ্য করতে হবে; হ্যাঁ আনন্দে অংশ নেওয়ার চেয়ে দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার মধ্যেই একতার বীজ। আর জাতীয় স্মৃতির বিষয়ে বলা যায় যে, বিনয়ের চেয়ে শোকপ্রকাশ বেশি দামি, কেননা এর মধ্যে কর্তব্যের আহ্বান আছে, একই রকম প্রচেষ্টার দাবি থাকে।'

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এমন কোনও ঐতিহাসিক পরিচয়ের সাদৃশ্য আছে কি, যা নিয়ে তারা গর্ব করতে পারে বা দুঃখ করতে পারে? এটিই হল মূল কথা। হিন্দু ও মুসলমান মিলে একটা জাতি, এ-কথা বললে এই প্রশ্নের উত্তর হিন্দুদের দিতেই হবে। তাদের সম্পর্কে এই দিকটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তারা অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত বিবাদমান দুই যুদ্ধদল। কোন কৃতিত্বের অংশীদার হয়ে কোন কিছুতেই উভয়ের অংশগ্রহণ নেই। রাজনীতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদের অতীত হল

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারস্পরিক ধ্বংসের অতীত—পারস্পরিক বিদ্বেষের অতীত। "হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন' নামে পুস্তিকায় ভাই পরমানন্দ যেমন বলেছেন—"হিন্দুরা শ্রদ্ধা করে ইতিহাসের পৃথ্বীরাজ, প্রতাপ, শিবাজী ও বৈরাগী বীরের স্মৃতিকে, যারা এই দেশের স্বাধীনতা ও সম্মানের জন্য লড়াই করেছিলেন; অন্যদিকে মুসলমানরা ভারত অভিযানকারীদের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেমন মহম্মদ-বিন-কাসিম এবং ঔরঙ্গজেব প্রমুখ শাসকদের দিকে, জাতীয় বীরের মতো।"

ধর্মীয় ক্ষেত্রে দেখা যায়, হিন্দুরা প্রেরণা পায় রামায়ণ, মহাভারত ও গীতা থেকে; আর মুসলমানরা প্রেরণা পায় কুরআন ও হাদীস থেকে। সুতরাং উভয়কে একত্র করছে যা কিছু, তার চেয়ে বিভক্ত করার বিষয়গুলি অনেক বেশি। হিন্দু ও মুসলমান সমাজজীবনের কিছু সাদৃশ্যের ওপর নির্ভর করে, ভাষা ও দেশের সাদৃশ্যে বেশি আস্থা রেখে হিন্দুরা যা প্রয়োজনীয় ও মৌলিকতার বদলে আকস্মিক ও অগভীর বিষয়গুলির চর্চা করে ভুল করছে। তথাকথিত সাদৃশ্য আছে এমন সব বিষয়গুলির উভয়কে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষমতা যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর বিভাজন তৈরির ক্ষমতা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিরুদ্ধতার। যদি উভয়েই তাদের অতীতকে ভুলতে পারে, তাহলে হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। রেনান জাতি গঠনের একটি শর্ত হিসাবে স্মৃতি বিলোপের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন :

> 'জাতির সৃষ্টিতে পুরনো কথা ভুলে যাওয়া ও ইতিহাসের ত্রুটি মনে না করার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। এই কারণে ইতিহাসচর্চার অগ্রগতির একটা বিপজ্জনক দিকও আছে জাতি চেতনা উন্মেষের ক্ষেত্রে। ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার সময় সংঘটিত সমস্ত হিংসার পাদপ্রদীপের সামনে উঠে আসে, এমনকী যার ফলে লাভ হয়েছে এমন ঘটনাও। নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে কখনওই ঐক্য তৈরি হয় না। বিনাশের দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ ফ্রান্সের মিলন হয়, আর এক সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হয় যা চলেছিল প্রায় একশত বছর। ফ্রান্সের রাজা যিনি আমার মতে ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শস্বরূপ এবং যিনি প্রকৃতই জাতীয় ঐক্যের অস্তিত্ব দান করেছিলেন, তাকেও খুব কাছ থেকে দেখলে দেখা যাবে তিনি তার সম্মান রাখতে পারছেন না। যে জাতি তিনি গড়েছিলেন তা তাকেই অভিশাপ দিয়েছে এবং আজ তার মূল্য শুধু যারা জানে তাদের কাছেই।'

'বৈসাদৃশ্যের আলোকে পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাসের এইসব বিখ্যাত আইনগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফ্রান্সের রাজার পথ নিতে গিয়ে অনেক দেশ ব্যর্থ হয়েছে। সেন্ট স্টিফেনের রাজত্বে ম্যাগইয়ার্স ও স্লাভরা আটশত বছর আগে যেমন আলাদা ছিল, তেমনি রয়ে গেছে। বোহেমিয়াতে চেক ও জার্মানরা তেল ও জলের মতো গ্লাসে মিশেছে। ধর্মানুসারে জাতীয়তা বিভাজনের যে তুর্কি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নীতি তৈরি হয়েছিল, তার মারাত্মক ফল দেখা গেছে। এর ফলে প্রাচ্যেরই ক্ষতি হয়েছে। স্মিরনা বা সালোনিকার মতো শহরের কথা ধরা যাক। সেখানে দেখবে যে পাঁচটি বা ছয়টি গোষ্ঠী তাদের নিজের নিজের স্মৃতি আঁকড়ে বসে আছে, সাদৃশ্যের দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু জাতির মূল বিষয় হল যে তার প্রত্যেকটি ব্যক্তির সাদৃশ্যমূলক অনেক কিছু থাকবে, আর প্রত্যেকেই অনেক কিছুই ভুলে যাবে। কোনও ফরাসি নাগরিকই জানে না সে বারগাণ্ডিয়ান, না অ্যালান না ভিসিগথ। প্রতি ফরাসীই সেন্ট বারথোলোমিউ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর দক্ষিণের নিধনযজ্ঞের কথা ভুলে গেছে। ফরাসীতে দশটি পরিবারও নেই যারা তাদের মূল যে ফরাসী তার প্রমাণ দেখাবে। আর এমন প্রমাণ দিলেও তা সঠিক হবে না, কেননা তা অনেক এদিক-ওদিকের মিশ্রণ।'

দুঃখের কথা হল এই যে, আমাদের দুই গোষ্ঠী কখনোই তাদের অতীতকে ভুলতে বা মুছে ফেলতে পারবে না। তাদের অতীত সম্পৃক্ত হয়ে আছে তাদের ধর্মে, তাই অতীতকে বিসর্জন দেওয়ার অর্থ ধর্মকে জলাঞ্জলি দেওয়া। এমন ঘটবে এ আশা করাও বৃথা।

সাদৃশ্য ঐতিহাসিক পরিচয়ের অভাবে, হিন্দুদের এই ধারণা ব্যর্থ হতে বাধ্য, যে হিন্দু ও মুসলমানরা একত্রে একটি জাতিতে পরিণত হবে। এই ধারণা জিইয়ে রাখার অর্থ হল দিবাস্বপ্ন দেখা। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে একত্র থাকার যে ইচ্ছা, তেমন একত্রে থাকার ইচ্ছা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে নেই।

এ-কথা বলা বৃথা যে, তারা নিজেরাই একটি জাতি এ-চিন্তা তাদের নেতাদের মনে পরে। এসেছে। অভিযোগ হিসাবে এটি সত্য। মুসলমানরা এতদিন পর্যন্ত নিজেদের একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে দেখে সন্তুষ্ট থাকছে। শুধু এই সাম্প্রতিক কালে, তারা ভাবতে শুরু করেছে যে, তারা একটি জাতি। কিন্তু একজন লোকের উদ্দেশ্যকে আক্রমণ করলেই তার মতামতকে খণ্ডন করা যায় না। যদি এরকম বলা হয় যে, যেহেতু মুসলমানরা এতদিন নিজেদের একটি গোষ্ঠী হিসাবে দেখে এসেছে এবং সেই কারণে এখন নিজেদের জাতি বলার কোনো অধিকার নেই, তাহলে কিন্তু জাতীয় ভাবনার মনস্তত্ত্বের রহস্যময় ক্রিয়াকলাপের দিকটি বুঝতে অসুবিধা হবে। এই রকম যুক্তির সাহায্যে ধরে নেওয়া হয়, যে যেখানে, জনগণের অস্তিত্ব আছে এবং তাদের মধ্যে জাতি গঠনের উপকরণগুলি আছে, সেখানে অবশ্যম্ভাবী রূপে জাতীয়তার আবেগ স্পষ্ট থাকতে হবে এবং যেখানে এই আবেগ স্পষ্ট হবে না সেখানেই ধরে নেওয়া হবে তাদের জাতি গঠনের দাবির কোনও যৌক্তিকতা নেই। এমন যুক্তি কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। অধ্যাপক টয়েনবি যেমন বলেছেন :

'জাতীয়তাবোধের অস্তিত্বের সহায়ক, এমন একটি বা অনেকগুলি শর্তের উপস্থিতি লক্ষ করে এমন যুক্তি দেখানো অসম্ভব, যে জাতীয় নেতৃত্বের দ্বারা আরোপিত। বরং বলা যায় যে এই শর্তগুলি আগে থেকেই ছিল, প্রজ্জ্বলিত

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হবার অপেক্ষায়। কোনও একটি উদাহরণ দিয়ে তর্ক করা যাবে না; কেননা একই ধরনের কিছু অবস্থা এখানে জাতীয়তাবাদ তৈরি করলেও অন্যত্র তা কার্যকরী নাও হতে পারে।'

এমন হতে পারে, যে মুসলমানরা এতদিন সচেতন ছিল না যে, তাদের মধ্যে আছে জাতীয়তার মর্মবাণী। এত দেরিতে কেন তারা জাতি গঠনের দাবি জানাচ্ছে, এই প্রশ্নের উত্তর তাহলে পাওয়া যেতে পারে। দেরিতে দাবি করছে, এর অর্থ এই নয় যে, জাতীয় জীবনের আত্মিক মর্ম তাদের মধ্যে ছিল না।

এমন উদাহরণ আছে, যেখানে জাতীয়তার চেতনা আছে অথচ স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বাসনা নেই— এই যুক্তি দেখানো যাবে না। কানাডার ফরাসীরা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজদের উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। স্বীকার করা ভালো যে, এমন উদাহরণ রয়েছে, যেখানে জনগণ তাদের জাতীয়তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, কিন্তু তা থেকে কোনও জাতীয়তাবাদের আবেগ জন্ম নিচ্ছে না। অর্থাৎ নিজেদের সম্পর্কে সচেতন এমন জাতিগুলির অস্তিত্ব সম্ভব, কিন্তু এই অস্তিত্ব জাতীয়তাবাদের আবেগবর্জিত। এই যুক্তিতে একথা বলা যায় মুসলমানরা মনে করতে পারে যে, তারা একটি জাতি, কিন্তু তাই বলে তাদের পৃথক জাতীয় সত্তার দাবি করার প্রয়োজন নেই; কানাডাতে ফরাসীরা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজরা যেমনভাবে আছে, তেমনিভাবে থাকতে তারা সন্তুষ্ট হতে পারছে না কেন? কিন্তু এ-কথা মনে রাখতে হবে যে এই অবস্থা আসতে পারে যদি মুসলমানদের অনুরোধ করে জানানো যায় যে দেশবিভাগ তারা করবে না। কিন্তু তারা যদি তা না জানে, তবে তাদের দাবির বিরুদ্ধে এটি কোনো যুক্তি হয়ে উঠবে না।

উপরোধের অর্থ যাতে প্রত্যাখ্যান বলে ভুল না হয়, সেই কারণে দুটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা দরকার। প্রথমত, জাতীয়তা (Nationality) ও জাতীয়তাবাদের (Nationalism) মধ্যে পার্থক্য আছে। মানুষের মনের দুটি ভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক দিক। জাতীয়তা বলতে বোঝায় 'বিষয় চেতনা, সম্পর্ক সূত্রের অস্তিত্ব বিষয়ে সচেতনতা। জাতীয়তাবাদ হল 'সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ এমন মানুষজনের জন্য পৃথক জাতীয় অস্তিত্বের আকাঙ্ক্ষা। দ্বিতীয়ত, এ-কথা সত্য যে জাতীয়তার অনুভূতি বিনা জাতীয়তাবাদ তৈরি হতে পারে না। কিন্তু এও মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রতিজ্ঞা, সবসময় সত্য হয় না। জাতীয়তার অনুভূতি থাকতে পারে, কিন্তু জাতীয়তাবাদের ধারণা নাও থাকতে পারে। অর্থাৎ, জাতীয়তা সবক্ষেত্রেই জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয় না। জাতীয়তা জাতীয়তাবাদে প্রজ্জ্বালিত হওয়ার জন্য দুটি বিষয় জরুরি। প্রথমত, জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার প্রতিজ্ঞা। জাতীয়তাবাদ হল ঐ প্রতিজ্ঞার চঞ্চল প্রকাশ। দ্বিতীয়ত, এমন একটি ভূখণ্ড থাকা চাই, যেখানে জাতীয়তাবাদ তৈরি হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করবে এবং জাতির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থাকবে। এই ভূখণ্ড ব্যাতীত জাতীয়তাবাদ, লর্ড অ্যাকটনের ভাষায় হয়ে দাঁড়াবে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটি আত্মা যা ঘুরে মরছে 'একটি দেহের সন্ধানে, যেখানে নতুন জীবন শুরু করতে পারে, কিন্তু না পেয়ে মরে যায়'। মুসলমানদের মধ্যে 'জাতি হিসাবে বাস করার প্রতিজ্ঞা' জাগরিত হয়েছে। তাদের জন্য প্রকৃতি দিয়েছে ভূখণ্ড, যেখানে তারা দখল করে তাদের রাষ্ট্র নির্মাণ করতে পারবে এবং সাংস্কৃতিক গৃহ গড়ে তুলবে সদ্যজাত মুসলমান জাতির জন্য। অনুকূল সমস্ত অবস্থা মাথায় রাখলে অবাক হবার কিছু থাকবে, যদি মুসলমানরা বলে যে, তারা কানাডার ফরাসী বা দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজদের অবস্থায় সন্তুষ্ট নয় এবং তারা একটি জাতীয় আকাশ চায়, যা হবে তাদের একান্ত নিজের।

অবনয়নের হাত থেকে মুক্তি

হিন্দুরা খুব রাগতভাবেই জিজ্ঞেস করেছে, 'ভারত ভাগের দাবি ও আলাদা মুসলমান প্রদেশ গঠনের দাবি করার পিছনে মুসলমানদের কী যুক্তি আছে? কেন এই বিদ্রোহ? কী ক্ষোভ তাদের?'

ইতিহাস-জানা এমন যে কেউ-ই বুঝতে পারবে যে এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে জাতীয়তাবাদীই জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি হতে পারে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক লর্ড অ্যাকটন যেমন বলেছেন :

> 'পুরনো ইউরোপীয় ব্যবস্থায়, জাতীয়তার দাবি সরকার যেমন স্বীকার করেনি, তেমনি জনগণও সে দাবি করেনি। জাতির নয়, শাসনকারী পরিবারগুলির স্বার্থই সবদিক নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং সাধারণ মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিকটি না ভেবেই সাধারণত রাজ্য শাসন করা হত। যেখানে সব স্বাধীনতা দমিত, সেখানে জাতীয় স্বাধীনতার দাবিও স্বাভাবিকভাবে গ্রাহ্য করা হত না এবং ফেনিলনের ভাষায়, একজন রাজকুমারী তার বিয়ের যৌতুকে রাজতন্ত্র বহন করেছে।'
>
> জাতীয়তার বিষয়গুলি তখন অনবহিত ছিল। সচেতনা যখন এল—
>
> 'সবাই প্রথমে তাদের আইনত শাসকদের রক্ষা করতে বিজয়ী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তারা দখলকারী শক্তির দ্বার শানিত হতে চাইল না। তারপর একটি সময় এল, যখন তারা বিদ্রোহ করল শাসকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহের কারণ ছিল, কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগজাত ক্ষোভ। তারপর এল ফরাসী বিপ্লব। যার ফলে এক বিরাট পরিবর্তন সংখটিত হল। জনগণ শিখল যে নিজেদের নিয়ে যা তারা করতে চায়, তা-ই তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সর্বোচ্চ নির্ধারক হবে। জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণা ঘোষিত হল— যা অতীতের দ্বারা পরিচালিত এবং বর্তমানের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ফরাসী বিপ্লবের ফলে যে শিক্ষা সূচিত হল, তা সমস্ত উদারতাবাদী চিন্তাবিদদের আদর্শ হিসাবে গৃহীত হল। মিল এতে তার সম্মতি জানালেন। মিল বললেন,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'কেউ জানে না যে মানব জাতির কোন অংশ স্বাধীন হয়ে কী করবে এবং মানুষের কোন অংশের সঙ্গে মেলামেশা করবে।'

তিনি আরও এগিয়ে একথাও বললেন :

'স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির এটি একটি সাধারণ শর্ত যে সরকারের সীমানা জাতীয়তার সীমানার সঙ্গে এক জায়গায় মিলবে।'

এইভাবে ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে জাতীয়তার তত্ত্ব জনগণের ইচ্ছার সার্বভৌমত্বের গণতান্ত্রিক তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত আছে। এর অর্থ হল, জাতীয় রাষ্ট্রের জন্য জাতীয়তার দাবি করার সময় কোনও অভিযোগের বা ক্ষোভের ফর্দের সহায়তার প্রয়োজন নেই। জনগণের ইচ্ছাই যুক্তি হিসাবে যথেষ্ট।

কিন্তু তাদের দাবির সমর্থনে ক্ষোভের কথা যদি বলতেই হয়, তবে মুসলমানরা বলবে, এমন ক্ষোভ তাদের অনেক আছে। এইসবকে এককথায় সংক্ষেপ করা যায়—হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচার থেকে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ তাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

গোলটেবিল বৈঠকে মুসলমানরা তাদের 'চৌদ্দ দফা' বিষয় সম্বলিত রক্ষাকবচের একটি তালিকা পেশ করেছিল। বৈঠকের হিন্দু প্রতিনিধিরা তাতে সম্মত হয়নি। ফলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ সরকার মধ্যস্থতা করতে এসে 'সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত' দেয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে মুসলমানদের চৌদ্দটি বিষয়ই রক্ষিত হয়। এই 'সাম্প্রদায়িক অ্যাওয়ার্ড' নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে দারুণ তিক্ততার সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস কিন্তু এই দ্বন্দ্বের অংশীদার হয়নি, যদিও সাধারণভাবে সমস্ত হিন্দুরই এর প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছিল। কংগ্রেস অবশ্য সিদ্ধান্তটিকে জাতিবিরোধী মনে করেছিল এবং চেয়েছিল মুসলমানদের সম্মতিতেই এর পরিবর্তন ঘটানো যাবে। কিন্তু কংগ্রেস এত সতর্ক ছিল মুসলমান অনুভূতিকে আহত না করার জন্য, যে 'কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ডে'র নিন্দা করে সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলিতে যখন এক সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, কংগ্রেস তখন নিরপেক্ষ থাকে, পক্ষে বা বিপক্ষে যায়নি। মুসলমানরা কংগ্রেসের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে এক বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ বলে মনে করে।

হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলির নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়লাভ ঘটলেও মুসলমানরা মনে করেনি যে এতে তাদের শান্তি বিঘ্নিত হবে। তারা ধরে নিয়েছিল যে, কংগ্রেসের কাছে তাদের ভয়ের কোনও কারণ নেই এবং সম্ভাবনা যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মিলিতভাবে সংবিধান রচনার কাজে হাত দেবে। কিন্তু হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতে দু'বছর তিন মাস কংগ্রেসের শাসন, অতিবাহিত হলে সম্পূর্ণভাবে মোহভঙ্গ হয় তাদের—তারা কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতায় নামে। ১৯৩৯ সালের ২২ ডিসেম্বর 'ডেলিভারেন্স ডে' উদযাপনের সময় তাদের কংগ্রেস বিরোধিতার তীব্রতা ধরা পড়ল : খারাপ ব্যাপার হল, এই তীক্ততা শুধু কংগ্রেস সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ থাকেনি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গোলটেবিল বৈঠকে যে মুসলমানরা স্বরাজের দাবিতে গলা মিলিয়েছিল, তারাই স্বরাজের তীব্র বিরোধিতায় নামল।

কংগ্রেসের ওপর মুসলমানদের এত ক্রুদ্ধ হবার কারণ কী? মুসলিম লীগ ঘোষণা করেছে মুসলমানরা কংগ্রেস শাসনে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হয়েছে। লীগের গঠন করা দুটি কমিটি তদন্ত করে এই সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়েছে। যদিও এই বিষয়গুলি নিরপেক্ষ ট্রাইবুনাল দ্বারা বিচারসাপেক্ষ, তবুও বলা যায়, দুটি জিনিস নিঃসন্দেহে এই দ্বন্দ্বের অবকাশ তৈরি করেছে— ১. মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি বলে মেনে নিতে কংগ্রেসের অসম্মতি এবং ২. কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তৃক নাকচ।

প্রথম প্রশ্নে, কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই অনড়। মুসলিম লীগকে অনেক মুসলমান রাজনৈতিক সংগঠনের একটি বলে মেনে নিতে কংগ্রেস প্রস্তুত, যেমন আরও সংগঠন আছে, আদ্‌রারস, ন্যাশনাল মুসলিম ও জামায়েত-উল-উলেমা। কিন্তু লীগকে কখনও একমাত্র মুসলমান প্রতিনিধি বলে মানতে রাজি নয়। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগও কোনও আলোচনায় যেতে রাজি নয়, যদি না, তাকে ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন বলে স্বীকার করা হয়।

হিন্দুরা লীগের দাবিকে অবিবেচনাপ্রসূত' আখ্যা দিয়ে নিন্দিত করেছে। মুসলমানরা বলতে পারে যে বিভিন্ন নেশনের মধ্যে কীভাবে চুক্তি হয় তার অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকলেই হিন্দুরা তাদের মতের অসারতা ধরতে পারবে। এই যুক্তি দেখানো যায় যে, একটি নেশন যখন অন্যকোনো নেশনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে যায়, তখন সে অন্য নেশনের সরকারকে প্রতিনিধি বলে মেনে নিয়েই এগোয়। কোনও দেশেই সরকার সমস্ত লোকের প্রতিনিধিত্ব করে না। সর্বত্র সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠেরই প্রতিনিধিত্ব করে। তাই বলে কোনও নেশন বিবাদের মীমাংসার জন্য অন্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে অস্বীকার করে না এই যুক্তিতে যে, ঐ সরকার সকলের প্রতিনিধি নয়। সরকার যদি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়, তবে তাই যথেষ্ট। মুসলমানরাও বলতে পারে যে, এই তুলনা কংগ্রেস-লীগ বিবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত। লীগ সমস্ত মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব না করলেও যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি হয়, তাহলে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে লীগের সঙ্গে সমঝোতায় যেতে, কংগ্রেসের আপত্তি থাকা উচিত নয়। কোনও দেশের সরকার অবশ্যই অন্য দেশের সরকারকে স্বীকৃতি না জানাতে পারে, যদি সেই দেশের একের বেশি দল, নিজেদের সরকার বলে দাবি করে। একই ভাবে কংগ্রেস লীগকে স্বীকার নাও করতে পারে। তবে তার অবশ্যই উচিত ন্যাশনাল মুসলিমস্ বা আদরারস্ বা জামায়েত-উল-উলেমাকে স্বীকার করা এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিটমাটের ব্যবস্থা করা। তবে এ-ব্যাপারে অবশ্যই সচেতন হয়ে এগোতে হবে যে, লীগের সঙ্গে চুক্তি অথবা অন্য কোনও মুসলমান দলের সঙ্গে চুক্তি, কোনও চুক্তি মুসলমানরা মেনে নেবে না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কংগ্রেসকে যে কোনও একটি চুক্তিই করতে হবে। কিন্তু কোনও দলের সঙ্গেই চুক্তি না করাটা শুধু অবিবেচকের কাজ নয়, ক্ষতিকারক হবে। কংগ্রেসের এই দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানদের বিরক্তির কারণ হবে। তারা যথাযথভাবেই কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা এইভাবে করে যে, তাদেরকে দুর্বল করে তোলার উদ্দেশ্যেই এটি তাদের মধ্যে নানা বিভেদ তৈরির চেষ্টা মাত্র।

দ্বিতীয় বিষয়ে, মুসলমানদের দাবি হল যে, মন্ত্রীসভায় মুসলমান রাখতে হবে এবং তাদেরই, যাদের প্রতি বিধানসভার মুসলমান সদস্যদের আস্থা আছে। তারা আশা করেছিল কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে তাদের এই দাবি মানা হবে। কিন্তু তারা আশাহত হয়েছে। তাদের এই দাবি সম্পর্কে কংগ্রেস আইনি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। কংগ্রেস মন্ত্রীসভায় মুসলমান মন্ত্রী রাখতে রাজি হয়েছিল এই শর্তে যে, তারা তাদের দল থেকে পদত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দেবে এবং কংগ্রেসের নামে শপথ গ্রহণ করবে। তিনটি কারণে মুসলমানরা এই শর্ত মানতে চায়নি।

প্রথমত, তারা একে বিশ্বাসভঙ্গতা বলে মনে করেছিল। তারা বলে যে তাদের দাবি সংবিধানের প্রকৃতিবিরোধী ছিল না। গোলটেবিল বৈঠকে ঐকমত্য হয়েছিল যে, মন্ত্রীসভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিত্ব থাকবে। সংখ্যালঘুরা চেয়েছিল যে, এই বিষয়ে আইনের বিধি তৈরি করতে হবে। পক্ষান্তরে, হিন্দুরা চেয়েছিল যে, এটিকে প্রথা নিয়ন্ত্রিত করা হোক। একটা মধ্যপন্থা খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। ফলে সবাই একমত হয়ে মেনে নিয়েছিল যে, প্রদেশগুলির গর্ভনরদের জন্য নির্ধারিত ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ইনস্টাকসন্স-এ তা নথিবদ্ধ হবে, গর্ভনররা দেখবেন যাতে এই প্রথা মন্ত্রীসভা গঠনের সময় অনুসরণ করা হয়। মুসলমানরা এটিকে আইনের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করেনি, কারণ তারা হিন্দুদের ওপর বিশ্বাস রাখতে পেরেছিল। এই চুক্তি এমন এক দলের দ্বারা ভঙ্গ করা হয়েছে, যে দল মুসলমানদের এই ধারণা দিয়েছিল তাদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি শুধু সঠিক হবে না, বিবেচকের মতোও হবে।

দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের ধারণা হয়েছিল যে, চুক্তির যে আসল উদ্দেশ্য তার অপব্যাখ্যা করছে কংগ্রেস। ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ইনস্টাকসন্স-এর ধারণার ভাষাগত অর্থ করে কংগ্রেস যুক্তি দেখাচ্ছে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য কথাটির একটিই নাকি অর্থ হতে পারে, যা হল— এমন একজন যার প্রতি সম্প্রদায়ের আস্থা আছে। এই দিক থেকে কংগ্রেসের অবস্থান নির্দিষ্ট ধারার অর্থ-বিরোধী এবং চেষ্টা হল দেশের অন্য সব দলকে ভেঙে কংগ্রেসকে দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দলে পরিণত করা। এ ছাড়া কংগ্রেসের শপথ বাক্যে স্বাক্ষর করার অন্য উদ্দেশ্য হতে পারে না। এই ধরনের একটি টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টাকে হিন্দুরা স্বাগত জানাতে পারে, কিন্তু স্বাধীন মানুষ হিসাবে মুসলমানদের রাজনৈতিক মৃত্যু তাতে অবধারিত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলমানদের বিদ্বেষ আরও ঘনীভূত হল যখন তারা দেখল গভর্নররা, যাদের ওপর প্রথাভিত্তিক বিধি আরোপের দায়িত্ব ছিল, কার্যকর ব্যবস্থা নিলেন না। কোনও কোনও গভর্নর সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন কারণ তারা অসহায় — সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কংগ্রেস একাই সরকার গঠন করতে পারবে, এবং সংবিধানকে মুলতুবি না রেখে কংগ্রেস ভিন্ন অন্য কোনও বিকল্পও ছিল না। কোন কোন গভর্নর প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ তারা সরাসরির কংগ্রেসের কর্মঠ সমর্থক হয়েছিলেন এবং তাদের কংগ্রেসের প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিলেন কংগ্রেসের প্রশংসা করে বা কংগ্রেস দলের পোশাক খাদি পরে। কারণগুলি যাই হোক, মুসলমানরা দেখেছিল যে, একটি প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ দিয়েও নিজেদের বাঁচানো গেল না।

মুসলমানদের এইসব অভিযোগ সম্পর্কে কংগ্রেসের উত্তর দু'ধরনের। প্রথমত, বলে যে, কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা তারা মন্ত্রীসভার যৌথ দায়িত্ব ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। মুসলমানরা এই যুক্তিকে সৎ বলে মানতে চাইল না। ইংরেজরাই একমাত্র জাতি যারা, শাসনব্যবস্থায় এটিকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যেও প্রথাটির ব্যতিক্রমী উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই বিষয়ে বিতর্ক হয়েছে এবং তারা সিদ্ধান্তে এসেছে, প্রথাটির পবিত্রতা এত কঠোর নয় যে, কোন ব্যতিক্রম ঘটলে সরকারি শাসনযন্ত্রে দক্ষতা কমে যাবে। দ্বিতীয়ত, বাস্তব সত্য হল, কংগ্রেস সরকারের মধ্যে কোন যৌথ দায়িত্ব চেতনা ছিল না। সরকার নানা বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক মন্ত্রী অন্যের থেকে স্বাধীন এবং প্রধানমন্ত্রীও অন্য একজন মন্ত্রীর মতনই। সুতরাং কংগ্রেসের পক্ষে সম্মিলিত দায়িত্বের কথা বলা সত্যিই অসংগত ছিল। অজুহাতে সততা ছিল না, কেননা এটি সত্য যে, যে সব প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না, সেখানে তারা অন্য দলের মন্ত্রীকে কংগ্রেসের শপথ না করিয়েও কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেছে। মুসলমানদের এ-প্রশ্ন করার অধিকার আছে, 'কোয়ালিশন যদি খারাপ হয় তবে তা একজায়গায় ভালো অন্য জায়গায় খারাপ হয় কী করে?'

কংগ্রেসের দ্বিতীয় উত্তর হল, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের আস্থা নেই এমন মুসলমান মন্ত্রী মন্ত্রিসভায় না নিলেও তাদের স্বার্থরক্ষার দিকটি কংগ্রেস [illegible] দেখেছে। কংগ্রেস নিশ্চয় মুসলমানদের স্বার্থের দিকটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এটি সেই চিন্তা যা সরকার সম্পর্কে পোপ বলেছেন তার কবিতায়—

'For forms of government let fools contest.
What is best administered is best.'

[illegible] কংগ্রেস [illegible] মুসলমান ও সংখ্যালঘুদের [illegible] কী, তা ভুলে গেছে। কিন্তু এই বিষয় নয় যে মুসলমান ও সংখ্যালঘুদের জন্য কংগ্রেস আসলে [illegible] কী করেছে। বিবাদের বিষয়টি স্বতন্ত্র। [illegible]

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিন্দুরাই কি শাসক সম্প্রদায় হবে এবং মুসলমান ও অন্য সংখ্যালঘুরা শাসিত সম্প্রদায়? কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার দাবির মধ্যে এই বিষয়টি নিহিত। এক্ষেত্রে, মুসলমান ও অন্য সংখ্যালঘুদের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। তারা শাসিত সম্প্রদায়ের অবস্থানটি মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

শাসক সম্প্রদায় শাসিতদের অনেক ভালো করেছে একথা অপ্রাসঙ্গিক এবং সংখ্যালঘুরা যখন শাসিত মানুষ হিসেবে গণ্য হতে চাইছেন না তখন তাদের যুক্তির উত্তর এ-কথা নয়। ব্রিটিশরা ভারতে ভারতীয়দের জন্য অনেক ভালো কাজ করেছে। তারা রাস্তাঘাটের উন্নতি করেছে, ক্যানাল কাটিয়েছে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে, রেলওয়ে পরিবহনের ব্যবস্থা করেছে, পোনি পোস্ট চিঠি পৌছানোর ব্যবস্থা করেছে, বিদ্যুৎ গতিতে সংবাদ পৌছে দিয়েছে, মুদ্রার উন্নতি ঘটিয়েছে, ওজন ও মাপের নিয়ন্ত্রণ করেছে, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণাকে সঠিক করেছে, ভারতীয়দের অন্তর্কলহ মিটিয়েছে এবং তাদের জাগতিক বিষয়ে অনেক উন্নতি ঘটিয়েছে। এইসব সরকারি ভালো কাজের জন্য কেউ কি ব্রিটিশদের কাছে ভারতীয়দের চিরকৃতজ্ঞ থাকতে এবং স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন ত্যাগ করতে বলছে? অথবা, এইসব সামাজিক উন্নয়ন কর্মের জন্য ভারতীয়রা কি ব্রিটিশের অধীনস্থ হয়ে থাকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা বন্ধ করেছে? ভারতীয়রা সেসব কিছুই করেনি। ঐসব ভালো কাজে তারা সন্তুষ্ট থাকেনি, এবং স্বশাসনের জন্য আন্দোলন চালিয়ে গেছে। এরকম হওয়া উচিত। আইরিশ দেশপ্রেমী কুরান যেমন বলেছেন—আত্মসম্মানের বিনিময়ে কেউ কারো কাছে থাকতে পারে না, কোনও নারী সম্ভ্রমের বিনিময়ে কারো কাছে কৃতজ্ঞ হবে না এবং কেউ তার জাতি সম্মানের বিনিময়ে কৃতজ্ঞ থাকবে না। কেউ অন্য রকম করলে তার অর্থ হবে সেই লোকটির জীবনবোধ, কার্লাইলের ভাষায়, 'শূকরের জীবনবোধ'। কংগ্রেস হাইকমান্ড একথা উপলব্ধি করেছে বলে মনে হয় না যে, মুসলমান ও অন্য সংখ্যালঘুরা কংগ্রেসের তরফ থেকে কিছু ভালো কাজের চেয়ে তাদের আত্মমর্যাদার স্বীকৃতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিরা শূকরছানা নয় যে, শুধু খাবারের খোঁজই করবে। তাদের অহংকার আছে, যা তারা স্বর্ণের লোভেও ছাড়বে না। এককথায়, 'খাদ্যের চেয়ে জীবন অনেক বড়।'

এ-কথা বলে লাভ হবে না যে, কংগ্রেস হিন্দু সংগঠন নয়। একটি সংগঠন, যা গঠনের দিক থেকে হিন্দুপ্রধান, তা হিন্দু মনকে প্রতিফলিত করবে এবং হিন্দুদের আকাঙ্ক্ষাকেই সাহায্য করবে। কংগ্রেসে ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে, হিন্দু মহাসভা তার কথাবার্তায় অবশিষ্ট ও কাজকর্মে নিষ্ঠুর, আর কংগ্রেস হল চতুর ও মার্জিত। এই বাস্তবিক ফারাকটুকু ছাড়া, কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে অন্য কোনো পার্থক্য নেই।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তেমনিভাবে, এ কথাও বলা বৃথা যে, কংগ্রেস শাসক ও শাসিতের পার্থক্যকে স্বীকার করে না। যদি তা স্বীকার করে, তবে কংগ্রেস নিশ্চয় তার সততার প্রমাণ দেবে এটা দেখিয়ে যে, সে অন্য সব সম্প্রদায়কে স্বাধীন ও সনাতনী বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত। এই স্বীকৃতির প্রমাণ কোথায়? আমার মনে হয়, একটি মাত্র প্রমাণ আছে, তা হল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির কার্যকরী প্রতিনিধিদের সঙ্গে শাসনক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার সম্মতি প্রদান। কংগ্রেস কি তার জন্য প্রস্তুত? এর উত্তর সবার জানা। কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য নেই, এমন কোনো সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির সঙ্গে শাসনক্ষমতা ভাগ করে নিতে কংগ্রেস প্রস্তুত নয়। কংগ্রেসের আনুগত্য হল শাসনক্ষমতায় অংশদানের প্রাক্-শর্ত। কংগ্রেসের এটিই নিয়ম বলে মনে হয় যে, কোনো সম্প্রদায়ের আনুগত্য না পেলে, সেই সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বাদ রাখা হবে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বাদ রাখাই হলো, শাসক সম্প্রদায় ও শাসিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যের মূল কথা। এই নীতি যখন কংগ্রেস মেনে চলছে, তখন একথা বলা যাবে যে, শাসনক্ষমতায় থাকার সময়, কংগ্রেস এই পার্থক্যটিকেই কার্যকরী করেছে। মুসলমানরা তাই অভিযোগ করতেই পারে যে, তারা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেছে এবং শাসিত অংশ হিসাবে তাদের অবস্থানের এই অবনয়ন প্রবচনের সেই লাস্ট স্টেজ হিসাবে উপস্থিত হয়েছে।

ভারতে তাদের অধোগতি ও পতন শুরু হয়েছে, যেদিন থেকে ব্রিটিশ অধীনে এসেছে এই দেশ। প্রশাসনিক বা আইনগত যে পরিবর্তনই ইংরেজরা এনেছে, তা মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর ক্রমাগত আঘাত করেছে। ভারতের মুসলমান শাসকরা দেওয়ানি বিষয়গুলিতে হিন্দু আইনকানুন টিকিয়ে রাখতে বাধা দেয়নি। কিন্তু হিন্দু ফৌজদারি আইন তারা বাতিল করেছিল এবং হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে মুসলমান ফৌজদারি আইন মানতে বাধ্য করে। ইংরেজরা প্রথমেই যা করেছে তা হল আস্তে আস্তে মুসলমান ফৌজদারি আইনকে হটিয়ে নিজেদের মতো আইন প্রণয়ন, যা শেষ অবধি ম্যাকলের পেনাল কোড প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। ভারতে মুসলমানদের আত্মসম্মান ও অবস্থানের ওপর এটিই ছিল প্রথম আঘাত। এরপর এসেছিল শরীয়ত বা মুসলমান দেওয়ানি বিধির প্রয়োগ ক্ষেত্রে সংকোচন। এই আইনের প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়গুলিতে, যেমন বিবাহ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি এবং তারপর শুধু ইংরেজদের অনুমতিসাপেক্ষ বিষয়ে। পাশাপাশি, ১৮৩৭ সালে প্রশাসন ও আদালতের অফিসিয়াল ভাষা হিসাবে ফারসীকে অপসারিত করা হয়েছে এবং ইংরেজি ভাষাকে নিয়ে আসা হয়েছে, আর ফারসীর পরিবর্তে আনা হয়েছে মাতৃভাষাকে। তারপর কাজী পদের বিলোপসাধন করা হয়েছে। অথচ এই কাজীরা মুসলমান শাসনে শরীয়তের শাসন রক্ষা করেছে। তাদের জায়গায় 'জাজ ও ল' অফিসারদের নিয়োগ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করা হয়েছে, তাদের ধর্ম যাই হোক, মুসলমান আইন ব্যাখ্যা করার অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সিদ্ধান্ত মুসলমানদের মানতে বাধ্য করা হয়েছে। এসবই মুসলমানদের উপর দারুণ আঘাত হয়ে এসেছে। ফলত, মুসলমানরা দেখল যে, তাদের সম্ভ্রম নেই, তাদের আইন বদলে দেওয়া হয়েছে, তাদের ভাষা অবাবহৃত এবং তাদের শিক্ষার কোন আর্থিক মূল্য নেই। এসবের সঙ্গে সঙ্গে আরও আঘাত এল সিন্ধু প্রদেশের ওপর ব্রিটিশ দখল ও সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। শেষটি অর্থাৎ বিদ্রোহের ফলে মুসলমানদের মধ্যেকার উচ্চশ্রেণী বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল—বিদ্রোহের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের সন্দেহে শাস্তি হিসাবে ব্রিটিশ কর্তৃক সম্পত্তি অধিগ্রহণের ফলে তারা প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হল। বিদ্রোহ শেষ হলে উচ্চশ্রেণী-নিম্নশ্রেণী নির্বিশেষে মুসলমানদের বিখণ্ড অহংকার তলানিতে এসে ঠেকল। মানসম্মান নেই, শিক্ষা নেই, সম্পদ নেই—এই অবস্থায় মুসলমানরা হিন্দুদের সামনে দাঁড়াল। পক্ষপাতহীনতার ভান করে ইংরেজরা এই দুই সম্প্রদায়ের বিবাদে ফলাফলের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকল। এই ফলাফল হল, মুসলমানরা তাদের ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থার নিম্নপাদে দাঁড়িয়েছে। ব্রিটিশের ভারত অধিকারের ফলে, দুই সম্প্রদায়ের আপেক্ষিক অবস্থায় সম্পূর্ণ এক রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটেছে। ছয় শত বছর ধরে মুসলমানরা হিন্দুদের প্রভু হয়ে থেকেছে। ব্রিটিশ শাসন তাদের হিন্দুদের সব অবস্থায় নামিয়ে এনেছে। প্রভু থেকে সমশ্রেণীর প্রজায় পর্যবসিত হওয়াই যথেষ্ট অধোগতি, কিন্তু সমশ্রেণীর প্রজার অবস্থান থেকে হিন্দুদের অধস্তন হওয়া—এই পরিবর্তন সত্যি অবমাননাকর। তারা যদি এই অসহ্য অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পৃথক জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করে, যেখানে মুসলমানরা তাদের নিজস্ব শান্তির গৃহ পাবে এবং যেখানে শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে শাসিত সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বের ফলে তাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে না, তা হলে তা নিশ্চয় অস্বাভাবিক হবে না—মুসলমানরা এ-কথা বলতেই পারে।

বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর রচনা-সম্ভার থেকে

তথ্যসূত্র :

১. ভারত সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং ২৮৩২, তারিখ ১ সেপ্টেম্বর ১৯০৫। দুটি প্রদেশ আলাদা প্রশাসনিক একক হিসাবে ঘোষিত হয় অক্টোবর ১৬, ১৯০৫।

২. এটি করা হয়েছে 'ভারত শাসন আইন' ১৯৩৫ অনুসারে।

৩. কর্নাটক এও চায় যে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কিছু জেলা কর্নাটকের সঙ্গে যুক্ত হোক।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভারতের রাজনীতিতে জিন্নাহ্‌র ছায়া

সাইয়েদ শাহাবুদ্দীন

জিন্নাহ্ সেকুলার ছিলেন কি ছিলেন না, সে-আলোচনা ততক্ষণ পর্যন্ত একেবারেই নিরর্থক, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেকুলার কথাটির অর্থ নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট হয়ে যায়। সাধারণভাবে সেকুলার কথার অর্থ হল ধর্মহীন হওয়া এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও কর্তব্য থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে থাকা। সেদিক থেকে তো গান্ধীজী এবং মাওলানা আযাদও সেকুলার ছিলেন না। তবে জিন্নাহ্‌কে সেকুলার বলা যেতে পারে, তার শেরওয়ানী ও জিন্নাহ্ ক্যাপ পরিধান করে 'কায়দ-ই-আযম' হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। নেহরু একেবারেই ধর্মহীন ছিলেন, তবে যেহেতু হিন্দুধর্মের কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, সেজন্য তিনি নিজেকে এবং অন্য লোক তাকে হিন্দু মনে করতেন।

সেকুলারিজম রাষ্ট্রের এমনই এক কর্তব্য যার ভিত্তিতে প্রতিটি নাগরিককে সমান মনে করা হয়, সে নাগরিক যে ধর্মেরই লোক হোক না কেন। প্রতিটি ব্যক্তি নিজ পছন্দ অনুযায়ী ধর্মাচরণ করতে পারে, কিন্তু একজন ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা সরকারের প্রতিনিধি বা আইনবিদের আসনে বসে সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ধর্মকে চাপিয়ে দিতে পারে না। সেজন্য একজন ধর্মীয় ব্যক্তি সরকারি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সেকুলার হতে পারেন। অপরদিকে একজন ধর্মহীন ব্যক্তি সেকুলার-বিরোধী বা সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে পারেন।

জিন্নাহ্‌র নাম দ্বি-জাতিতত্ত্বের সাথে যুক্ত। এই তত্ত্বে কেবলমাত্র দুটি ধর্মের লোক অন্তর্ভুক্ত। শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ জৈন ও পার্সিরা নয়। সেজন্য প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, যদি হিন্দু ও মুসলমানরা জাতি হয়, তাহলে অন্য ধর্মের লোকেরা কেন জাতি নয়? সেজন্য জিন্নাহ্‌কে বহুজাতি তত্ত্বের প্রচারক হওয়া উচিত ছিল। ১৯৩৭ সালের পরে তিনি যেরূপ চিন্তাধারা প্রচার করেছেন তাকে ধর্মাশ্রিত জাতীয়তাবাদী বা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী বলা যায়। এরই পাশাপাশি আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদও ছিল— যার অর্থ হল এই যে, যে সকল লোক এক নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে তারা একটা জাতি। সেই এলাকায় বসবাসকারীদের মধ্যে ঐক্যবোধ ও পারস্পরিক যোগাযোগ, সরকারে অংশগ্রহণ, সম্মিলিতভাবে দেশরক্ষা ও সুখ-দুঃখের সাথী হওয়ার মনোভাব গড়ে ওঠে। তবে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদকে সেকুলার হতে হয়, কারণ সেই এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের লোকজন বসবাস করে। এর বিপরীত দিকে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ বিশেষ ধর্মের অনুসারীদের শুধু নাগরিক মনে করে, সেই এলাকার অন্য ধর্মের বাসিন্দাদের থেকে পৃথক থাকে এবং নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করে, তাহলে সেটা সেকুলার-বিরোধী ও একটা ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে। দেশের স্বাধীনতা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লাভের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের বিশেষ ভূমিকা থাকে, কারণ এক সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। সেজন্য ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের উপর, যার ছত্রছায়ায় প্রত্যেক ধর্ম, অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু খুবই আফসোসের বিষয় যে, স্বাধীনতা আন্দোলন বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে পারেনি। সবচেয়ে বড় কথা হল যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারেনি। নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণের কথা বলা, ভারতে সাম্প্রদায়িকতা রূপে বিবেচিত হয়। এমনটা হওয়ার কথা নয়। সামাজিক ন্যায় বিচারের যুগে প্রতিটি গোষ্ঠীরই জাতীয় সম্পদ ও সম্পত্তি থেকে ন্যায্য প্রাপ্য পাওয়া উচিত। গণতন্ত্রের তাগিদই হল যে, প্রতিটি গোষ্ঠী তাদের অধিকার আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। সংখ্যালঘুদের নিরাপদে থাকাটাও জাতীয় স্বার্থ বলে গণ্য করা হয়। তবে তাদেরকে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক গণ্ডির মধ্যে থাকতে হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে জাতীয় আন্দোলন হয়েছে ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তি থেকে ১৯৪৭ সালে দেশভাগ পর্যন্ত। এই পরিস্থিতির জন্য কোনো একটা গোষ্ঠীকে দায়ি করা যায় না।

দেশভাগের পরিণতিতে যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে তা একেবারেই অযৌক্তিক ও অসম্পূর্ণ। ১৯৩৭ সালের পর জিন্নাহ্ এর পক্ষে ওকালতি করেছেন এবং ১৯৪০ সালের পর এটাই তার লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। এদিক থেকে তাকে বিভাজনপন্থী বলা যায়, তবে তাকে সেকুলার-বিরোধী বলা যায় না। কারণ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অখণ্ড ভারত গঠনের পক্ষে ছিলেন। অন্তবর্তীকালীন সরকারেও তিনি সাংবিধানিক সংরক্ষণ ও সংখ্যালঘু অধিকারের বিস্তারিত আলোচনা চেয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশ গঠিত হলেও দুটি দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের লোক থাকবেন এবং তাদেরকে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ ও সেকুলারিজম গ্রহণ করতে হবে এই চিন্তাভাবনা তার মাথায় ছিল। এরই ভিত্তিতে তিনি ১১ আগস্ট ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন, যেটা থেকে মি, আদবানী উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তবে ঘটনা যাই হোক জিন্নাহ্র চেয়ে ১৬ বছর আগে সাভারকর দ্বি-জাতিতত্ত্বের উল্লেখ করেছিলেন এবং ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণের ১৫ বছর আগে লালা লাজপত রায় দেশভাগের কথা বলেছিলেন। এ-কথা ঠিক যে, দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে জিন্নাহ্ পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন, তবে তিনি কি তাতে বিশ্বাস রাখতেন? ১৯২৮ সালে সর্বদলীয় সম্মেলনের ব্যর্থতা এবং পরবর্তী সময়ে গোল টেবিল বৈঠকে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে মতনৈক্যর কারণে তিনি রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে লন্ডনে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালের নির্বাচন এবং রাজ্যগুলোতে সরকার গঠনের তিক্ত অভিজ্ঞতা, মুসলমানদের মধ্যে তার সম্পর্কে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল না তারাই নিরাপত্তা পেল এবং যাদের এটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল তারাই অসহায় ও স্বজনহারা হয়ে পড়ল।

১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট জিন্নাহ্‌র ভাষণ পাকিস্তানে ধর্মীয় আবেগকে থামিয়ে রাখতে পারেনি বা সেটাকে ইসলামী রাষ্ট্রের নতুন গবেষণাগার রূপে গড়ে তুলতেও কোনো অসুবিধা ছিল না। পাকিস্তানের ইসলামপন্থীরা বলেই ছিল যে, শিশুর জন্মের সময়েই জিন্নাহ্ তাকে গলা টিপে মেরে ফেলল। তবে জিন্নাহ্‌র এই ভাষণ তার পিছু হটার কারণ হত না। কিন্তু এটুকু বলা যায় যে, তিনি যা করেছিলেন তার জন্য বহু লোক দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি মনস্থির করেছিলেন যে, দিল্লী গিয়ে নেহরুর সাথে দেখা করে বলবেন যে, বিভাজনের অবসান ঘটাও।

সকল অভিযোগ বা সকল কৃতিত্ব জিন্নাহ্‌র প্রতি আরোপ করলে তার প্রতি সুবিচার করা হবে না। ১৯২০ সালের পরের রাজনৈতিক অবস্থা, জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য, সংখ্যাগরিষ্ঠের মনোভাব, সমসাময়িকদের নির্বুদ্ধিতা, ইংরেজদের পক্ষপাতিত্ব, মুসলিম জনগণের নম্র মনোভাব, মুসলিম উলামাদের নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া পাকিস্তান গঠনের কারণ হয়ে ওঠে। এই ধরনের ঘটনাবলী বহু ঐতিহাসিক কার্যকারণের পরিণতিতে হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তিবিশেষের দয়া ও কৃপায় ঘটে না। জিন্নাহ্‌কে সেকুলাররূপে অভিহিত করাটা আদবানীর ভুল ছিল, তবে এই কথা বলাটা খুবই সত্য যে, পাকিস্তান আছে এবং বিভাজনকে খতম করা যাবে না। সবচেয়ে ভালো হবে এটাই যে, এই উপমহাদেশের জনগণ পরস্পর মিলেমিশে প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করবে। আর.এস.এস.-এর মস্তিষ্কে এখনও অখণ্ড ভারতের ভাবনা গ্রথিত আছে। তারা পাকিস্তানের অস্তিত্বকে সহ্য করতে পারে না। তারা ভারতীয় মুসলিমদের নিজস্ব পরিচিতি বজায় রাখার প্রচেষ্টাকেও সইতে পারে না। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদও তাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। তারা শুধু হিন্দু জাতীয়তাবাদ জানে ও মানে। আদবানী অত্যন্ত চতুরতার সাথে এর নামকরণ করেছেন—সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ।

মজার কথা হল যে, বাজপেয়ী লাহোরে যখন মিনারে পাকিস্তান সফর করলেন এবং নির্বাচনের স্বার্থে যখন মুসলিম কার্ড খেললেন সংঘ পরিবারকে ক্ষমতাসীন করার উদ্দেশ্যে, তখন আর.এস.এস. কোনো আপত্তি তোলেনি। এই সময়কালে যখন তারা ক্ষমতাসীন নয়, তখন জিন্নাহ্‌র মাযারে আদবানীর উপস্থিতি এবং ১১ আগস্ট ১৯৪৭ সালের বক্তৃতার ভিত্তিতে তাকে সেকুলার অভিহিত করায় তারা (আর.এস.এস.) অত্যন্ত ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ। বিজেপির অভ্যন্তরে উত্তরাধিকারের লড়াই এবং বিজেপি ও আর.এস. এস.-এর আদর্শগত দ্বন্দ্বের জন্য এমন প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকতে পারে। আর.এস.এস. চাইছে বিখ্যাত জাতীয় নেতৃবৃন্দকে সরিয়ে তাদের স্থানে নির্ভরযোগ্য অনুগত ও তরুণ প্রজন্মকে নেতৃত্বে বসানো হোক, তাহলে তারা আর.এস.এস.-এর সাহায্য ছাড়া এক কদমও চলতে পারবে না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তবে আদবানীর পাকিস্তান যাত্রা এবং এসব মন্তব্য করার রহস্যটা কী? একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হওয়ার সুবাদে তিনি খুব ভালোভাবে জানতেন যে, এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে। তিনি কি তাহলে চান যে, তার ভাবমূর্তি বদলে যাক এবং বাজপেয়ীর একমাত্র উত্তরাধিকার হয়ে উঠুক, যা এন.ডি.এ.-র অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠুক? তিনি কি নিজের মুসলিম কার্ড খেলতে চান? কিন্তু সেইজন্য পাকিস্তান যাত্রা ও এইসব কথা বলার প্রয়োজন কী? তিনি কি ভেবে দেখেছেন যে, এই কাজ মুসলমান, সেকুলার ও উদারপন্থীদের প্রভাবিত করবে? তিনি কি একেবারে ধরেই নিয়েছেন যে, তার রথযাত্রা, বাবরী মসজিদ ধ্বংস ও গুজরাতের গণহত্যা মুসলমানদের মানসিকতায় কোনো প্রভাব ফেলেনি? কোনো ভারতীয় মুসলমান পাকিস্তানকে তাদের রক্ষক মনে করে না। তা ছাড়া ভারতীয় মুসলমান ও সেকুলার, উদারপন্থী হিন্দুরা খুব ভালো করেই পরখ করে দেখবে যে, বিজেপি-র (আদবানীর) মুসলিম বিরোধিতা ও বিভেদপন্থী নীতিতে সত্যিই কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না? কিন্তু আর.এস.এস.-এর চিন্তাভাবনা হল এই যে, ভারতীয় মুসলমানদের পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ রয়েছে এবং পাকিস্তানের মাধ্যমেই তাদের অন্তর পর্যন্ত পৌঁছনো যেতে পারে।

পাকিস্তানের সফর ও সেখানে প্রদত্ত বিবৃতির প্রতিধ্বনি শোনা যেতে পারে। খোদা রক্ষা করুন, আবার যেন পুরাতন আঘাত নতুনভাবে দেখা না দেয়, গুজরাতের মতো জিন্নাহ্‌র আওলাদের উপর যেন আক্রোশ গিয়ে না পড়ে। আদবানীকে পাকিস্তান সফরে আমন্ত্রণের মধ্যে পাকিস্তানের কি উদ্দেশ্য ছিল, যখন তিনি ক্ষমতাসীনও নন? ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক উন্নত করার বিরোধী থেকেছেন। কাশ্মীর সম্পর্কে তিনি কঠোর নীতি গ্রহণের পক্ষে। ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি অনমনীয় মনোভাব পোষণ করেন। আগ্রা শীর্ষ বৈঠকের ব্যর্থতার জন্য আদবানীর নাম উল্লেখ করা হয়। সেই ব্যক্তিকে খাতির করে পাকিস্তানে মহাভারতের যুগের এক মন্দিরের সংস্কারের উদ্বোধন উপলক্ষে তাকে নিমন্ত্রণ করে পাকিস্তান কি পেতে চেয়েছিল?

পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা বিজেপি-র পরাজয়ে প্রকাশ্যভাবে হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন। পাকিস্তান মনে করে যে, ভারতে ইউ.পি.এ. সরকার পড়ে যাবে এবং আদবানীর নেতৃত্বে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে? তবে পাকিস্তান ভাবছে যে কট্টরপন্থী হিন্দু গোষ্ঠীর মনোভাব নরম হয়ে যাবে এবং ভারতের সাথে আদান-প্রদানে পাকিস্তানকে কিছু কিছু সুবিধা দেওয়া হবে। একটু চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, পাকিস্তান ও আর.এস.এস. উভয়েই ধর্মের ভিত্তিতে এক নতুনভাবে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভাগ করতে প্রস্তুত, উভয়ের লক্ষ্য অভিন্ন? পাকিস্তানকে জেনে রাখা দরকার যে, হিন্দু কট্টরপন্থীরা ইউ.পি.এ. সরকারের তরফে সামান্য সুবিধা প্রদানের তীব্র বিরোধিতা করবে এবং বিজেপি প্রদত্ত যে কোনো বড় সুবিধাকে গ্রহণ করবে। আদবানীর এই সফর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হতেও পারে।

ভাষান্তর : ফায়জুলবাশার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভারত বিভক্তির জন্য কেবলমাত্র জিন্নাহ্‌কে দায়ী করা যায় না

শত্রুঘ্ন কান্ত আচার্য

পাকিস্তান গিয়ে লালকৃষ্ণ জিন্নাহ্ সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, তার উপর ভারতে যে তিক্ত ও তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তা থেকে অনেক রক্ষণশীল মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছে। রক্ষণশীল মনোভাবে অর্থ হল এই যে, প্রথম থেকে কোনো বিষয়ে ফয়সালা করে নিয়ে সেই মতো মনমস্তিষ্ক গড়ে তোলা এবং সাক্ষ্য ও প্রমাণের পর্যালোচনা না করেই কোনো বিষয় ও আলোচনাকে উড়িয়ে দেওয়া। এগুলো তো জাতীয় স্তরে সেইসব আবেগ ও অনুভূতির পরিণতি, যার সঙ্গে সত্য ও তথ্যের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। ঘটনাপ্রবাহের নতুনভাবে পর্যালোচনা করা ও আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে আরও বৃদ্ধি করা দরকার। আমাদের অতীত ধ্যানধারণাকে চ্যালেঞ্জ করার প্রয়োজনও আছে।

জিন্নাহ্ নিষ্কলুষ নীতি, অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও সত্যপথের অনুসারী উকিল ছিলেন। তিনি ইংরেজ-বন্ধু ছিলেন, সাম্প্রদায়িকতার মতো কোনো বিষয় তার মধ্যে ছিল না। তিনি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ডিজাইন করা স্যুট পরতেন। তিনি ইংরেজিতে কথা বলতেন, শুয়োরের মাংস, কস্তুরা মাছ এবং মাছের আচার পছন্দ করতেন। শ্যাম্পেন, ব্রান্ডি, লাল রৌগানি রঙের ক্লার্ট সুরা পান করতেন, কষ্টের সঙ্গে খুব কম উর্দু বলতেন। তার ব্যবহারিক জীবনে আল্লাহ ও কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ। তিনি গান্ধীজী ও নেহরু সম্পর্কে অতি হীন মনোভাব ব্যক্ত করতেন। তাদেরকে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের পাত্র মনে করতেন। নেহরু সম্পর্কে তার অভিমত হল— "তাকে রাজনীতিবিদ না হয়ে ইংরেজির অধ্যাপক হওয়া উচিত ছিল।" আর গান্ধীজীকে তিনি 'ধূর্ত খেঁকশিয়াল' বলতেন।

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন

যে ব্যক্তি মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রচার দ্বারা নিজের জীবন আরম্ভ করেছিলেন। তিনি 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দূত' অভিধায় ভূষিত হয়েছিলেন। তারই প্রচেষ্টার ফলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বাৎসরিক অধিবেশন যৌথভাবে আরম্ভ করেছিল, যাতে পারস্পরিক পরামর্শ, আলোচনা ও অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া যায়। ১৯১৫ সালে উভয় সংগঠনের যৌথ অধিবেশন বোম্বাইতে এবং ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। কংগ্রেসের তরফে উদার মনে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার কারণে মুসলমানরা নিজেদের নীতি ও মতাদর্শগত বিরোধকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় এবং ব্রিটিশ শক্তির হাত থেকে স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে যৌথ প্রয়াসে সংগ্রাম করতে অগ্রসর হয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলমানদের একটা বড় অংশ সর্বদা কংগ্রেস দলের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করত এবং সাধারণভাবে এর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকত। মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষার প্রতি সেই সক্রিয়তা দেখায়নি, যেমন আগ্রহ তারা দেখিয়েছিল তাদের ধর্মীয় ও ক্লাসিক্যাল শিক্ষার প্রতি। তখনও তারা মোগল সম্রাটের মানমর্যাদা মনে পুষে বসেছিল এবং ব্রিটিশের প্রতি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত ছিল। তা ছাড়া তারা আরও মনে করত যে, সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘুদের স্বার্থ পদদলিত করবে। এমতাবস্থায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে দেওয়ার জন্য জিন্নাহ্ অবশ্যই কৃতিত্বের দাবিদার।

রাজনৈতিক ক্ষমতা

তবুও কংগ্রেসের প্রতি মুসলিমদের সংযোগ সেই সময় বৃদ্ধি পায় যখন গান্ধীজী কংগ্রেসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গান্ধীজীর নিকট ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। তাঁর অভিনব রাজনৈতিক ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করেন, যেটাকে আধ্যাত্মিক নেতৃত্বদান রূপেও অভিহিত করা যায়। মুসলিম জনগণের জন্য এটা ছিল একটা অভিশাপস্বরূপ যাকে তারা কট্টরপন্থী পুনর্জাগরণ বলে মনে করত।

জিন্নাহ্র উপর কংগ্রেসের জাদু সেই সময় শেষ হয়ে যায়। তিনি রাজনীতিতে গান্ধীজীর নীতির আহ্বান করার চরম বিরোধী ছিলেন। তিনি সেটাকে 'মূর্খ ও অজ্ঞদের সম্পর্ক' বলে প্রত্যাখ্যাত করেন। অবশেষে ১৯২০ সালে তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পরিত্যাগ করেন। তা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের নীতিতে অটল থাকেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে ব্রিটিশ সরকারের নীতিতে যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তারা উপলব্ধি করে যে, যুদ্ধের সময়ে ভারতীয়দের সেবার প্রতিদান দেওয়া দরকার। সেই উদ্দেশ্যে তারা মন্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশ করে। কিন্তু কংগ্রেস দল সেটাকে অপর্যাপ্ত, অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যজনক অভিহিত করে এবং নিন্দা করে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থপরতা ও মুলতুবী করে দেওয়া রীতিকে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, গাদ্দারী ও কপটতা বলে অভিহিত করেন।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সাথে সংঘর্ষ এড়ানোর উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত শাসন আইন কার্যকর করে ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার উদারপন্থী (লিবারাল পার্টির) সরকারের সংস্কারের প্রাথমিক কার্যকলাপের বিরোধিতা করে রক্ষণশীল (কনজারভেটিভ পার্টি) দলের সদস্যরা, যার ফলে ১৯৪৫ সালে শ্রমিক দলের (লেবার পার্টির) নির্বাচনে জয়ী হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতা হস্তান্তর মুলতুবী রাখা যায়। যদিও ১৯২০ ও ১৯৩০ দশকের মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি আইনসভায় এবং পরবর্তীকালে গোলটেবিল বৈঠকে পরিপূর্ণ চেষ্টা করেন। সাইমন কমিশনের বয়কট

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিভিন্ন গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিল।

ন্যায়সংগত দাবি

কিন্তু ১৯২৮ সালে সর্ব দলীয় বৈঠকে সেইসব দাবিগুলো স্বীকার করা হল না, যেটা মুসলমানদের তরফে জিন্নাহ্ পেশ করেছিলেন, অর্থাৎ ঐক্যমতের ভিত্তিতে গঠিত সরকার, সংখ্যালঘুদের বেশি বেশি সুবিধা প্রদান, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলিমদের এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব প্রদান, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সিন্ধু প্রদেশকে বোম্বাই থেকে পৃথক করা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংস্কার চালু করা। কংগ্রেস দল ন্যায়সংগত মুসলিম দাবি পূরণ করতে অস্বীকার করল এবং অপরদিকে জিন্নাহ্ 'নেহরু রিপোর্টে'ও সামান্যতম পরিবর্তন করাতে ব্যর্থ হলেন। যার ফলে মুসলিম লীগে তার অবস্থান দুর্বল হয়ে গেল এবং অতি দ্রুত তার নিয়ন্ত্রণ হারাতে লাগলেন। অনেক মুসলমান তাকে এমন এক জাতীয়তাবাদীরূপে আখ্যায়িত করতে লাগলেন যিনি মুসলমানদের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন যেমনভাবে পরবর্তীকালে 'ডেলি টেলিগ্রাফে'র কলিন রেড লিখেছেন যে, সাধারণ ধারণার বিপরীতে মুসলিম লীগ জিন্নাহ্ দ্বারা প্রভাবিত নয়, বরং তিনি পার্টি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন অনুসারে যখন নির্বাচিন হয়, জিন্নাহ্ সে সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও রাজ্যগুলোতে যৌথভাবে সরকার গঠনের চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে সেটা একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। এগারোটি রাজ্যের মধ্যে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, ছয়টি রাজ্যে—উড়িষ্যা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, ইউ.পি. বিহার ও সেন্ট্রাল প্রভিন্স (বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ)। যার ফলে সরকার গঠনে তারা মুসলিম লীগকে শামিল না করার ফয়সালা করে। অন্য পাঁচটি রাজ্যে বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, আসাম ও সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস এমন কোনো পার্টির সাথে যৌথ সরকার গড়তে অস্বীকার করে বসল, যারা তাদের মতাদর্শের অনুসারী নয়।

কংগ্রেস-মুসলিম লীগ

এই ধরনের পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্তের দরুন কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও জিন্নাহ্র মধ্যে ব্যবধান আরও বেড়ে গেল। যিনি তখনও পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিমূলক মনোভাব রাখতেন, তাকে নিজের মতাদর্শ পরিবর্তন ও এই বিষয় স্বীকার করতে বাধ্য হতে হল যে, মুসলমানরা কংগ্রেসী শাসনে ন্যায় বিচার বা পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের আশা করতে পারে না। এমনকী বাংলা প্রদেশে যৌথ সরকার গঠন প্রসঙ্গে গান্ধীজীর সাথে ব্যর্থ আলোচনার পর এ. কে. ফজলুল হককেও বলতে হয়— "কংগ্রেসের সাথে যৌথ সরকার গঠনের অর্থ হল ইসলামের মৃত্যুর পরোয়ানার উপর স্বাক্ষর করা।" তখন থেকেই হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক খারাপ হতে আরম্ভ করে এবং অতিদ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের সময় ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। কংগ্রেসে অখণ্ড ভারতের দাবি করে, অপরদিকে মুসলিম লীগ স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তানের দাবিতে অটল থাকে। ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন বিকল্প প্রস্তাবরূপে রাজ্যসমূহকে তিনটি স্তরে ভাগ করে। রাজ্যসমূহের গ্রুপ বা যুক্তরাষ্ট্র এবং একটা ইউনিয়ন। অনেক সন্দেহ ও ইতস্তত করার পর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ে এই প্রস্তাব মেনে নেয় এবং এ-বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে সিমলাতে প্রতিনিধি পাঠাতে রাজি হয়ে যায়, যদিও সিমলা কনফারেন্স কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে ব্যর্থ হয়। তারপরেও ১৯৪৬ সালের মে মাসে ক্যাবিনেট মিশন দেশি রাজ্যগুলো সহ সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠনের সুপারিশ করে, যাতে বলা হয়েছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে বিদেশ, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ বিষয়ক দপ্তর থাকবে, অন্যান্য বিষয়গুলো রাজ্যের এখতিয়ারে থাকবে। ভারতীয় রাজ্যগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়, তার মধ্যে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, বাংলা ও আসাম নিয়ে একটা খণ্ড এবং অবশিষ্ট ভারতবর্ষ নিয়ে অপর একটা খণ্ডে বিভক্ত করার কথা বলা হয়। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্যরা রাজ্য আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। এবং তাদের নিজের নিজের আইন প্রণয়নের জন্য পৃথকভাবে অধিবেশন আহ্বান করতে হবে। অর্থাৎ তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভার সংবিধান রচনা করবেন। ক্যাবিনেট মিশন এমন প্রস্তাবও দিয়েছিল যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের দ্বারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হোক।

জাতীয়তাবাদী মুসলমান

প্রথমদিকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ে এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল, কিন্তু শেষদিকে গান্ধীজীর তরফে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবের জন্য এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। কোনো জাতীয়তাবাদী মুসলিমকে শামিল করার প্রস্তাব মুসলিম লীগের জন্য একেবারে অসম্ভব ছিল। তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল যে, কংগ্রেস প্রাধান্য প্রতিহত করার একমাত্র উপায় হল এক সম্মিলিত ফ্রন্ট তৈরি করা। আর জাতীয়তাবাদী মুসলিম অজুহাত তুলে ছল-চাতুরী, তোষামোদ ও প্রলোভন দ্বারা তাদের মধ্যে বিরোধ ও বিভাজন সৃষ্টি করা হবে। তা ছাড়া কংগ্রেস দল অন্তর্বর্তী সরকারকে ক্যাবিনেট মর্যাদা দান ও গভর্নর জেনারেলের বিশেষ ক্ষমতা প্রত্যাহারের দাবি করল। এটাও মুসলিম লীগের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না, কারণ তারা মনে করত যে, গভর্নর জেনারেলের বিশেষ ক্ষমতার দ্বারাই কংগ্রেসকে নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে রাখা সম্ভব ছিল। অবশেষে ২৯ জুলাই ১৯৪৬ মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করার বিষয়টি প্রত্যাহার করে নেয় এবং পাকিস্তান আদায় করার জন্য ১৬ আগস্ট ১৯৪৬

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যার বিশেষ কারণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় জওহরলাল নেহরুর তরফে প্রদত্ত কিছু অদূরদর্শী বিবৃতি। সেটা হল এই যে, কংগ্রেস কেবলমাত্র আইনসভায় যোগ দিতে রাজি হয়েছে, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। তার মতে সেখানে হয়তো কোনো গ্রুপবাজি হবে না, যেটা মুসলিম লীগের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। তা ছাড়া ক্যাবিনেট মিশন কী চায় বা তার কী উদ্দেশ্য তা নিয়ে আমাদের কোনো ভাবনা নেই। জিন্নাহ্ সবসময় বলতেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে কংগ্রেস আন্তরিকভাবে আদৌ গ্রহণ করেনি, তা ছাড়া কংগ্রেসের বৈশিষ্ট্য হল যে, ভালো বাক্য ও সোজা কথা বিকৃত করে পেশ করা। জিন্নাহ্ এ-বিষয়েও আশঙ্কা করতেন। জওহরলালের পক্ষ থেকে সে-কথা বলা হয়, তাতে এই আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হল।

১৬ আগস্ট ১৯৪৬ সালে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশান ডে' পালন করা হয়। বাংলার মুসলিম লীগ সরকার সেটাকে সাধারণ ছুটির দিন ঘোষণা করে। সেদিন ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হল যা কয়েক দিন চলল। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহওয়ার্দী এই দাঙ্গায় উস্কানি দিয়েছিলেন। তার পরিকল্পনা প্রসঙ্গে জিন্নাহ্ জানতেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সেজন্য কলকাতার দাঙ্গার জন্য তাকে দায়ী করা বেশ শক্ত কাজ। তবে জিন্নাহ্ সোহওয়ার্দী সম্পর্কে খুব বেশি ভাবতেন না। কারণ তিনি তাকে সেইরকম বেইমান ও স্বার্থপর মনে করতেন, যার কোনো নীতি নেই।

রাজা গোপালচারী ফর্মূলা

ইতিপূর্বে ১৯৪৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সি. আর. গোপালচারী মহাশয় গান্ধীজী ও জিন্নাহ্র মধ্যে সি. আর. গোপালচারী ফর্মূলার আলোচনার জন্য এক সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন, যার অধীনে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সংলগ্ন জেলাগুলো চিহ্নিত করা হবে এবং সেগুলোর সমন্বয়ে পাকিস্তান গঠন করা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিটিং-এর পরিণতি ব্যর্থ হয়েছিল। বোম্বাইতে জিন্নাহ্র গৃহে আলোচনা চলাকালীন গান্ধীজীর দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল অতি মূল্যবান ইরানী কালীনের প্রতি, এই বিষয়টা জিন্নাহ্ কখনও ভুলতে পারেননি, সেটা ভুলে যাওয়াটাও সম্ভব নয়। এই বৈঠকের পরিণতি সম্পর্কে লর্ড ওয়াভেল নিজের ডায়রিতে লিখেছেন, "দুই বিশাল পাহাড় মিলিত হল, কিন্তু একটা ছোট্ট ইঁদুরছানাও বেরিয়ে এল না।" এ থেকেই ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দ্বন্দ্বও প্রকট হয়ে ওঠে যে, তারা পারস্পরিক কীরূপ বিদ্বেষপূর্ণ মেজাজ ও ভ্রান্ত ধারণার শিকার ছিল। ভারত ভাগের জন্য প্রত্যেকেই দায়ী, কেবল জিন্নাহ্ একা দায়ী নয়।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ছিলেন একজন কক্ষচ্যুত দেবদূত; ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা হওয়ার সকল যোগ্যতা তাঁর ছিল, কিন্তু তিনি কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ করলেন হয়তো কুরবানীর বকরী হওয়ার নিমিত্তেই।

ভাবানুবাদ : ফায়জুলবাশার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জিন্নাহ্ : রাজনীতির সন্ধিক্ষণে

শ্যামাপ্রসাদ বসু

১৯০৬ সালে জিন্নাহ্ প্রথম কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি দাদাভাই নৌরাজির সেক্রেটারি হিসাবে। ১৯০৮ সালে বালগঙ্গাধর তিলকের বিরুদ্ধে যখন ব্রিটিশ সরকার দেশদ্রোহিতার মামলা রুজু করেন তখন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিলক জিন্নাহ্‌কে ব্যারিস্টার হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। হিন্দুদের কাছে জিন্নাহ্ তখন ছিলেন প্রকৃতই এক রাজনৈতিক নায়ক। গোপালকৃষ্ণ গোখলে তাঁকে আখ্যা দিলেন, "হিন্দু মুসলমান ঐক্যের সর্বোত্তম রাষ্ট্রদূত'। ১৯১৬ সালে জিন্নাহ্ মুসলিম লিগের প্রেসিডেন্ট হিসাবে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে একজোট হয়ে লখনউ প্যাক্ট তৈরি করেছিলেন। লখনউ প্যাক্টের মূলকথা ছিল ভারতে স্বায়ত্তশাসন ও নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন। সেই সঙ্গে কংগ্রেস মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন প্রথা মেনে নিয়েছিল এবং কিছু প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় তাদের প্রতিনিধিত্বের তুলনামূলক সংখ্যাবৃদ্ধিকেও।

লখনউ প্যাক্টে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর কথা বলা হলেও জিন্নাহ্ এবং তিলক উভয়েই আশা প্রকাশ করেছিলেন এ-ধরনের ব্যবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হবে না বলে। কারণ দেশে দ্রুত এমন এক অনুকূল রাজনৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টি হবে যখন দেখা যাবে মুসলমানরা নিজেরাই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা তুলে দেবার কথা বলছে।

১৯১৯ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভা রাওলাট বিল সংক্রান্ত আলোচনায় জিন্নাহ্ অন্যান্য জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, তেজবাহাদুর সপ্রু প্রমুখ) একমত হয়ে তীব্র ভাষায় শুধু প্রতিবাদই জানাননি, তিনি আইনসভা থেকে পদত্যাগ পর্যন্ত করেছিলেন। এই আইনে সরকারের হাতে জরুরি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। সরকার তথাকথিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগে যে-কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারে এবং বিচারের সময় তিনি কোনো উকিলের সাহায্য পাবেন না এবং রায়ের বিরুদ্ধে কোনো আপিল গ্রাহ্য হবে না।

জিন্নাহ্ বক্তৃতা দিয়ে বলেছিলেন, যে সরকার শান্তির সময়ে এ-ধরনের আইন তৈরি করতে পারে তাকে আর যাই হোক সভ্য সরকার বলা যায় না। ৩ মার্চ ১৯২০, রাওলাট বিল পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিন্নাহ্ ইম্পিরিয়াল লেজিসলেচার থেকে পদত্যাগ করলেন।

আর ঠিক এই সময়ে ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজির আবির্ভাব ঘটল মূলত মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এর সঙ্গে যুক্ত হল কুখ্যাত

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাওলাট আইন এবং পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের দাবি। হাতিয়ার হিসাবে তিনি বেছে নিলেন অহিংস প্রত্যক্ষ গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে আইনের শাসনের বিরোধিতা যাকে এককথায় বলা যায় অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরের কংগ্রেস অধিবেশন শুধু অসহযোগ আন্দোলনকে বিপুলভাবে সমর্থন করল না, একই সঙ্গে গান্ধীজির সর্বময় কর্তৃত্বকেও মেনে নিল—যা জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক ভাবাদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল।

তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলমানদের ধর্মগুরু অথবা খলীফা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ইংরেজরা জয়ী হয়ে ক্ষমতার মদমত্ততায় তুরস্কে পরাজিত সুলতানের ক্ষমতা খর্ব না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও খর্ব করল। এর ফলে মুসলমান দুনীয়ায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল। গান্ধীজি এই ক্ষোভকে পুঁজি করে ভারতে মুসলমানদের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে সামিল করলেন 'খিলাফত'-এর নাম করে অথবা খলীফার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনের ডাক দিয়ে।

জিন্নাহ্‌র আপত্তি ছিল না ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনে, কিন্তু তার প্রচণ্ড আপত্তি ছিল ধর্মকে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করায়। এছাড়া গান্ধীজির আন্দোলনের কর্মসূচি এবং পদ্ধতি নিয়েও জিন্নাহ্‌র মতপার্থক্য ছিল। তিনি মনে করতেন এই আন্দোলন রূপায়িত হলে সারা দেশে বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতা দেখা যাবে। ফলে নাগপুর অধিবেশনে যখন অসহযোগ তথা খিলাফত আন্দোলনের প্রস্তাব এল তখন মুষ্টিমেয় যে ক'জন বিরোধিতা করেছিলেন তার মধ্যে জিন্নাহ্ ছিলেন অন্যতম। তিনি স্পষ্টভাবে প্রস্তাবের সমালোচনা করে বললেন, এটি পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক এবং নিয়মবিরুদ্ধ।

গান্ধীজির প্রস্তাবের অগণিত সমর্থকরা চিৎকার করে জিন্নাহ্‌র বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন— যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আলী ভ্রাতৃদ্বয় (মহম্মদ আলী এবং শওকত আলী)।

বস্তুত খিলাফত আন্দোলন জিন্নাহ্‌র সঙ্গে কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ ঘটাল। তখনকার মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একজন লীগের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসের সদস্য থাকতে পারতেন এবং কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে পারতেন। কিন্তু নাগপুর অধিবেশনের পর জিন্নাহ্ আর কখনও কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেননি।

দুই

১৯২০ সালে জিন্নাহ্ কংগ্রেস থেকে সরে এলেও তিনি তখনও পর্যন্ত একজন জাতীয়তাবাদী নেতা এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী। গান্ধীজি সহ কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্তরে তার বন্ধুত্ব অটুট এবং বোম্বাই (মুম্বাই)তে মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যেও তার প্রভাবে কোনো চিড় ধরেনি। অসহযোগ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
আন্দোলনকে সমর্থন না করলেও তিনি মুসলিম লীগের সদস্যদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, "আমি তবু সরকারকে বলব ভারতের জনগণকে যেন চরম অবস্থার দিকে ঠেলে না দেওয়া হয়, নতুবা তাদের কাছে অসহযোগের নীতি গ্রহণ ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ খোলা থাকবে না— যা মি. গান্ধীর কর্মসূচি না-ও হতে পারে। I would still ask the Government not to drive the people of India to desperation or else there is no other course left open to the people except to inaugurate the policy of non-cooperation, though not necessarily the programme of Mr. Gandhi."

জিন্নাহ্‌র তরুণী দ্বিতীয় স্ত্রী রুট্টেনবাঈ ছিলেন একজন পার্শি (প্রথম স্ত্রী বিবাহের কিছুদিনের মধ্যেই অসুস্থ অবস্থায় মারা যান) এবং ঘোরতর জাতীয়তাবাদী। অনেকে মনে করেন তারও একটা প্রভাব জিন্নাহ্‌র জীবনে পড়েছিল। ১৯২৭ সালের গোড়ার দিকে জিন্নাহ্ একবার অকংগ্রেস এবং অসাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠনের কথাও চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। তবে তিনি সফল হয়েছিলেন দিল্লীতে ১৯২৭ সালের মার্চে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মুসলমান জননেতাদের একটি সম্মেলনে জমায়েত করতে এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে বার করতে।

হিন্দু-মুসলমান বৈরিতার যে মূল কেন্দ্র পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী, তা জিন্নাহ্‌র প্রচেষ্টায় মুসলমান নেতারা পরিত্যাগ করতে রাজি হয়েছিলেন এবং তারা যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীতে সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। শর্ত ছিল প্রধানত চারটি। তার মধ্যে অন্যতম ছিল কেন্দ্রীয় আইনসভায় এক-তৃতীয়াংশ আসনের দাবি। কংগ্রেস থেকে একটি কমিটি তৈরি হয়েছিল দাবিগুলি পর্যালোচনার জন্য। তাতে সদস্য ছিলেন মতিলাল নেহরু, সরোজিনী নাইডু, মাওলানা মহম্মদ আলি, এবং শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। কমিটি মুসলমানদের উপরোক্ত দাবিগুলি মেনে নেওয়ার সুপারিশ করলে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি (এ আই সি সি) তাতে সম্মতি দেয়। একই সঙ্গে ঠিক হল মুসলমানদের কথা অনুযায়ী সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হবে এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ফলে নভেম্বরে (১৯২৭) যখন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে সাইমন কমিশন গঠনের ঘোষণা করা হল তখন তাকে বয়কটের ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও লীগের তরফে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার কমিটিও তৈরি হয়ে গিয়েছিল— যেক্ষেত্রে জিন্নাহ্‌র ভূমিকা আদৌ অনুল্লেখ্য ছিল না। বিশেষ করে যেখানে সাইমন কমিশনকে সমর্থন করার প্রশ্ন নিয়ে লীগের মধ্যেই দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল স্যার মহম্মদ শাফির নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাইমন কমিশনকে বয়কট করার মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক জীবন অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর আবার নতুন করে উদ্দীপ্ত হল। ফলে এরই মধ্যে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি একত্র বসে ঠিক করল ভারতের জন্য নতুন সংবিধান তারাই রচনা করবেন এবং দায়িত্ব দেওয়া হল কংগ্রেসের নেতৃত্বে মতিলাল নেহরুকে নিয়ে একটি কমিটিকে (মে, ১৯২৮)।

কমিটি তার রিপোর্ট (যা নেহরু রিপোর্ট বলে পরিচিত) আগস্ট মাসে পেশ করল। খসড়া রিপোর্টে অন্যান্যদের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে বাদ পড়ল মুসলমানদের উল্লিখিত দাবিগুলি। যদিও দিল্লি প্রস্তাবের দুটি বিষয় রিপোর্ট মেনে নিয়েছিল। অর্থাৎ সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠন। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের মূল দাবিটিকেই রিপোর্ট সরাসরি অগ্রাহ্য করল। রিপোর্টের বক্তব্য হল, প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের নীতিই সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হবে। কারণ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হলে সাম্প্রদায়িক সমস্যারও সমাধান আপনা থেকে হয়ে যাবে।

নেহরু রিপোর্টে দিল্লী প্রস্তাব সাধারণভাবে উপেক্ষিত হওয়ায় জিন্নাহ্ ক্ষুব্ধ হলেও শেষ পর্যন্ত শর্তাধীনে মানতে প্রস্তুত ছিলেন। একারণে ১৯২৮ সালের ২২ ডিসেম্বর কলকাতায় সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলন বসলে জিন্নাহ্ নেহরু রিপোর্টের উপর তিনটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন : (১) কেন্দ্রীয় আইনসভায় অন্তত এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্বের দাবি স্বীকার করতে হবে, (২) যদি প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার না করা হয় তাহলে অন্তত দশ বছরের জন্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলমানদের পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের আইনসভাগুলিতে প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে নিতে হবে, এবং (৩) বাড়তি ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রের পরিবর্তে প্রদেশগুলির হাতে তুলে দিতে হবে।

সংশোধনীগুলি মঞ্চে রাখার সময়ে জিন্নাহ্ এক আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন সংশোধনগুলি খুবই নরম ধরনের এবং ভারতের প্রগতির জন্য হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান একান্ত প্রয়োজন। তিনি বললেন, "আমি একজন মুসলমান হিসাবে বলছি না, বলছি একজন ভারতীয় হিসাবে। আমি চাই স্বাধীনতার লড়াইতে আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে চলুক সাত কোটি মুসলমানও। আমি চাই তেজবাহাদুর সপ্রুর মতো আপনারাও রাষ্ট্রনীতিবিদের পরিচয় দিন। (জিন্নাহ্র বক্তৃতার কিছু পূর্বে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু নেহরু রিপোর্টের উপরে বক্তৃতা দিতে গিয়ে জিন্নাহ্র সংশোধনগুলি গ্রহণ করতে আবেদন জানিয়েছিলেন। লেখক) সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের কিছু দিতে পারে না। এ কারণে আমাকে মিছামিছি বলা 'এই সামান্য পয়েন্টগুলো'র জন্য চাপ দেবেন না।... যদি এগুলি সামান্যই হয় তাহলে মেনে নিচ্ছেন না কেন? এটা সংখ্যাগুরুরাই পারে। কেবল সংখ্যাগুরুরাই দিতে পারে ...। আমরা রাজনীতির চর্চা করছি। আমরা আদালতে নেই... আমি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবার একবার বলছি : বিশ্বাস করুন আমাকে, ভারতের কোনো প্রগতি হবে না যদি না মুসলমান এবং হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং এ ব্যাপারে কোনো যুক্তি, দর্শন বা বিতর্ক যেন আপসের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হয়। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য দেখার চেয়ে বড় সুখ আমার কাছে আর কিছু নেই। (nothing will make me more happy than to see the Hindu-Muslim union)"।

দীর্ঘ উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্কের পর প্রধানত হিন্দুমহাসভা ও কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের জন্য জিন্নাহ্‌র সংশোধনগুলি বাতিল বলে গণ্য হল। প্রতিবাদে জিন্নাহ্ সম্মেলনকক্ষ পরিত্যাগ করেন। নেহরু প্রমুখ কংগ্রেসের বামপন্থীরা বিস্ময়করভাবে উদাসীন ছিলেন। একটা বহুপরিচিত রটনা আছে যে জিন্নাহ্ সম্মেলনকক্ষ পরিত্যাগ করে সোজা দিল্লিতে গিয়ে আগা খাঁ আহুত অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সে (৩১ ডিসেম্বর, ১৯২৮) যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল ক্ষুব্ধ আলী-ভ্রাতৃদ্বয় এবং বামপন্থী কবি মাওলানা হযরত মোহানীর মতো বড় মাপের মুসলমান নেতারা ওই সম্মেলনে যোগ দিলেও জিন্নাহ্ দেননি। তিনি সম্মেলনের আমন্ত্রণপত্র মুখের উপর ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

উপরোক্ত ঘটনার প্রায় সাতাত্তর বছর পরে যে-কোন প্রকৃত ইতিহাসের ছাত্রের কাছে বিস্ময় মনে হবে মাওলানা আযাদ এবং গান্ধীজির মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশপ্রেমিকরা থাকা সত্ত্বেও-যাঁর। সত্যিই হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন তারা কেন তেজবাহাদুর সপ্রু দ্বারা সমর্থিত জিন্নাহ্‌র সংশোধনগুলি গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিলেন না? পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, জয়াকর, ডা. মুঞ্জে (পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রাণপুরুষ) এবং হিন্দু মহাসভার নেতারা যখন তীব্র ভাষায় সংশোধনগুলির সমালোচনা করলেন, তখন সংরক্ষণের রক্ষাকবচের গুরুত্ব এবং সেই সঙ্গে পরবর্তী সময়ে তা বিলোপ করে দেবার প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখেও আযাদ, আসফ আলি, ডা. আনসারি, টি এ খান এবং চৌধুরী খালিকুজ্জমানের মতো জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতারা কোনো প্রতিবাদই করলেন না। ডা. আনসারি কনভেনশনে সভাপতি ছিলেন এবং একারণে হয়তো নিরপেক্ষ ছিলেন। কিন্তু তা হলেও যেহেতু গান্ধীজি সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে তার সঙ্গে প্রায়শই পরামর্শ করতেন, সে কারণে তিনি অন্তত তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তা তিনি করেননি।

২৩ ডিসেম্বর (১৯২৮) জিন্নাহ্ দিল্লি যাওয়ার জন্য হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে যান। তাঁকে ট্রেনে তুলতে সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁর পার্শি বন্ধু জামসেদ। ট্রেনে ওঠার আগে তাঁর হাত দুটি ধরে সজল চোখে জিন্নাহ্ বলেন, "জামসেদ এবার আমাদের পথ আলাদা (a parting of ways) হয়ে গেল।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যদিও জিন্নাহ্ সম্মেলনের মঞ্চে তার বক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমরা সবাই এই মৃত্তিকার সন্তান। আমাদের একসঙ্গে বাঁচতে হবে... যদি আমরা একমত না হতে পারি তাহলে অন্তত একমত হয়ে স্বীকার করি পার্থক্যটা, আমরা যেন বন্ধু হয়েই বিদায় নিতে পারি (If we cannot agree, let us at any rate agree to differ, but let us part as friend)।"

সর্বদলীয় সম্মেলন বা কনভেনশন সম্পর্কে মাওলানা আযাদের অভিমত ছিল, "মুসলমানরা বোকা বলে রক্ষাকবচ চেয়েছিল আর হিন্দুরা আরো বেশি বোকা বলে তাতে রাজি হল না।"

ফলাফল হল জিন্নাহ্ শুধু কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন না, আলী-ভ্রাতৃদ্বয়, যাঁরা ছিলেন খিলাফতের দিনগুলিতে গান্ধীজির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, তাঁরাও এখন মুসলিম লীগে যোগ দিলেন। বস্তুত, লীগ এবং কংগ্রেসের পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ বোঝাপড়ারও এখন থেকে বরাবরের মতো অবসান ঘটল।

তিন

কনভেশন থেকে ফিরে মাত্র তিন মাসের মধ্যে (মার্চ ১৯২৯), জিন্নাহ্ তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দ দফা দাবি পেশ করলেন। জমায়েত উল উলেমা-এ-হিন্দ তাকে সমর্থন জানালো। দাবির মূল কথা ছিল ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনায় মুসলমানদের তরফে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি। ১৯৩০ সালের নভেম্বরে লন্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক বসলে (নভেম্বর, ১৯৩০ থেকে জানুয়ারি ১৯৩১) জিন্নাহ্ লীগের তরফে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য লন্ডনে এলেন। সঙ্গে তার বোন ফতিমা এবং কন্যা দিনা। কিছুকাল হল ১৯২৯ সালে তাঁর পত্নীবিয়োগ ঘটেছে।

জিন্নাহ্ গোলটেবিল বৈঠকে লীগের তরফে সুপরিচিত ওই ১৪ দফা দাবি রেখেছিলেন। কংগ্রেসে যোগ দেয়নি, কিন্তু অন্য যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরাও (লিবারেল, হিন্দু দক্ষিণপন্থী, ভারতীয় রাজন্যবর্গ এবং মুসলমান নেতৃবৃন্দ) লীগের এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের দাবিতে একমত হলেন না। ফলে শেষ পর্যন্ত গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হল এবং মুসলমানদের আশা পূরণ হল না।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি হতাশ হলেন জিন্নাহ্ স্বয়ং। বৈঠকে যোগ দেবার আগে parting of ways বলা সত্ত্বেও তিনি ডিসেম্বর (১৯২৯) মাসে সবরমতি আশ্রমে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করেছিলেন গভর্নর জেনারেল আরউইন কর্তৃক সদ্য ঘোষিত (নভেম্বর, ১৯২৯) গোলটেবিল বৈঠকের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। গান্ধীজির এই বৈঠক বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে তাকে হতাশ করেছিল।

লীগসহ ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির অভ্যন্তরীণ দলাদলি ও দুর্বলতা তাঁকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল ভবিষ্যৎ ভারতের রাজনীতি সম্পর্কেও। তার কাছে হিন্দুরা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
ছিল শোধরানোর উর্দ্ধে আর মুসলিমরা মেরুদণ্ডহীন। লীগের উপরও তিনি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। ফলে গোলটেবিল বৈঠকের শেষে জিন্নাহ্ ঠিক করে ফেললেন তিনি দেশে আর ফিরবেন না, মেয়ে আর বোনকে নিয়ে বিলাতেই সংসার পাতবেন এবং জীবনের বাকি দিনগুলি ব্যারিস্টারি পেশাতেই নিজেকে নিযুক্ত রাখবেন। অনেকে বলেন পত্নীবিয়োগের মতো ব্যক্তিগত শোকও জিন্নাহ্কে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করেছিল। যদিও শেষের দিকে স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না, তথাপি মৃত্যুর স্মৃতি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বয়ে বেড়িয়েছিলেন। যখনই স্ত্রীর কথা মনে আসত তখনই তাকে দেখা গেছে শোবার ঘরে ঢুকে চোখে রুমাল মুছতে। জিন্নাহ্ যখন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল, তখন তার ব্যক্তিগত গাড়ির ড্রাইভারের কাছ থেকে বিখ্যাত উর্দু লেখক সাদাত হাসান মান্টো এ ধরনের ঘটনার কথা শুনেছিলেন।

লন্ডনে এরপর জিন্নাহ্ ব্যারিস্টারি পেশায় পুরোপুরি নিজেকে নিয়োগ করলেন। তবে রাজনীতি ছাড়লেও ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে তার কৌতূহলকে তিনি একেবারে সরিয়ে নেননি। যদিও ভারতে ফেরার ইচ্ছা তার একেবারেই ছিল না।

সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল যখন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসনবিধি অনুযায়ী ভারতে ব্রিটিশ সরকারের নতুন সংবিধানের ঘোষণা হল। এই ঘোষণায় মুসলমানদের সমস্ত দাবি মেনে নেওয়া হয়েছিল—সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশের স্বীকৃতি, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে মুসলমানদের জন্য আসনের সংরক্ষণ এবং পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী প্রথাকে অব্যাহত রাখা।

ফলে জিন্নাহ্র মনে হল যদি ভারতের মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধভাবে তার নেতৃত্বকে স্বীকার করে নেয় তাহলে তিনি ভারতে ফিরতে পারেন এবং তার রাজনৈতিক উচ্চাশাও পূরণ করতে পারেন। এইচ সি আর্মস্ট্রং-এর লেখা কামাল আতাতুর্কের জীবনীগ্রন্থ (গ্রে উলফ : অ্যান ইনটিমেট স্টাডি অব এ ডিক্টেটর) তাঁকে অনুপ্রাণিতও করেছিল। তাঁর শিশুকন্যাও অনেক সময় তাঁকে কৌতুক করে 'গ্রে উল্ফ' বলে ডাকত।

সৌভাগ্যবশত সেই নেতৃত্বের প্রস্তাব নিয়েই বিলাতে তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন মুসলিম লীগের দুই প্রধান নেতা লিয়াকত আলি খান এবং কবি মহম্মদ ইকবাল। লিয়াকত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের (তৎকালীন যুক্তপ্রদেশ) এক ধনী জমিদার এবং ইকবাল ছিলেন পাঞ্জাববাসী এবং ১৯৩০ সালে তিনি এক স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছিলেন— যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বালুচিস্তান।

১৯৩৫ সালের গোড়ায় জিন্নাহ্ ভারতে ফিরে এলেন। এখন কিন্তু তিনি আর হিন্দু মুসলমান ঐক্যের রাষ্ট্রদূত নন, তিনি কেবলমাত্র মুসলমানদের মুখপাত্র।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভারতে জিন্নাহ্‌র পুনরায় ফিরে আসা নিয়ে একটি বহু-প্রচলিত কাহিনি আছে। জওহরলাল নেহরুর এক বক্রোক্তি নাকি জিন্নাহ্‌কে প্ররোচিত করেছিল ভারতের রাজনীতিতে ফিরে আসতে এবং নেহরুকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চ্যালেঞ্জ জানাতে। কাহিনিটি হল, জিন্নাহ্‌র বিলাত যাওয়ার খবর নিয়ে উভয়ের এক পরিচিত ব্যক্তি জওহরলালের কাছে যান। খবরটি শুনেই জওহরলাল বলে ওঠেন, "আপদ গেছে (good riddance)!" বলাবাহুল্য উপরোক্ত উক্তিটি যথাসময়ে ওই ব্যক্তিটিই লন্ডনে জিন্নাহ্‌র কাছে পৌঁছে দিলে তিনি প্রচণ্ড রেগে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করেন ভারতে ফিরে এর সমুচিত জবাব দেবেন। (মাওলানা আযাদ, ভি এন দত্ত, পৃ. ১৪৭)।

কাহিনি যাই হোক, ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রেখেও মুসলমানরা যে-সমস্ত সুবিধা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে পেয়েছিল সেগুলিকে আরও সংহত ও শক্তিশালী করার একটা আকর্ষণ জিন্নাহ্‌কে প্রলুব্ধ করেছিল ভারতীয় রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

একটা কথা মনে রাখা দরকার, জিন্নাহ্‌ তখনও পর্যন্ত ধর্মের জিগির তোলেননি। তিনি চেয়েছিলেন অখণ্ড ভারতের মধ্যে মুসলমানদের জন্য এক নিশ্চিত ও সম্মানজনক ঠাঁই করে নিতে।

চার

মুসলিম লীগের স্থায়ী সভাপতি হয়ে দেশে ফিরে জিন্নাহ্‌র প্রথম কাজ হল কংগ্রেসের সদ্য নির্বাচিত সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে একটা ঐক্যমতে পৌঁছানোর চেষ্টা। এক্ষেত্রে তিনি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি থেকে সরে আসতে রাজিও হয়েছিলেন। তার কেবল একটি দাবি ছিল, এক্ষেত্রে যে প্যাক্ট বা চুক্তি হবে তাতে যেন হিন্দু মহাসভার স্বাক্ষর থাকে এবং মদনমোহন মালব্যের।

বিষয়টিকে অভিনন্দন জানিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৩৫) মাওলানা আযাদ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে লিখলেন, "এখন সমস্ত লোকজনের মধ্যে জিন্নাহ্‌ হল একমাত্র লোক যিনি কিছু করতে পারেন। তার বর্তমান আপসমূলক মনোভাবের সুযোগ যদি না নেওয়া যায় তাহলে বলতে ভয় পাচ্ছি যে আমি কোন ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি না। বস্তুত সবচেয়ে ভাল সময় ছিল। যে-সময়ে বোম্বাই এবং বারানসীতে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব নিয়ে সমানে বিতর্ক চলেছিল। আমি নিশ্চিত সে-সময়ে যদি মালব্যজী যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর উপর জোর দিতেন, তাহলে এক নতুন আশা দেখা দিত। আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তিনি সম্মত হননি। যাই হোক, তথাপি কিছু পাওয়া যেতে পারে যদি মিঃ জিন্নাহ্‌কে বুঝিয়ে চুক্তি করানো যায়...। এটা একটা কৃতিত্ব হবে যদি মুসলমানদের আসন সংরক্ষণের শর্তসাপেক্ষে জিন্নাহ্‌ যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীতে রাজি হন।... এই সুযোগ চলে গেলে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কোন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আশা থাকবে না।" [রাজেন্দ্রপ্রসাদ পেপার্স; উদ্ধৃতির জন্য মাওলানা আবুল কালাম আযাদ; জিয়াউল হাসান ফারুকী; পৃ. ১৬২]

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আলোচনা মামুলি এক কারণের জন্য শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায় দীর্ঘ তিন মাস আলোচনার পর একটা মোটামুটি মীমাংসা খসড়া যখন তৈরি হচ্ছিল, তখনই এক গুরুত্বহীন কারণে তা বাতিল হয়ে যায়।

সেই গুরুত্বহীন (not of any special significance) কারণের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ জিন্নাহ্‌র দাবি হিন্দু মহাসভা এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের স্বাক্ষর। কিন্তু হিন্দু মহাসভার নেতারা এবং মালব্যজী তাতে রাজি হলেন না।

অথচ ১৯৩২ সালের নভেম্বরে এলাহাবাদে যে ইউনিটি কনফারেন্স বা ঐক্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে মালব্যজী শুধু সক্রিয় ছিলেন তাই নয়, তিনি কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড' এর মারফৎ মুসলমানদের যে কনশেসন দেওয়া হয়েছিল তার বিরোধিতাও করেননি। উপরন্তু শর্ত সহ পৃথক সিন্ধু প্রদেশের গঠনকেও মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু উল্টো ভূমিকা নেওয়ার ফলে এখন জিন্নাহ্‌ ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের যৌথ উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে ভেস্তে গেল।

জিন্নাহ্‌ ভারতে ফিরে আসার দু'বছরের মধ্যে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন বিধির ভিত্তিতে ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রদেশগুলির জন্য যে নির্বাচন হল তাতে আমাদের ভাষায় 'কংগ্রেসের জয়জয়কার' হলেও মুসলিম লীগ কিন্তু জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে আশানুরূপ ফল দেখাতে ব্যর্থ হল।

প্রধান পাঁচটি প্রদেশে কংগ্রেস পেল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং চারটিতে হলো একক বৃহত্তম দল। তুলনায় কেবল পাঞ্জাব এবং সিন্ধুপ্রদেশে সুবিধা করতে পারেনি।

জিন্নাহ্‌ আশা করেছিলেন মুসলমানদের তরফে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। কিন্তু দেখা গেল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতেও লীগ পূর্ণ সমর্থন পায়নি, উপরন্তু পাঞ্জাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের মুসলমান অধ্যুষিত প্রদেশে লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারল না। কেবল সংযুক্ত প্রদেশ (ইউপি) এবং বাংলায় তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভাল ফল করেছিল।

৪৮২টি মুসলমান আসনের মধ্যে ১০৯ টি সর্বসাকুল্যে আসন তারা লাভ করেছিল এবং কোথাও মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেনি। মোট মুসলমান ভোটের ৪.৮ শতাংশ তারা পেয়েছিল।

এর অর্থ অবশ্য এও নয় যে মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেস খুব কিছু সুবিধা করতে পেরেছিল। ৪৮২টি সংরক্ষিত মুসলমান আসনের মধ্যে মাত্র ৫৮টি প্রার্থী দিয়ে পেয়েছিল ২৬টি । অ-কংগ্রেসি মুসলমানরা পেয়েছিল ২৪৭টি আসন। নির্বাচনের ফলাফলকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় কংগ্রেস এবং লীগকে অতিক্রম

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে মুসলমানদের একটি বৃহত্তম অংশ তৃতীয় শক্তি হিসাবে রাজনীতির মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করতে উন্মুখ ছিল।

এ ব্যাপারে কংগ্রেস কিছু সাহায্য করতে পারত সম্ভাব্য তৃতীয় শক্তির প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে। সে পাঞ্জাবে সিকান্দার হায়াত খাঁর ইউনিয়নিস্ট পার্টি হোক অথবা বাংলায় কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হক হোক। কিন্তু তার পরিবর্তে ফজলুল হকের আবেদন সত্ত্বেও বাংলায় নির্বাচনোত্তর কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে ভূস্বামীদের স্বার্থ মাথায় রেখে কংগ্রেস রাজি হল না। কংগ্রেসের সুস্পষ্ট নীতির অভাবে, যা জিন্নাহ্ নির্বাচনের পূর্বে পারেননি-তাই করলেন। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে তিনি ফজলুল হক ও সিকান্দার হায়াত খাঁকে সম্মানের সঙ্গে লীগের অন্তর্ভুক্ত করলেন। রাতারাতি মুসলিম লীগ হয়ে দাঁড়াল ভারতের অধিকাংশ মুসলিমদের প্রতিনিধিস্থানীয় রাজনৈতিক সংগঠন।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে জিন্নাহ্র নেতৃত্বে লীগ যে প্রত্যাশামতো ফল করতে পারেনি তার কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথম, লীগের নির্বাচনের সর্বময় কর্তৃত্ব জিন্নাহ্র হাতে ছিল অথচ তিনি দেশের বাইরে ছিলেন প্রায় পাঁচ বছর (১৯৩০-৩৫)। ফলে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি পুরো ওয়াকিবহাল ছিলেন না। দ্বিতীয়, তিনি বাংলা, পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের মতো মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলির প্রাদেশিক নেতাদের তার নেতৃত্বের অধীনে আনতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বাংলায় ফজলুল হক, পাঞ্জাবে শিকান্দার হায়াত খান এবং সীমান্তপ্রদেশের আবদুল গফফর খাঁ তার নেতৃত্ব স্বীকার করতে আদৌ রাজি ছিলেন না। তৃতীয়, নির্বাচনের সময়ে লীগের কর্মসূচি এবং বক্তৃতায় এমন কিছু ছিল না যার থেকে বোঝা যায় কংগ্রেসের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য আছে। কংগ্রেসের মতোই লীগ জোর দিয়েছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সমান্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরোধিতায়। গ্রামীণ ঋণমুক্তি ও গ্রামোন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সবশেষ, জিন্নাহ্র হঠাৎ করে দেশ থেকে চলে গিয়ে লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাসের ঘটনাও সাধারণভাবে মুসলমানদের মনে তার নেতৃত্বের প্রতি আস্থার অভাব ঘটিয়েছিল।

এদিকে নির্বাচনের ফলাফলে জিন্নাহ্ প্রচণ্ড হতাশ ও ক্রুদ্ধ হলেও রাজনৈতিক বাস্তব বোধবুদ্ধিহীন হননি। তিনি চাইলেন যেখানে কংগ্রেসের পক্ষে একক মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব নয় সেখানে তাকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিছুটা দরাদরি করে লীগের জন্য সামান্য হলেও রাজনৈতিক শক্তি দখল। তিনি ইউ পি এবং বোম্বাইয়ের ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব দিলেন এবং সরকারের ছোট শরিক হিসাবে কাজ করতেও রাজি হলেন। যদিও ইউ পি'তে কংগ্রেসের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল।

মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সমস্যা দেখা দিয়েছিল বোম্বাই এবং ইউ পি'কে নিয়ে। দুটি প্রেসিডেন্সিতে মুসলমান আসনে কংগ্রেসের সাফল্য খুবই সীমাবদ্ধ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
ছিল। কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অল্পের জন্য বোম্বাইতে পায়নি। সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রী বলা হত না) বি জি খের চেয়েছিলেন মুসলিম লীগকে সঙ্গে পেতে। জিন্নাহ্‌র নেহরু সম্পর্কে কিছুটা কঠোর মনোভাব থাকলেও (নির্বাচনের সময়ে পারস্পরিক কঠিন বাক্য বিনিময়) খেরের প্রস্তাবে রাজি হন। কিন্তু গান্ধীজি এই প্রস্তাবে কোন উৎসাহ না দেখানোয় বিষয়টি আর এগোয়নি।

গান্ধীজির দৌহিত্র রাজমোহন গান্ধীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে ভি এন দত্ত লিখেছেন, জিন্নাহ্‌ বোম্বাইতে কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য কে এম মুন্সির সাহায্য চেয়েছিলেন কিন্তু কংগ্রেস হাইকমান্ড জিন্নাহ্‌র সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৩৭ সালের মে মাসে। (উদ্ধৃতির জন্য, মাওলানা আযাদ; পৃ. ১২)

ইউ পি'র ঘটনাটি আরও বিচিত্র। একথা সর্বজনবিদিত যে লিখিতভাবে না হলেও ইউ পি'তে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পূর্বে নিজেদের মধ্যে এক সমঝোতায় পৌঁছেছিল। একটা ধারণাও গড়ে উঠেছিল যে নির্বাচনের পর কংগ্রেস এবং লিগের মধ্যে এক কোয়ালিশন সরকার গঠিত হবে। [দি হিন্দু-মুসলিম কোশ্চেন; বেণীপ্রসাদ; এলাহাবাদ, ১৯৪১; দি পার্টিশন অব ইন্ডিয়া (প্রবন্ধ); এমন মুজিব; প্রকাশিত হয়েছে ফিলিপ্‌স এবং ওয়েনরাইটের সম্পাদিত "দি পার্টিশন অব ইন্ডিয়া" গ্রন্থে, লন্ডন, ১৯৭০]

১৯৩৭ সালের জুলাই মাসের পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেস ইউ পি'তে মন্ত্রিসভা গঠনে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। ইতিমধ্যে সেখানে লীগের এক নির্বাচিত সদস্য মারা যাওয়ায় প্রয়োজন পড়ল উপনির্বাচনের। লীগ উপনির্বাচনে দলীয় সদস্য মনোনীত না করে সৌহার্দ্যের নিদর্শন স্বরূপ আসনটি কংগ্রেসের এক মুসলমান প্রার্থীর জন্য ছেড়ে দিল। আর সেই আসন থেকে নির্বাচিত হলেন জওহরলালের স্নেহভাজন 'রফি' ভাই অর্থাৎ রফি আহমেদ কিদোয়াই। অথচ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের দু'মাসের মধ্যেই জিন্নাহ্‌র সহযোগিতার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে জওহরলাল ২৭ এপ্রিল (১৯৩৭) প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে লীগের সঙ্গে মিত্রতার জোট গঠন করা সম্ভব নয়। তিনি তার পরিবর্তে মুসলমান জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের উপর গুরুত্ব দিলেন। তার মতে লীগ আদৌ মুসলমান জনতার প্রতিনিধিত্ব করে না। ৩০ মার্চ তিনি গোবিন্দবল্লভ পন্থকে একটি চিঠিতেও সেকথা জানিয়েছিলেন : "ব্যক্তিগতভাবে আমার দৃঢ় ধারণা মুসলিম লীগের সঙ্গে আমাদের কোনওরকম চুক্তি বা কোয়ালিশন হবে প্রচণ্ড ক্ষতিকারক। এর অর্থ হবে আরও অনেক কিছু যা অতি সহজে বোধগম্য।"

একই সঙ্গে জওহরলালের আর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাওলানা আযাদও প্রকাশ্যে অনুরূপ মতামত দিচ্ছেন। ১৭ মে (১৯৩৭) 'উত্তরপ্রদেশের মুসলিম কংগ্রেসম্যান'-এর মঞ্চ থেকে তিনি জিন্নাহ্‌র তীব্র সমালোচনা করে লেখেন, "মি. জিন্নাহ্‌ কি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কখনো মুসলমানদের দুঃখকষ্টের সঙ্গে নিজেকে একান্ত করেছেন? আমাদের মধ্যে কয়েকজন সিদ্ধান্তই করেছি যে মি. জিন্নাহ্ এবং তাঁর সঙ্গীরা বিদেশি বস্তুর দ্বারা তৈরি যার সঙ্গে জনগণের কোন মিল নেই।"

কিন্তু জুলাই মাসে (১৯৩৭) কংগ্রেস যখন প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নিল, তখন স্বাভাবিকভাবে ইউ.পি'তে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রশ্নটিও এল। যদিও কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, তথাপি জনমত এবং রাজনৈতিক আবহাওয়া ছিল কংগ্রেস লীগের জোট সরকার গঠনের পক্ষে—যা কংগ্রেসের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে যেখানে লীগের স্থায়ী সভাপতি জিন্নাহ্ বলছেন, লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে গুরুতর কোন পার্থক্য নেই—"আমরা আনন্দিত হব কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মসূচিতে সহযোগিতা করতে। (...glad to cooperate with Congress in their constructive programme)।"

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল সম্ভাব্য সাত জনের মন্ত্রিসভায় লীগ যখন দাবি জানালো তাদের তরফে দু'জন সদস্যের। মাওলানা আযাদ কংগ্রেসের তরফে লীগের দুই নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জমান এবং নবাব ইসমাইল খাঁনের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের ওই দাবি অর্থাৎ দু'জন সদস্যকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভূক্ত করার দাবি স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু জওহরলাল তাতে রাজি হলেন না। তিনি লীগের ওই দুই নেতাকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিলেন মাত্র একজনকে নেওয়া সম্ভব হবে, দু'জনকে নয়।

নেহরু চেয়েছিলেন সম্ভাব্য সাতজনের মন্ত্রিসভায় দু'জন মুসলমান সদস্যের মধ্যে একজন হবেন কংগ্রেসের রফি আহমেদ কিদওয়াই এবং অপরজন হবেন লীগের সদস্য। বলাবাহুল্য, লীগ তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। আযাদের মতে এই ঘটনা লীগকে তথা জিন্নাহ্কে সুযোগ দিল শুধু দলকে পুনরুজ্জীবন করা নয়, একই সঙ্গে কংগ্রেস-বিরোধী শক্ত অবস্থান নিতে। আযাদ মনে করেন, "লীগের বাড়ানো হাত গ্রহণ করা হলে মুসলিম লীগ পার্টি কার্যগতিকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যেত।" তিনি গোটা ঘটনার জন্য আত্মজীবনীতে জওহরলালকে দায়ী করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে গান্ধীজি লীগের দাবির সারবত্তা বুঝেও জওহরলালকে মেনে নেওয়ার জন্য কোনও 'পীড়াপীড়ি' করলেন না। [ভারত স্বাধীন হল, বাংলা অনুবাদ, পৃ. ১৫৭]

লীগ জওহরলালের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পরেও আলোচনা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। বরং পরবর্তী আলোচনায় দেখা গেল লীগের দু'জন সদস্যকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে যথেষ্ট যুক্তি আছে। তখন জওহরলাল ঠিক করলেন লীগের কাছে এমন কতকগুলি শক্ত শর্ত রাখবেন যা তাদের পক্ষে মানা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্ভব হবে না এবং তারা নিজেরাই তাদের দু'জন মন্ত্রীর দাবি থেকে সরে আসবে। [২১ জুলাই, ১৯৩৭; রাজেন্দ্রপ্রসাদকে লেখা জওহরলালের চিঠি]।

প্রথম শর্ত ছিল, লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ড ভেঙে দিতে হবে; দ্বিতীয়ত ভবিষ্যতে উপনির্বাচন হলে লীগকে কংগ্রেস প্রার্থীর সাফল্যের জন্য খাটতে হবে; আর তৃতীয়ত, যদি কোন কারণে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে লীগ সদস্যদেরও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

কোন আত্মসম্মানবিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের পক্ষে উক্ত শর্তাবলী মানা সম্ভব নয়— লীগও মানেনি।

ভি এন দত্ত বলেছেন, "স্বর্গ ভেঙে পড়ত না যদি দুটো মন্ত্রীর আসন লীগকে দেওয়া হত। রাজনীতি হল সম্ভাবনার আর্ট। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার এক সুবর্ণ সুযোগ চলে গেল যার জন্য দেশকে পরবর্তী সময়ে বিরাট খেসারত দিতে হল। [মাওলানা আযাদ পৃ. ১৫১]। ফ্রাঙ্ক মোরেস জওহরলালের জীবনীকার হিসাবে অভিমত প্রকাশ করেছেন, "কংগ্রেস যদি নির্বাচনের পর লীগকে আরও কৌশলের সঙ্গে ব্যবহার করতো তাহলে পাকিস্তান হয়তো কোনদিনই তৈরি হত না।" [জওহরলাল নেহরু; পৃ.২৬৭]

চৌধুরী খালিকুজ্জমান, যিনি লীগের তরফে এই বিতর্কের প্রত্যক্ষদর্শী, তিনি তার লেখা বই 'পাওয়ার টু পাকিস্তান'-এ লিখেছেন, "লীগ যখন তার দাবি উত্থাপন করেছিল, সেই সময় কংগ্রেস যদি সেই দাবি মেনে নিত তাহলে আর কী কার্যকরী দাবি আমরা তুলতে পারতাম তা আমি জানি না। কংগ্রেসের এই রকম সবিজ্ঞ দীর্ঘসূত্রতা পাকিস্তানের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।" [পৃ. ১৯২] পরবর্তীকালে রামমনোহর লোহিয়া বলেছিলেন, কংগ্রেসের বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় জওহরলাল জোটের কথা চিন্তা করেননি। সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণভাবে জওহরলালের। ঘটনাটি যদি তাই হয় তাহলে বলতে হবে জওহরলাল এক ধরনের রাজনৈতিক সত্যভ্রষ্টতার দোষে দোষী। কারণ তিনি পূর্ব থেকেই লীগ ও কংগ্রেসের নির্বাচনোত্তর সম্ভাব্য বোঝাপড়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী স্বাধীন ভারতের ইউ.পি'র মুখ্যমন্ত্রী ড. সম্পূর্ণানন্দ পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস লীগের সমঝোতার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছিলেন। তার ভাষায়, "there was an alliance certainly." [উদ্ধৃতির জন্য, জিয়াউল হাসান ফারুকী, পৃ.২০০২, পাদটীকা]।

কোয়ালিশনে যাওয়ার ব্যাপারে জিন্নাহ্‌র কিন্তু আন্তরিকতার অভাব ছিল না। নির্বাচনের প্রাক্কালে নাগপুরের জনসভায় জিন্নাহ্ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন, "হিন্দু এবং মুসলমানদের হতে হবে যুক্তফ্রন্টের মতো, তাদের এক হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং এক সঙ্গে কাজ করতে হবে প্রদেশের সমৃদ্ধির জন্য এবং আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য (... work together for the welfare

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

of your province and for the freedom of our motherland)" [স্টার অব ইন্ডিয়া, জানুয়ারি ২, ১৯৩৭]।

নির্বাচনের ফলাফল বেরোবার পর কংগ্রেসের সরকারি দলিল থেকে জানা যায়, "মি. জিন্নাহ্ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন প্রতিটি প্রগতিশীল দেশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে তার রাজি হওয়ার কথা।" [এ আই সি সি পেপার্স, ফাইল নং. জি. ১৪/১৯৩৭]।

জিন্নাহ্র জোট সরকার গঠনের প্রস্তাব বাতিল করার সমস্ত দায়িত্ব মাওলানা আযাদ তার আত্মজীবনীতে [ভারত স্বাধীন হল'/ 'India Wins Freedom'] জওহরলালের ঘাড়ে চাপালেও তিনি তার খুব একটা বাইরে ছিলেন না। 'কংগ্রেস জয়জয়কার'-এ আলোচিত আযাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল লীগের সঙ্গে কোন রকম জোটে না যাওয়া। ১৯৩৭ সালের ৩০ মার্চ বারাবাঁকির আবদুল ওয়ালীকে জওহরলাল যে চিঠি লেখেন, তাতেই আমাদের আসল মনোভাব ধরা পড়ে। চিঠিতে জওহরলাল কোয়ালিশনে যাওয়ার ব্যাপারে তার সুস্পষ্ট আপত্তির কথা জানানোর পর তিনি আরো জানান, "যতদূর আমি জানি ওয়ার্কিং কমিটির সহকর্মীরাও এর বিরুদ্ধে। আযাদ যিনি এখানে বর্তমানে উপস্থিত আছেন নিশ্চিতভাবে তিনিও এর বিরুদ্ধে (Abul Kalam Azad who is here at present also definitely opposes it.)।" [এ আই সি সি ফাইল, জি-৫ (কে.ডব্লু-১), ১৯৩৭]। জিন্নাহ্ সম্পর্কে আজাদের কী মনোভাব ছিল তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি তার উত্তরপ্রদেশ মুসলিম কংগ্রেসমেন'-এর বক্তৃতায় (১৭ মে ১৯৩৭)। তিনি সেখানে জিন্নাহ্কে সরাসরি আক্রমন করেছিল বিদেশি বস্তুর দ্বারা তৈরি বলে।

সবশেষে মনে রাখা প্রয়োজন জওহরলালের জীবদ্দশায় তার আত্মজীবনী প্রকাশিত হলেও তাতে তিনি এই অভিযোগের উল্লেখ করেননি। তার অপ্রকাশিত ত্রিশ পৃষ্ঠায় তিনি এই অভিযোগ লিখে গিয়েছিলেন জওহরলালের বিরুদ্ধে।

অনেক সমালোচক মনে করেন দুই বিপরীত দর্শনের পার্টির পক্ষে কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে আর লীগ বিশেষ এক সম্প্রদায়ের কোয়ালিশন বেশিদিন চালানো সম্ভব ছিল না। কথাটি যদি যুক্তিযুক্তও হয় তা হলেও বলতে হবে এধরনের পরীক্ষামূলক সরকার যদি কিছুদিনও চলত তাহলে অন্তত জিন্নাহ্র পক্ষে তৎক্ষণাত কংগ্রেসকে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অপরাধে অপরাধী করা সম্ভব হত না আর সেই সঙ্গে তাকে হিন্দু পার্টি বলেও তিনি সমালোচনা করতে পারতেন না।

পাঁচ

ইউ পি এবং বোম্বাইতে লীগের কোয়ালিশনের প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর জিন্নাহ্ এবার ভারতীয় রাজনীতিতে পুরোপুরি মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে আবির্ভূত হলেন। এতদিনের জাতীয়তাবাদী পোশাকটা টেনে ছুঁড়ে দিলেন এবং বছর না

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেতে-যেতেই ইউ.পি-তে কংগ্রেস সরকারের হাতে মুসলমানদের অত্যাচারের জিগির তুললেন।

রাজনীতির দক্ষ দাবাড়ুর মতো আক্রমণকে লক্ষ রেখে জিন্নাহ্ তার গুঁটিগুলি নিপুণভাবে সাজালেন। ১৯৩৭ সালে যা তিনি পারেননি মাত্র দু'বছরের মধ্যে (আগস্ট, ১৯৩৭-ডিসেম্বর ১৯৩৯) তিনি তা অর্জন করে দেখিয়ে দিলেন প্রায় সমস্ত মুসলমান দল বা গোষ্ঠী এবং মুসলমানদের এক মঞ্চে সামিল করে। এটা তিনি করেছিলেন অনেকটা তৎকালীন নাৎসি জার্মানির কায়দায়। সত্য-মিথ্যার কোন পরোয়া না করে।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবি জানালেন যে লীগই একমাত্র মুসলমানদের মুখপাত্র। মুসলমানদের জন্য অন্য কাউকে বলতে দেওয়া চলবে না। নেহরু ভেবেছিলেন শহরে, গ্রামাঞ্চলে মুসলমানদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করে। তিনিই হবেন তাদের নিকটজন। কিন্তু তিনি ভাবেননি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য বা সমন্বয়ের জটিল তত্ত্বের চেয়ে সাধারণ দরিদ্র অশিক্ষিত মুসলমানের কাছে ধর্মবিপন্নতার শ্লোগান অনেক বেশি আকর্ষণীয় হবে এবং সে-কারণে নেহরুর চেয়ে জিন্নাহ্ হবেন তাদের অনেক কাছের লোক।

মুসলিম লীগ দলটিকে জিন্নাহ্ সম্পূর্ণ নতুনভাবে ঢেলে সাজালেন এবং তার শাখা ভারতের মুসলমান অধ্যুষিত প্রত্যন্ত গ্রামেও খুললেন। বেতনভোগী সর্বক্ষণের কর্মী নিযুক্ত হল এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হল লীগের বক্তব্যকে কীভাবে সমাজের সর্বস্তরে মুসলমানদের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তাদের কাছে রাখতে হবে প্রধানত মুসলিম ঐক্যের কথা। সদস্য-চাঁদা এত কম (দু-আনা) রাখা হল যে খুব গরিব মুসলমানের পক্ষেও দিতে অসুবিধা হল না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সদস্যসংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে গেল। পাঞ্জাবের স্যার সিকান্দার হায়াত খাঁ, বাংলার ফজলুল হক এবং আসামের সাদুল্লার মতো বড় মাপের প্রাদেশিক নেতারাও শেষ পর্যন্ত জিন্নাহ্র নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে লীগের মঞ্চে সমবেত হলেন। জিন্নাহ্ হয়ে দাঁড়ালেন মুসলমানদের ভাগ্যনিয়ন্তা। তার বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে তখন সাম্প্রদায়িক ভাবনা-চিন্তা। তিনি হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়ে ঘোষণা করলেন 'ইসলাম বিপন্ন'! পবিত্র কোরআন এবং পয়গম্বরের নামে প্রচারপত্র বিলি করে আবেদন জানানো হল তারা যেন তাদের ধর্ম রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হন।

বলা বাহুল্য, এর সবটাই ছিল অসত্য। তার লক্ষ্য ছিল মিথ্যা আতঙ্ক তুলে মুসলমানদের মনে হিন্দুবিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং একই সঙ্গে প্রতিপন্ন করা কংগ্রেস এক নিছক হিন্দু সংগঠন। তার সুস্পষ্ট প্রচার হল "মুসলমানরা কংগ্রেস সরকারের কাছ থেকে কিছুতেই সুবিচার বা সুব্যবহার পেতে পারে না।"

জিন্নাহ্র রাজনৈতিক মর্যাদা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। মুসলমানদের একটা বড় অংশ তার নেতৃত্বের অধীনে চলে এল। ইউ. পি'র মুসলমানদের মধ্যে জমিদারশ্রেণি এবং বুদ্ধিজীবীরা (উকিল, ডাক্তার, সরকারি কর্মচারি) চেয়েছিল কংগ্রেসের সঙ্গে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আঁতাত করে সরকারের ক্ষমতা আস্বাদন করতে। কোয়ালিশনে রাজি না হওয়ার ফলে এই শ্রেণির মুসলমানদের সমস্ত রাগটা কংগ্রেসের উপর যেমন পড়ল, তেমনই তাদের আনুগত্য জিন্নাহ্ তথা লীগের প্রতি আরো জোরদার হল। এর ফলে দেখা গেল যে-লীগ ১৯৩৭-এর নির্বাচনে ইউ.পি'তে সুবিধা করে উঠতে পারেনি, সেই এখন এক উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে অতি সহজে হারিয়ে দিল।

ইউ.পি ও বোম্বাইতে কোয়ালিশন সরকার গঠন না করার ব্যর্থতার পূর্ণ প্রতিশোধ লীগ নিতে শুরু করল মিথ্যা গুজব আর দাঙ্গার বাতাবরণ সৃষ্টি করে। প্রধান কথা হল, কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানরা 'অত্যাচারিত' হচ্ছে। এমন গুজবও ছড়ানো হল, কংগ্রেস পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় সমস্ত স্কুলগুলিতে হিন্দুর মন্দির বানানো হচ্ছে! এলাহাবাদ সব ইউ.পি'র কিছু স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল।

সুমিত সরকার লিখছেন, "প্রদেশগুলোয় কংগ্রেস শাসনের সাতাশ মাস ধরে লীগ জোরদার প্রচারের গোলা দাগতে থাকে যার চূড়ান্ত রূপ পীরপুর প্রতিবেদন (১৯৩৮-এর শেষে), বিহার নিয়ে শরিফ প্রতিবেদন (মার্চ, ১৯৩৯) এবং ফজলুল হকের 'কংগ্রেস শাসনে মুসলিমদের দুর্দশা' (ডিসেম্বর, ১৯৩৯)। অভিযোগগুলির মধ্যে ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধে ব্যর্থতা। বকরইদ'-এ গোহত্যা সম্বন্ধে স্থানীয় নিষেধাজ্ঞা, সার্বজনিক অনুষ্ঠানে 'পৌত্তলিক' স্তবক সমেত 'বন্দেমাতরম' গাওয়া এবং উর্দুর বদলে দেবনাগরী লিপিতে হিন্দি ও হিন্দুস্তানিকে উৎসাহ দেওয়া এসবের অনেক কিছুই অতিরঞ্জিত।" [আধুনিক ভারত, পৃ. ৩৬১]।

ইতিপূর্বে ১৯৩৮ সালের এপ্রিলে কলকাতায় অনুষ্ঠিত লীগ কাউন্সিলের সভায় কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের উপর অত্যাচার হচ্ছে বলে জিন্নাহ্ অভিযোগ এনেছিলেন। উপরোক্ত প্রতিবেদনগুলি ছিল তারই প্রতিক্রিয়া। উদ্দেশ্য ছিল জিন্নাহ্র অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করা।

এ সম্পর্কে আযাদ তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন 'আত্মজীবনী'তে। "সাম্প্রদায়িক বিষয় সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ঘটনা আমার নজরে আনা হত। কাজেই ব্যক্তিগত জ্ঞান থেকে ষোলো আনা দায়িত্ব নিয়ে এ কথা আমি বলতে পারি যে, মুসলমান আর অন্যান্য সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে বলে জিন্নাহ্ সাহেব আর মুসলিম লীগের যাবতীয় অভিযোগই ছিল ডাহা মিথ্যা। এইসব অভিযোগের মধ্যে কণাও যদি সত্যি থাকতো তাহলে দেখতাম সেই অন্যায় যাতে না হয়, সে রকম ঘটলে প্রয়োজন হলে ইস্তফা দিতেও আমি তৈরি ছিলাম।". (ভারত স্বাধীন হল, পৃ. ২৩)। আযাদ সে-সময়ে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

মুসলমানদের মধ্যে জিন্নাহ্র মর্যাদা বৃদ্ধির প্রভাব জাতীয় রাজনীতিতেও অনুভূত হল। গান্ধীজি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জওহরলাল এবং সুভাষচন্দ্রের মতো কংগ্রেসের নামী-দামি নেতারা। জিন্নাহ্র কাছে দৌড়াতে শুরু করলেন সাম্প্রদায়িক

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য। কিন্তু জিন্নাহ্ সুকৌশলে যতদূর সম্ভব তা এড়িয়ে যেতে লাগলেন। কারণ মুসলমানদের হৃদয়ে তিনি যে আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছেন তারপর আর জাতীয়তাবাদী নেতাদের গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না।

গান্ধীজি এবং জওহরলাল সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে জিন্নাহ্র সঙ্গে বেশ কিছু চিঠি চালাচলি করলেন। কিন্তু দেখা গেল সমস্যা নিয়ে আলোচনার চেয়ে একপক্ষ অপর পক্ষের। উপর দোষারোপ করতে বেশি ব্যস্ত। জিন্নাহ্র নেহরুকে লেখা চিঠির মধ্যে দেখা গেছে অনেক সময়ে ভদ্রতার সীমারেখা ডিঙিয়ে গেছে, আবার তার উত্তর দিতে গিয়ে নেহরু তার স্বাভাবিক ভদ্রতা যেমন ডিঙোননি, তেমনই রাজনৈতিক কৌশলও দেখাতে পারেননি। জিন্নাহ্কে নেহরু আমন্ত্রণ জানালেন আলোচনার জন্য এলাহাবাদে আসতে, প্রত্যুত্তরে জিন্নাহ্। জানালেন তাকে বোম্বাইতে আসতে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউ কোথাও গেলেন না। নেহরু বললেন, ইউরোপ সফরের জন্য তৈরির ব্যস্ততায় তার পক্ষে এক্ষুনি বোম্বাই যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অবিশ্বাসের দেওয়াল পরস্পরের মধ্য এমন তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে তা ভেঙে একের পক্ষে অপরের কাছে আর আসা সম্ভব ছিল না। দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক। জিন্নাহ্র কাছে সংখ্যালঘু হল সমস্যা আর জওহরলালের কাছে সমস্যা সংখ্যালঘু নয়, সমস্যা হল ভারতের ঐক্য। সমস্যা হল রুটি রোজগারের। ফলে লীগ ও কংগ্রেসের পারস্পরিক সম্পর্কে এক অচলাবস্থা তৈরি হল।

ছয়

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন নাৎসি বাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করল। ৩ সেপ্টেম্বর ভারতে ব্রিটিশ সরকার একতরফা ভাবে ঘোষণা করল ভারত এই যুদ্ধে ইংলন্ড তথা মিত্রপক্ষে যোগ দিয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে কংগ্রেসের দাবি সত্ত্বেও ভাইসরয় তার ১৮ অক্টোবরের ঘোষণায় ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতার কোনও প্রতিশ্রুতি দিলেন না।

প্রতিবাদে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড যে-সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস-পরিচালিত সরকার ছিল তাদের পদত্যাগ করার নির্দেশ দিল (২৩ অক্টোবর)।

কৌশলগত দিক থেকে কংগ্রেসের ক্ষেত্রে এটাই ছিল মারাত্মক ভুল। জিন্নাহ্কে কংগ্রেস আহ্বান জানিয়েছিল ভাইসরয়ের ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। লীগ ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণার বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার সপক্ষে বক্তব্য রাখলেও কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে আদৌ রাজি ছিল না।

জিন্নাহ্ পরিস্থিতির দিকে কেঠোর নজর রাখছিলেন। তিনি সরকারকে বললেন কংগ্রেস শাসিত সরকারগুলিতে যদি মুসলমানদের জন্য সুবিচার পাওয়া যায় এবং সেই সঙ্গে লীগের সম্মতি ছাড়া যুদ্ধের পরে কোন শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির পদক্ষেপ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

না নেওয়ার যদি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তবেই তারা সরকারের যুদ্ধব্যবস্থায় সহযোগিতা করতে পারে।

নভেম্বর মাসের মধ্যে আটটি প্রদেশে কংগ্রেস-পরিচালিত সরকার পদত্যাগ করল। জিন্নাহ্ ২২ ডিসেম্বর (১৯৩৯) দেশের সর্বত্র মুসলমানদের আহ্বান জানালেন দিনটিকে পরিত্রাণ দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপন করার। কারণ কংগ্রেস যে 'হিন্দুরাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিল বিভিন্ন প্রদেশে তার অবসান ঘটেছে।

মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার ফলে সরকারের উপর কংগ্রেস যে চাপ দিতে পারত তার সুযোগ সে হারাল। সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে কংগ্রেস তৎকালীন রাজনীতিতে কোন সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারল না। আর সেই সুযোগ নিয়ে রাজনীতির খোলা মাঠে ব্রিটিশ সরকারের মদতে লীগ তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে নিল। বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলিতে লীগ সরকার গঠন করল, যা কিছুকাল পূর্বে তারা চেষ্টা করেও করতে পারেনি।

'পরিত্রাণ দিবস'-এর তিন মাসের মধ্যে জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে লীগ ২৩ মার্চ (১৯৪০) লাহোর প্রস্তাব বা সাংবাদিকদের ভাষায় 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গ্রহণ করল। প্রস্তাবে বলা হল, ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মতো যে-সব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেগুলিকে একত্র করে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' গঠন করা এবং সেগুলি স্বয়ংশাসিত ও সার্বভৌম হবে।

মনে রাখা প্রয়োজন, লাহোরের উপরোক্ত প্রস্তাবে দেশ বিভাজন অথবা 'পাকিস্তান'-এর উল্লেখ ছিল না। তবে একথা সত্য যে মুসলমানদের জন্য 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' এবং সার্বভৌমত্বের কথা বলে লাহোর প্রস্তাব ভবিষ্যতের 'পাকিস্তান' আন্দোলনের পথকে সুগম করেছিল।

'লাহোর প্রস্তাব' আনার পিছনে জিন্নাহ্‌র উৎকণ্ঠা ছিল যদি যুদ্ধের গতি ব্রিটিশদের অনুকূলে যায় তাহলে তারা হয়ত সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি লীগকে উপেক্ষা করে সংখ্যাগুরুর প্রতিনিধি কংগ্রেসের সঙ্গে কোন একটা চুক্তিতে এসে যেতে পারে। সেই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেবার জন্য জিন্নাহ্ লাহোর প্রস্তাবের মারফত ব্রিটিশদের বোঝাতে চাইলেন মুসলমানদের সংখ্যালঘু হিসাবে না দেখে একটি পৃথক 'জাতি' হিসাবে দেখতে। তিনি চেয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে গান্ধীজির মতো সমমর্যাদা পেতে। তার সে প্রত্যাশা পূরণ হতে দেরি হল না। এক মাসের মধ্যেই ১৯ এপ্রিল (১৯৪০) ভাইসরয় লিনলিথগো জিন্নাহ্‌কে আশ্বাস দিলেন ভারতে মুসলমানদের সম্মতি ছাড়া কোন গঠনতান্ত্রিক সংস্কার বা সংবিধান চালু হবে না।

১৯৪০ সালে লীগ 'লাহোর প্রস্তাব' নিলেও জিন্নাহ্ তখনও পর্যন্ত দেশের সম্পূর্ণ বিভাজনের কথা চিন্তা করেননি। তাঁর চিন্তার মধ্যে ছিল অখণ্ড ভারতের মধ্যে 'হিন্দু' ভারত এবং 'মুসলমান' ভারত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অবশ্য ইতিপূর্বে জিন্নাহ্ তার দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। লন্ডনের 'টাইম এন্ড টাইড' (১৯ জানুয়ারি, ১৯৪০) পত্রিকায় এক নিবন্ধে জিন্নাহ্ লিখছেন, তাদের সাধারণ মাতৃভূমির শাসন পরিচালনায় উভয় জাতির অবশ্যই অংশ থাকা উচিত... যাতে করে বর্তমান বৈরিতার অবসান ঘটতে পারে এবং বিশ্বের মহান জাতিগুলির সঙ্গে ভারত অংশ নিতে পারে। ("... so that India may take its part amongst the great nations of the world)।"

সভাপতি হিসাবে জিন্নাহ্ লীগের মঞ্চ থেকে বললেন, "ভারতের সমস্যা আন্ত ঃসাম্প্রদায়িক চরিত্রের নয় কিন্তু সুস্পষ্টভাবে আন্তঃজাতীয় এবং এটাকে সেইভাবেই দেখা উচিত।" ইসলাম এবং হিন্দুত্ববাদ "সঠিক শব্দের বিচারে ধর্ম নয় কিন্তু বাস্তব বিচারে ভিন্ন ও সুস্পষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা এবং হিন্দু ও মুসলমান মিলে কখনো এক অভিন্ন জাতীয়তা গড়ে তুলতে পারে এটা নিছক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। (it is only a dream that Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality...)।" জিন্নাহ্র মতে বিগত বারোশ' বছরের ইতিহাস এই ঐক্যসাধনে ব্যর্থ হয়েছে এবং এই সময়ে ভারত সর্বদা বিভক্ত থেকেছে হিন্দু ভারত এবং মুসলিম ভারতে ("India was always divided into Hindu India and Muslim India...)।"

অবশ্য দ্বিজাতিতত্ত্ব সম্পর্কে জিন্নাহ্র বক্তব্যে কোন নতুনত্ব ছিল না। ভিন্ন অর্থে এই বক্তব্য তার বহুপূর্বে সতেরো বছর আগে ১৯২৩ সালে বীর সাভারকার তার 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থে হিন্দুদের সম্পর্কে বলেছিলেন। প্রায় একই ভাষায় তিনি দাবি করেছিলেন হিন্দুরা এক পৃথক জাতি। ১৯৩৯ সালে হিন্দুমহাসভার বাৎসরিক অধিবেশনে (কলকাতা, ২৮-৩০ ডিসেম্বর) সভাপতির ভাষণে সাভারকার ঘোষণা করলেন, "আমরা হিন্দুরা নিজেরা এক জাতি। (We Hindus are a nation by ourselves...)।"

অথচ কৌতূহলের বিষয়, লীগের লাহোর অধিবেশনের মাত্র তিন দিন পূর্বে (১৯ মার্চ) রামগড়ে বাৎসরিক কংগ্রেস অধিবেশনের মঞ্চ থেকে সভাপতি মাওলানা আযাদ দ্বিজাতিতত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন, "আমি একজন মুসলমান এবং আমি তার জন্য গর্বিত," কিন্তু একই সঙ্গে ঘোষণা করলেন, "আমি গর্বিত ভারতীয় বলে। ভারতীয় জাতীয়তা বলে যে অবিভাজ্য ঐক্য আছে আমি তার প্রয়োজনীয় অংশ (I am proud of being an Indian. I am an essential part of the indivisible unity that is Indian nationality)।" তিনি উপরোক্ত বক্তৃতায় আরো বললেন, "বিগত এগারোশ" বছরের অভিন্ন ইতিহাস আমাদের যৌধ অবদানে ভারতকে সমৃদ্ধ করেছে। (Eleven hundred years of common history have enriched. India with our common achievements.)।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লাহোর প্রস্তাবে প্রকারান্তরে দেশকে যে দ্বিখণ্ডীকরণের কথা বলা হয়েছিল তাকে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন ডা. ভীমরাও আম্বেদকার। দলিতদের জন্য তিনিও সেসময়ে কংগ্রেস এবং গান্ধীজির নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিলেন। তার দাবি ছিল দলিতদের জন্য বিশেষ সুবিধাও সংরক্ষণের। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থে ['পাকিস্তান অর পার্টিশন অব ইন্ডিয়া] তিনি এ-ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের বৈরিতাকে স্বীকার করে নিয়েও আম্বেদকর বলেছিলেন, এটাই যথেষ্ট কারণ নয় একটা দেশকে বিভাজনের। তিনি উদাহরণ দিয়েছিলেন কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সুইজারল্যান্ডের—যেখানে পরস্পরবিরোধী জাতিগোষ্ঠী একই সংবিধানের অধীনে আপসের মনোভাব নিয়ে বাস করছে। তার মতে, যারা পার্টিশনের কথা বলছেন, তারা ঔপনিবেশিক লেখকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন— যাঁরা সব সময়ে জনগণের বিভিন্নতার উপরই গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। তিনি মনে করেন দলিতদের চেয়ে মুসলমানরা অনেক বেশি সুযোগ পেয়ে এসেছে। বর্ণহিন্দুদের সমালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুসলমানদেরও সমালোচনা করেন তাদের সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতার জন্য।

'লাহোর প্রস্তাব'কে খুব ভালভাবে খুঁটিয়ে পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায় ভবিষ্যতের পাকিস্তান কী রূপ নেবে সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা তখনও পর্যন্ত জিন্নাহ্‌র গড়ে ওঠেনি। 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের (independent states) কথা বলার মধ্য দিয়ে মনে হয় জিন্নাহ্ পাকিস্তানের মতো এক স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা ভেবে উঠতে পারেননি। অথবা তিনি পুরো ব্যাপারটিকে ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট রেখেছিলেন— কারণ হতে পারে তিনি এ-ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না, নতুবা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি এমন একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটবে যার দুটি অংশের মধ্যে হাজার মাইলের দূরত্ব থাকবে। বরং এটা মনে করাই যুক্তিসঙ্গ ত হবে, লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ সরকার এবং কংগ্রেসের উপর চাপ দিয়ে মুসলমানদের জন্য আরও কিছু সুবিধা আদায় করতে চেয়েছিলেন। একই সঙ্গে মুসলমানদের মধ্যেও এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিলেন। উচ্চমধ্যবিত্তদের যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তেমনই মুসলমান আমলারাও মনে করলেন স্বাধীন পাকিস্তানে তাদের আর হিন্দু আমলাদের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে না। অন্যদিকে বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশের মুসলমান নেতারা— যাঁরা এতদিন জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এসেছিলেন তাদেরও এখন চিন্তা করতে হল জিন্নাহ্‌র বিরুদ্ধাচারণ করাটা সাধারণ মুসলমানরা কতটা ভালভাবে মেনে নেবে।

বস্তুত, লাহোর প্রস্তাব জিন্নাহ্‌কে অখণ্ড ভারত এবং পণ্ডিত ভারতের সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। যে বাঘের পিঠে তিনি সওয়ার হয়েছেন সেখান থেকে তার পক্ষে নামা আর সম্ভব ছিল না।

সৌজন্য : 'নতুন চিঠি', শারদ সংখ্যা ২০০৫

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভারতীয় মুসলমান : ভারতবিভক্তি থেকে কাশ্মীর সমস্যা পর্যন্ত

মেহদী বাকের

এই বিশ্বের মধ্যে সম্ভবত ভারতবর্ষ একটা দেশ যা বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে পরিচিত ও সুবিদিত। সে বাগিচার প্রতিটি ফুল নিজস্ব সুগন্ধী থাকা সত্ত্বেও বাগিচার সংহতির প্রতি কাউকে আঙুল তুলতে দেয় না। কিন্তু অপরিণামদর্শী মালি যখন ফুলগুলোর শ্রেণীবিভাজন করে বাগানের ফুলগুলো নষ্ট করে দিতে উদ্যত হয়, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুসুমগুলো সংহতির রূপ হারিয়ে ফেলে।

হয়তো আমাদের জন্মভূমি সেইরকম কিছু পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। কিন্তু অতীতের এই বেদনাদায়ক ঘটনার কিছু চিত্র আজও অন্ধকারে রয়েছে। কিছু সত্য এখনও প্রকাশিত হওয়া দরকার। সীমান্ত বিভাজনের সময় সকল ভারতীয় মুসলমান সানন্দ চিত্তে রাজি ছিল কি? ভারত বিভাজন কি শুধু মুসলিম লীগের চিন্তার ফসল ছিল কি? এই ধরনের বহু প্রশ্ন এখনও উত্তরের অপেক্ষায় আছে।

বাহ্যিকভাবে এটা বলা খুবই সহজ যে, মুসলিম লীগের দাবি ও বিশেষ কিছু মুসলিমের সমর্থনে ১৯৪৭ সালে দেশ দু'ভাগে বিভক্ত হয়, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় অনেক কিছু লুক্কায়িত আছে। বিষয়টি যতটা সহজ মনে করা হয়, ততটা সহজ নয়। তবে উপরোক্ত কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে, অনুসন্ধিৎসু মন তার গভীরে যেতে চায়। যদি এটা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ব্যক্তিগত ইচ্ছা হয়, তাহলে কেন? কারণ, ভারতভাগের পূর্বেও তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল ছিলেন। সেজন্য এটা মনে করাটা ভুল হবে যে তিনি নিজ পরিচিতির জন্য ভাবাবেগ জাগিয়ে তুলেছিলেন অথবা তার রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সেসময় তার পরিচিতি অন্তত দেশব্যাপী হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া যদি এটা বলা হয় যে, কংগ্রেস পরিত্যাগ করে তাকে মুসলিম লীগে এইজন্য যোগ দিতে হয়েছিল যে, কংগ্রেসে তার তেমন গুরুত্ব ছিল না; কিন্তু ঘটনাবলী দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না। সেজন্য নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ভারতভাগের জন্য কোনো এক ব্যক্তি, একটা জাতি বা একটা পার্টিকে দায়ি করা, শুধু অবিচার করা হবে তাই নয়, বরং দেশের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ হয়ে উঠবে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, স্বাধীনতা-পরবর্তী অবস্থা দেখে ভারতীয় মুসলমানরা ভাবতে পারে যে, এইজন্যই তো আমাদের পৃথক দেশের প্রয়োজন ছিল যেখানে আমাদের অধিকারসমূহ আরও বেশি সংরক্ষিত হতে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারত। তবে মূল বিষয়টা তা ছিল না। কারণ মুসলিমদের বড় অংশ সে-বিষয়ে রাজি ছিল না, বা মুসলিম স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা এই উপহার নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এ-কথার প্রমাণে বলা যায় যে, যাদের কোনো রাজনৈতিক প্রভাব ছিল না, তারাও বিভাজনের পর ভারতে থেকে যান এবং প্রতিবাদ করেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের যেসব বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন, তারা প্রকাশ্যভাবে বিবৃতি দিয়ে এর বিরোধিতা করেছেন, তাদের মধ্যে অন্তত মাওলানা আবুল কালাম আযাদের উক্তি প্রমাণস্বরূপ পেশ করা যায়— "If the country was divided in such an atmosphere, there would be rivers of blood flowing in different parts of the country and the British will be responsible for the carnage [p. 177, Partition end Product of the Trend]"— "এরকম পরিস্থিতিতে যদি দেশ ভাগ করা হয়, তাহলে দেশের প্রান্তে প্রান্তে রক্তের নদী বয়ে যাবে এবং তার জন্যে ইংরেজরা দায়ি থাকবে।" সেটাই হল। বিভাজনের উপহার যখন বাস্তবায়িত হতে লাগল তখন সমগ্র দেশব্যাপী ভয়ংকর মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হয়ে গেল। ইংরেজ সরকারের এক গভর্নর সিমলায় ছুটি কাটাচ্ছিলেন। মাওলানা আযাদের এই বাক্যে আরও একটি সত্যের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, তা হল এই যে, সীমান্ত বিভাজনে গান্ধীজী, জিন্নাহ্, মুসলমান ও হিন্দুদের কোনো ভূমিকা ছিল না। বরং কোনো তৃতীয় পক্ষ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, এই ভাবনাটা সর্বপ্রথম ইংরেজদের মধ্যে দেখা দেয়, তারা তখন গান্ধীজীকে পরামর্শ দিলেন যে, মুসলমানদের একটা অঞ্চল দিয়ে পৃথক করে দিন, নতুবা আপনার দেশে শান্তি থাকবে না, সরকারে অংশগ্রহণ নিয়ে সর্বদা হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ঝগড়া চলতে থাকবে।

ইংরেজদের সৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীদের আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। কিন্তু গান্ধীজীর মতো উদার হৃদয়ের মানুষের কী হয়েছিল আল্লাহ ভালো জানেন, যে তিনি প্রথমে তীব্র বিরোধিতা করলেন, তারপরে সেটাকে শুধু মেনে নিলেন তাই নয়, বরং বিভাজনের পর জিন্নাহ্‌কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি করে দিলেন।

এই প্রসঙ্গে বিভাজন সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা জানার জন্যে এই সত্য উদ্ঘাটন খুবই জরুরি যে, গান্ধীজীসহ দেশের প্রথম সারির স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপস্থিতিতে, মুসলমানদের ভগ্ন হৃদয়ের অবস্থা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক তাগিদ ও পরিস্থিতিতে ভারত বিভাজন ও নতুন পাকিস্তানের ঘোষণা হয়েছিল কোন পরিস্থিতিতে? উপরোক্ত পুস্তকের ১৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অবশেষে ঘোষণা করলেন— "As the Indian leaders have finally failed to agree on the cabinet mission for a united India. partition became the inevitable alternative."— "যখন ভারতীয়

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
নেতৃবৃন্দ 'ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ' প্রসঙ্গে সহমত হতে ব্যর্থ হলেন, তখন বিভাজন ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকল না।"

প্রায় দেড়শো বছর ধরে চলমান স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণতিতে দুটি স্বাধীন দেশ জন্ম নিল। কার কতটা ত্রুটি ছিল সেটা ইতিহাসের আদালতে বিচার্য বিষয়, তবে সেই যুগের কিছু বিপরীত দিকও ছিল। সেই স্বাধীনতা ও ভারত বিভাজনের ১৯৪৭ সালে জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ায় সাম্প্রদায়িক হামলা হল। বিভিন্ন উপায়ে যা আজও মুসলমানদের উপরে চলছে। এটা খুবই সত্য যে, একটা স্বাধীন দেশে কোনো সম্প্রদায়ের উন্নতি না হওয়ার জন্য শুধুমাত্র সেই সম্প্রদায়ের কর্মোদ্যম ঘাটতিকে দায়ি করা যায় না। কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি সেই সম্প্রদায়কে ঘিরে সরকারের তরফে গৃহীত ব্যবস্থার ও অনুসন্ধান করবে যার দ্বারা উন্নতির সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে, সেই জাতির অধিকারগুলো অন্য কেউ দখল করে নিচ্ছে না তো? দেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় মুসলমানের বিবৃতি সরকারের বিদেশনীতির বিরুদ্ধে বা দেশের স্বার্থবিরোধী হয়েছে দেখা যায়নি। প্রচারমাধ্যম কাশ্মীরকে বিতর্কিত বলতে পারে, কিন্তু ভারতীয় মুসলমানরা সেটাকে অবিতর্কিত ও অটুট অঙ্গ মনে করে। সরকারের কাছ থেকে কোনোরূপ সুবিধা ও প্রতিদানের আশা না করেই কাশ্মীরে চলমান দাবিকে তারা অহেতুক মনে করে, কিন্তু প্রশ্ন হল যে, ভারতীয় মুসলমানরা অন্যান্য দেশবাসীদের চোখে একশো ভাগ বিশ্বাসযোগ্য কি? তাহলে সরকার কাশ্মীরের মতো সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেশের মুসলমানদের উপর নির্ভর করা পছন্দ করবে? তারা তো সত্য কথা বলবে যে, কাশ্মীরে পাকিস্তানের কোনো অধিকার বা অংশ নেই। অথচ তার বিপরীত দিকে দেশের কণ্টকময় অবস্থা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হবে, ততক্ষণ মুসলমানদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হবে এবং যখন সমাধান হয়ে যাবে তখন সরকারের দূরদর্শিতার প্রতি সকল কৃতিত্ব আরোপিত হবে। অর্থাৎ মাতৃভূমির এত বড় বিজয়ের পরেও সকল দেশবাসীর সাথে (মুসলিম) বাসিন্দাদের আনন্দ উপভোগ করার অধিকার থাকবে না, তবে যদি ফয়সালা আশানুরূপ হয় অর্থাৎ ভারতের পক্ষে হয়। ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে বিবৃতি, সন্দেহ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে যদি নিরপেক্ষভাবে দেখা যায় তাহলে বলতে হয় যে, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বা সমাধানের পরেও ভারতীয় মুসলমানদের তেমন কোনো ভূমিকা নেই, কারণ সেখানকার সন্ত্রাসবাদ বনাম স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের সকল মুসলমান শরীক নেই বা সমাধানকারীদের মধ্যেও তারা কেউই নয়। তাছাড়া কাশ্মীরী পণ্ডিতদের বিতাড়িত করার বিষয়ে তারা জড়িত নয়। পরবর্তী সময়ের ঘটনাবলীতেও ভারতীয় মুসলমানদের কোনো সংযোগ থাকে না, যেটা পার্লামেন্ট আক্রমণ হোক বা অন্যান্য ঘটনাপ্রবাহ হোক। নিরাপরাধের সকল প্রমাণ, একপাশে। সরিয়ে রেখে, দেশের মুসলমানদের গুজরাতের মতো

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঠেলে দেওয়াকে চরম অপরাধ মনে করতে হবে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরেও দেশের মুসলমানরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন মনে করতে পারে না। তার চতুষ্পার্শ্বে নানাবিধ প্রশ্নচিহ্ন তার জীবনযাত্রার পরিধি সংকুচিত করে দিচ্ছে, তবে তারা এই সকল অবস্থাকে ভারতীয় মুসলমান হওয়ার 'কাফ্‌ফারা' মনে করে।

এখন প্রশ্ন হল যে, এভাবে চলবে কতদিন? তাহলে কি এটা সেই স্বাধীনতা যার জন্যে আমাদের বুযুর্গরা কারাবরণ করেছিলেন? প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন? এটা কি সেই ভারতবর্ষ যেখানে প্রতিটি নাগরিকের সমানাধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার থাকার কথা ছিল? হয়তো বোধোদয়ের কিছু স্বপ্ন এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে।

বাংলা রূপান্তর : ফায়জুলবাশার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জিন্নাহ্ ও নাগপুর কংগ্রেস

অধ্যাপক আলাউদ্দীন আহমদ

আধুনিক ভারত-ইতিহাসে মহম্মদ আলী জিন্নাহ্ নাম সুপরিচিত। প্রকৃতপক্ষে ভারতবিভাগে জিন্নাহ্র ভূমিকা সর্বপ্রধান। পাকিস্তানের স্রষ্টা হিসাবে জিন্নাহ্র স্থান ইতিহাসে সুনির্দিষ্ট। কেবলমাত্র ভারত ও পাকিস্তানই নয়, আধুনিক এশিয়ার অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন মহম্মদ আলী।[১] তবে জিন্নাহ্ ভারত-ইতিহাসের এক বিতর্কিত পুরুষ। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক গবেষকদের কাছে জিন্নাহ্ এখনও উপেক্ষিত। ভারত বিভাগের জন্য অনেকেই এখনও পর্যন্ত কেবল জিন্নাহ্কেই দায়ী করেন। জিন্নাহ্-চরিত্রের জটিলতা অনস্বীকার্য। জিন্নাহ্র ব্যক্তিজীবনের কথা অল্প পরিচিত। তথ্যাভাব এবং ঐতিহাসিকগণের বিরূপতা এর অন্যতম কারণ। জুলাই ১৯৭৩ সালে প্রয়াত শিবপ্রসাদ সেন জিন্নাহ্ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "The most enigmatic, Stubborn and prosaic among the leaders.[২] এজন্য জিন্নাহ্-মূল্যায়ণের কাজ সহজ নয়।

প্রথম জীবনে জিন্নাহ্ ছিলেন জাতীয়তাবাদী ভারতীয়, শেষ জীবনে পাকিস্তানের প্রবক্তা। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার কলুষমুক্ত, শিক্ষিত, সেকুলারভাবাপন্ন পুরুষ। ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণ তিনি কাম্য নয় বলে মনে করতেন। বর্তমানে বহু সরকারি দলীল এবং গোপন প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় জিন্নাহ্-জীবনের বহু তথ্য জানা যায়। জিন্নাহ্র সমকালীন বহু ঐতিহাসিক পুরুষদের ঐতিহাসিক সূত্র।[৩] সম্প্রতি প্রকাশিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি তথ্যের আলোকে জিন্নাহ্ চরিত্রের অনালোচিত দিক আজ সাধারণ পাঠকের কাছে সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে Stanlay Wolpert, Aector Bolitho ইস্পাহানি, সুলেমান জিয়াউদ্দীন, ওয়াহেদ উজ জামান প্রভৃতির রচিত জিন্নাহ্-চরিতে।[৪] সেজন্য বর্তমানে জিন্নাহ্ মানস পরিবর্তনের ইতিহাস আজ আর অজ্ঞাত নয়। ১৯৭৩ সালের জুলাইয়ে প্রয়াত শিবপ্রসাদ সেনের সিদ্ধান্ত আজ গ্রহণযোগ্য নয়। জিন্নাহ্র রাজনৈতিক জীবনে ১৯২০ সালের নাগপুর কংগ্রেসের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। জিন্নাহ্- চরিত্র আলোচনায় নাগপুর কংগ্রেসের ভূমিকা আলোচনা অপরিহার্য। মহম্মদ আলী জিন্নাহ্র জীবনকে চারটি পর্বে ভাগ করা যায় :

১. ১৯২০ সাল পর্যন্ত জিন্নাহ্ ছিলেন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতা—ভারতের জাতীয় ঐক্য এবং হিন্দু-মুসলমান মিলনসাধন ছিল এই পর্বে তার জীবনব্রত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. ১৯২০-২৮ : এই পর্বে জিন্নাহ্‌র সঙ্গে কংগ্রেসের মতপার্থক্য দেখা দিলেও তিনি তার পূর্ব আদর্শচ্যুত হননি।

৩. ১৯২৮-৩৭ : এই পর্বে তাঁর জীবনব্রতের পরিবর্তন দেখা যায়। এই সময় থেকেই তিনি মুসলীম লীগের আদর্শ প্রচারে এবং মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় অধিক সচেতন হন।

৪. ১৯৩৭-৪৭ : জীবনের শেষপর্বে জিন্নাহ্‌র একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থান বা পাকিস্তান হাসিল করা। জীবনের শেষপর্বে তিনি লীগকে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়ার করে সাফল্য লাভ করেন। ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত, পাশ্চাত্যভাবাপন্ন জিন্নাহ্ এই সময় ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণ ঘটাতেও দ্বিধা করেননি। এই পর্বে জিন্নাহ্ তার প্রথম জীবনের আদর্শ ও নীতি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেন। জিন্নাহ্-জীবনের। এই আমূল পরিবর্তন অনেকের কাছে ব্যাখ্যাতীত মনে হলেও এ পর্যন্ত জানা তথ্যের আলোকে জিন্নাহ্‌র মানস পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রেও জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক জীবনে নাগপুর কংগ্রেসের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক জীবনে দাদাভাই নওরোজী, ফিরোজ শাহ্ মেহেতা এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। জিন্নাহ্ নিজেই সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে তার রাজনৈতিক জীবনের গুরু বলে স্বীকার করেছেন।[৬] প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন গোখ্‌লের ভক্ত এবং তার জীবনের লক্ষ্য ছিল 'মুসলমান গোখ্‌লে' হওয়া। গোখ্‌লের সঙ্গে জিন্নাহ্‌র প্রথম পরিচয় ঘটেছিল ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বেতে।[৭] তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে জিন্নাহ্‌র প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল ১৯০৬ সালের কলকাতা কংগ্রেসে। এ সময় তিনি ছিলেন দাদাভাই নওরোজীর ব্যক্তিগত সচিব। এই কংগ্রেসে জিন্নাহ্‌র ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। সভাপতি দাদাভাই নওরোজীর ভাষণ রচনায় জিন্নাহ্‌র হাত ছিল যথেষ্ট। দাদাভাই অসুস্থ থাকায় ভাষণটি পাঠ করেছিলেন স্বয়ং গোখ্‌লে। এই ভাষণের বক্তব্য ছিল: ভারত শাসনে ভারতীয়দের যোগ্য স্থানলাভ এবং ভারতের স্বায়ত্তশাসন আদায় করা। বঙ্গভঙ্গকে ভাষণে 'A bad blunder of England' বলে সমালোচনা করা হয়েছিল। এছাড়া হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতিতে আশঙ্কা প্রকাশ করে দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানানো হয়েছিল জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের জন্য। কলকাতা কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল যে জাতীয় ঐক্য ছাড়া জাতীয় মুক্তি সম্ভব নয়। ভারতের মুক্তির জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর মিলন প্রয়োজন।[৮] জিন্নাহ্‌র চরিতকার Wolpert ১৯০৬ সালের কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণকে সংগত কারণেই 'দাদাভাই-গোখ্‌লে-জিন্নাহ্' ভাষণ বলে উল্লেখ করেছেন। জাতীয় ঐক্য স্থাপনে জিন্নাহ্‌র প্রয়াস লক্ষণীয়। অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা, জাতীয়তাবাদ এবং ইংরেজ বিরোধিতা ছিল জিন্নাহ্-চরিত্রের তৎকালীন বৈশিষ্ট্য। জিন্নাহ্ সেই সময়

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এতদূর অসাম্প্রদায়িক ছিলেন যে এ সময় তাঁকে 'Ambassador of Hindu Muslim unity' বলে অভিহিত করা হয়েছিল।[৯]

১৯২০ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রতিটি অধিবেশনে জিন্নাহ্ হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ওপর জোর দিতেন। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা ছিল তার জীবনসাধনা। তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের কঠোরতম সমালোচক। মহামান্য আসা যাঁর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় জিন্নাহ্ তখন শুধুমাত্র মুসলিম লীগের সমালোচকই ছিলেন না, তিনি বিশ্বাস করতেন লীগের স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর নীতি দেশের পক্ষে ছিল ক্ষতিকারক।[১০]

দাদাভাই, ফিরোজ শাহ্, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নরমপন্থী কংগ্রেসী নেতাদের নীতি ও কর্মপন্থা তরুণ কংগ্রেসীদের সমালোচনার বস্তু ছিল। মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল এবং পাঞ্জাবের লাজপত রায়ও ছিলেন তিলকপন্থী। নরমপন্থী ও চরমপন্থী কংগ্রেসীদের বিবাদ তুঙ্গে পৌঁছায়। ১৯০৭ সালেই তিলকপন্থী কংগ্রেসীরা কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

১৯০৮ সালে তিলকের বিচারকালে জিন্নাহ্ ছিলেন লোকমান্যের অ্যাডভোকেট। ১৯১৬ সালে রাজদ্রোহীতার অপরাধে তিলকের বিচারকালে জিন্নাহ্ চরমপন্থী লোকমান্যের পক্ষ সমর্থন করে আদালতে সরকারি উকিলের মুখোমুখি হন। এ ক্ষেত্রে পাঠকদের স্মরণ রাখা উচিত যে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক কেবল উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন উগ্র হিন্দু-জাতীয়তাবাদেরও উৎসাহদাতা। মহারাষ্ট্রে তিনিই প্রথম 'গণপতি' ও 'শিবাজী' উৎসব প্রচলন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এ দুটি উৎসবের জন্য রচিত 'গণপতি শ্লোক' এবং 'শিবাজী শ্লোক' ছিল মুসলমান বিরোধী।[১১] যে সময় তিলক রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মের অনুপ্রবেশ দ্বারা সংগ্রামশীল তথা হিন্দু-জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত করেছিলেন ঠিক তখনই মহম্মদ আলী জিন্নাহ্ ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রসারের জন্য তিলকের পক্ষ সমর্থন করে ইংরেজ উকিলের সঙ্গে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছিলেন।[১২]

বড়লাটের কাউন্সিলে জিন্নাহ্ সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯১০ সালের ২৫ ডিসেম্বর। কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে গোখ্‌লের প্রেসবিলের সংশোধন প্রস্তাব সমর্থনে জিন্নাহ্‌র ভাষণও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। 'মাই লর্ড' গোড়াতেই আমি এমন একটি বিষয় সম্বন্ধে বলতে চাই যা অত্যন্ত বেদনাজনক। এই সমস্যাটি এ দেশের সর্বস্তরের মানুষের আবেগকে উত্তাল করে তুলেছে এবং তাদের ঘৃণা ও আতঙ্কের ভাবকে উত্তুঙ্গে উপনীত করেছে। বিষয়টি হল—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রতি অত্যন্ত রূঢ় ও নিষ্ঠুর আচরণ।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সভাপতি (বড়লাট লর্ড মিন্টো) :

"মহামান্য মহোদয়কে শান্ত হতে (to order) বলতে হচ্ছে। আমার মতে 'নিষ্ঠুরতা' শব্দটি অত্যন্ত কঠোর। মাননীয় সদস্য মনে রাখবেন যে তিনি সাম্রাজ্যের এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কযুক্ত অঙ্গের সম্পর্কে কথা বলছেন এবং তাই তাঁর ভাষাও পরিস্থিতির অনুকূল হওয়া উচিত।"

মাননীয় জিন্নাহ্ :

"মাই লর্ড, আমার আরও কঠোর শব্দ প্রয়োগের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমি এই কাউন্সিলের বিধান সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সচেতন এবং তাই আমি একমুহূর্তের জন্যও সে বিধান ভঙ্গ করতে চাই না। তবুও আমি বলছি যে ভারতবাসীর প্রতি যে ব্যবহার করা হচ্ছে তা অকল্পনীয় রকমের রূঢ়তম এবং পূর্বেই আমি সে কথা বলেছি এর কারণ এ দেশের মনোভাব বাদ-বিবাদের উর্ধে।"[১৩]

এই ভাষণ প্রসঙ্গে শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "ভারতের যে দুই নেতাকে ভবিষ্যতে দুই বিরোধী শিবিরের কর্ণধার হতে হয়েছিল তাঁদের প্রথম পরিচয় (সাক্ষাৎভাবে না হলেও) পরস্পর গুণগ্রাহী হিসাবে —এ ইতিহাসের আর এক খামখেয়ালী।"[১৪]

ডিসেম্বর ২৬-২৯, ১৯১০ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ২৬তম অধিবেশনে জিন্নাহ্ সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার ভিত্তিতে নির্বাচন প্রথার তীব্র নিন্দা করেন। এ-কথা আমাদের মনে রাখা উচিত যে সেই সময় মুসলমান নেতাদের প্রায় সকলেই, এমনকী জাতীয়তাবাদী মুসমলান কংগ্রেস নেতারাও, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন।

জানুয়ারি, ১৯১১ সালে স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্নের নেতৃত্বে গঠিত হিন্দু-মুসলমান সদস্যযুক্ত এক প্রতিনিধিমণ্ডলের সদস্য হিসাবে তিনি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

১৯০৬ সালে গঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের (All India Muslim League) সঙ্গে তিনি প্রথম দিকে যুক্ত ছিলেন না। সেই সময় তিনি ছিলেন লীগের তীব্র সমালোচক। ১৯১২ সালের ডিসেম্বর ৩১ তারিখে বাঁকিপুরের লীগ কাউন্সিল সভায় জিন্নাহ্ যোগ দিয়েছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে। সম্ভবত প্রত্যক্ষভাবে লীগের সঙ্গে এই ছিল প্রথম যোগাযোগ। ঐ বছরই তিনি নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯১২ সালে কংগ্রেসেরও অধিবেশন বসেছিল বাঁকিপুরে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস যে জিন্নাহ্র প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। লীগের উদ্দেশে বাঁকিপুরে জিন্নাহ্ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা স্মর্তব্য : "The attainment of a system of self-Govt. suitable to India through constitutional means, a steady

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

reform of the exist ing system of administration by promoting national unity and fostering public spirit among the people of India and by co-operating with other communities for the said purposes."[১৫] জিন্নাহ্‌র ভাষণের সারমর্ম ছিল : ভারতের জন্য স্বায়ত্তশাসন লাভ এবং ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন।

এরপরও বহুদিন জিন্নাহ্ কংগ্রেস-লীগ মিলন এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস চালিয়ে যান। লখ্‌নৌ-এ অনুষ্ঠিত লীগের এক সভায় জিন্নাহ্ ও সরোজিনী নাইডু উভয়েই উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তখনও পর্যন্ত তিনি লীগের সদস্যপদ গ্রহণ করেননি। লীগের নতুন সংবিধান রচনায় জিন্নাহ্‌র ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৩ সালের ১০ অক্টোবর প্রথম জিন্নাহ্ লীগের সদস্য হন। কিন্তু তার জন্য তিনি লীগের কাছে যে শর্ত দিয়েছিলেন তা জিন্নাহ্‌র ধর্মনিরপেক্ষ এবং সংস্কারমুক্ত মানসিকতার পরিচয় প্রকাশ করে। জিন্নাহ্‌র মূল কথা ছিল যে লীগের প্রতি আনুগত্য যেন জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হয়।[১৬] এসব কারণেই ১৯১৩ সালে গোখ্‌লে সরোজিনী নাইডুর কাছে জিন্নাহ্‌র প্রশংসা করে তাঁকে হিন্দু-মুসলমান মিলনের রাজদূত হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। জিন্নাহ্‌র স্বদেশপ্রীতি ছিল সন্দেহাতীত। ২১ মে (১৯১৩) লীগ-সচিব ওয়াজির হাসানকে এক পত্রে জিন্নাহ্ অনুরোধ করেছিলেন যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য যেন এক মিলিত সম্মেলন আহ্বান করা হয়।

জিন্নাহ্‌র অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, হিন্দু-মুসলমান এবং কংগ্রেস-লীগ ঐক্য স্থাপন প্রচেষ্টা এবং আধুনিক মানসিকতার জন্য ১৯১৪ সালে লন্ডনে প্রেরিত কংগ্রেস ডেপুটেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন জিন্নাহ্। ১৯১৩ সালের করাচী কংগ্রেসে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ১৯১৫ সালে কংগ্রেস ও লীগের বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে বোম্বেতে। ২৭ ডিসেম্বর (১৯১৩) জিন্নাহ্ করাচী কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন।

লীগের আগ্রা অধিবেশনে জিন্নাহ্ প্রস্তাব রাখেন যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন প্রথা এক বছরের জন্য স্থগিত রাখা হোক। তিনি কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন যে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা দেশকে 'Two Water Tight Compartments'-এ ভাগ করবে। তবে এ বিষয়ে লীগকে তিনি স্বমতে আনতে ব্যর্থ হন।

এপ্রিল ১৯১৪ সালে কংগ্রেস ডেপুটেশনের নেতা হিসাবে জিন্নাহ্ ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। এ ডেপুটেশন উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থ হলেও এ সময়কার একটি ঘটনার প্রভাব জিন্নাহ্ তথা জাতির জীবনে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও এ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সময় ইংল্যান্ডে উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা গান্ধী সেই সময় কেবল রাজভক্তই ছিলেন না, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয়রা যাতে ইংরেজ বাহিনীতে যোগ দেয় সেজন্য তিনি জাতির কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন : ভারতবাসীরা যেন 'Think Imperially'। গান্ধীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য Cecil Hotel-এ ১৯১৪ সালের ৮ আগস্ট সংবর্ধনা সভায় জিন্নাহ্‌ও যোগ দিয়েছিলেন এবং আনন্দকুমার স্বামী ও সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে তিনি গান্ধীর প্রশস্তিও করেন। এ প্রসঙ্গে শৈলেশকুমার লিখেছেন: "ভারতের বর্তমান শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসে যে দুই নেতার ভূমিকা সর্বাগ্রণ্য এই তাদের প্রথম সাক্ষাৎকার"।[১৭] তবে গান্ধীজী জিন্নাহ্‌কে মোহমুগ্ধ করতে পারেননি। জানুয়ারি ১৯১৫ সালে জিন্নাহ্ দেশে ফিরে আসেন; গান্ধীজীও এ-সময়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতে গান্ধীজীকে সংবর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করেছিল গুর্জর সভা (The Gujarat Society)। এই সভায় গান্ধীজীকে সংবর্ধনা জানাতে জিন্নাহ্‌ও যোগ দিয়েছিলেন। জিন্নাহ্‌র গান্ধী প্রশস্তির উত্তরে গান্ধীজী এক ভাষণে জিন্নাহ্‌কে মুসলমান নেতা হিসাবে বর্ণনা করে জিন্নাহ্‌র অহমিকায় যে আঘাত দিয়েছিলেন তার ফল হয়েছিল ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর। এ সময় থেকেই জিন্নাহ্-গান্ধীর সম্পর্ক শীতল হতে শুরু করে। Wolpert যথার্থ মন্তব্য করেছেন : "It was as if, subconsciously they recognised one another as 'natural enemies', rivals for national power, popularity and charismatic control their audiences, however small or awesomely vest they might become"।[১৮] এ সময় থেকেই উভয়েই পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখতে শুরু করেন— জাতীয় নেতৃত্ব লাভের জন্য। গান্ধীজীর প্রতি জিন্নাহ্‌র যে শ্রদ্ধা ছিল এখন থেকে তা জিন্নাহ্ হারাতে শুরু করেন। জাতীয় নেতা হিসাবে বর্ণনা না করে কেবলমাত্র মুসলমান নেতা বলায় জিন্নাহ্ মনে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন।

এরপরও জিন্নাহ্ কংগ্রেস-নেতৃত্ব লাভের আশা ত্যাগ করেননি। ১৯১৫ সালের কংগ্রেস অধিবেশনেও জিন্নাহ্ হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রয়াস চালিয়ে যান। ১৯১৬ সালে তিনি সরকারি 'প্রেস আইন' প্রতিবাদ সভার 'স্মারকপত্র রচনা কমিটি'র সদস্য মনোনীত হন। জুন ২১, ১৯১৬ সালে তিনি ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে আহমদাবাদে অনুষ্ঠিত ষোড়শ বোম্বাই প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে জিন্নাহ্‌র ভাষণ তাৎপর্যপূর্ণ। শৈলেশকুমারের ভাষায় : "১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের অধিবেশন হয় তখন হিন্দু-মুসলিম সমঝোতা প্রথম রূপ নেওয়া আরম্ভ করে; ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে আহমদাবাদে এম. এ. জিন্নাহ্‌র সভাপতি-

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্মেলনে পূর্বোক্ত বোঝাপড়া বিপুল শক্তিশালী হয়। তাঁকে তখন লীগের পরবর্তী বাৎসরিক অধিবশনের সভাপতি নির্বাচন করা হয়েছে। তিনি হিন্দুদের কংগ্রেস দলের একটি সম্মেলনেরও সভাপতিত্ব করেন, যে দল কিনা ইতিপূর্বে একান্তভাবে হিন্দু-প্রভাবিত।[১৯]

১৯১৬ সাল জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম সফল বছর। তারই প্রচেষ্টায় ঐ বছর লখ্‌নৌতে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে এক সমঝোতা হয়। এই সমঝোতায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আসন বণ্টন করা হয়েছিল। ইতিহাসে 'লখ্‌নৌ চুক্তি' নামে চিহ্নিত এই সমঝোতায় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা স্বীকার করা হয়। Imperial Legislative Council-এর নির্বাচিত সদস্যের এক তৃতীয়াংশ মুসলমানদের জন্য এবং বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। 'লখ্‌নৌ চুক্তি' রচনায় জিন্নাহ্‌র অবদান ছিল সমধিক। এই চুক্তিতে জিন্নাহ্ মুসলমান সংখ্যাল্প প্রদেশের মুসলমানদের স্বার্থের জন্য মুসলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশের মুসলমান স্বার্থ উপেক্ষা করেছিলেন।[২০] এ চুক্তিতে আরও স্বীকার করা হয়েছিল যে, "...এক অথবা অপর সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিল ... নিয়ে কেবল তখনই আলোচনা হবে যদি সংশ্লিষ্ট আইনসভার সেই সম্প্রদায়ের সদস্যদের অন্তত তিন চতুর্থাংশ সেই বিলের বিরোধিতা না করে।"[২১] লীগের অধিবেশনে জিন্নাহ্ লীগকে দিয়ে এই চুক্তি অনুমোদন করিয়ে নেন এবং সভাপতির ভাষণে বলেন, "হিন্দুদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে শুভেচ্ছা এবং ভ্রাতৃভাবাপন্ন। আমাদের চালক নীতি হবে দেশের স্বার্থে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা, দুই ভ্রাতৃপ্রতিম মহৎ সম্প্রদায়ের ভিতর যথার্থ বোঝাপড়া এবং হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল ভারতবর্ষের যথার্থ প্রগতি সম্ভবপর হবে।[২২]

টেন্ডুলকরের লেখা থেকে জানা যায় যে জিন্নাহ্‌র এই ভূমিকার প্রতি গান্ধীজী পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের চরম ও নরমপন্থী প্রধান নেতাদের প্রায় সকলেই এই চুক্তির প্রশংসা করেছিলেন। তিলক তার সমর্থনে জানিয়েছিলেন যে জিন্নাহ্ কেবল মুসলমান স্বার্থ রক্ষায় সচেতন ছিলেন না, জাতীয় স্বার্থের কথা কখনও ভুলে যাননি। Montford শাসন সংস্কার প্রস্তাব বিবেচনার জন্য সঠিক পার্লামেন্টারী কমিটির কাছে জিন্নাহ্ মত প্রকাশ করেছিলেন যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য দূর করাই তার কাম্য। এ কথাই তিনি তার লীগের ১৯১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর অধিবেশনে সভাপতির ভাষণেও উল্লেখ করেছিলেন। ১৯১৭ সালে তিনি Home Rule League-এর বোম্বে শাখার সভাপতি হন এবং শ্রীমতী বেসান্তের অন্তরীনের প্রতিবাদে বেসান্তের কাছে লিখিত চিঠিতে জানান : "মুসলমানদের প্রতি আমার নিবেদন হল এই যে তারা যেন তাদের হিন্দুভাইদের হাতে হাত মেলান। হিন্দুদের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতি আমার নিবেদন হল—আপনাদের অনগ্রসর ভাইদের উত্থানের সহায়ক হোন। এই আদর্শ নিয়েই যেন হোমরুল লীগের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং তাহলে আমাদের পক্ষে আর ভয়ের কারণ থাকে না।"[২৩] ১৯১৮ সালের ১৬ জুন বোম্বের একটি সভায় জিন্নাহ্ হোমরুল দিবস পালন করেন।

আমরা দেখেছি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে গান্ধীজী ইংরেজ পক্ষ সমর্থন করে ভারতবাসীদের ব্রিটিশ সমরবাহিনীতে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ইংরেজভক্ত গান্ধী এ বিষয়ে জিন্নাহ্র সহযোগিতা কামনা করে জিন্নাহ্কে এক পত্রে লেখেন : 'To make an emphatic declaration regarding recruitment', অর্থাৎ জিন্নাহ্ যেন ভারতবাসীর ইংরেজ সমরবাহিনীতে যোগ দিতে জোরালো বক্তব্য রাখেন। গান্ধীজীর পত্রের উত্তরে জিন্নাহ্ জানান : 'You are a votary of Ahimsa, how can you ask to take up arms? What good has Govt. done for India to deserve our co-operations[২৪] (আপনি হচ্ছেন অহিংসার পূজারী, কেমন করে আপনার পক্ষে যুদ্ধের সপক্ষে ওকালতি করা সম্ভব? সরকার ভারতের মঙ্গলের জন্য এমন কি করেছে যে তাদের সহযোগিতা করা আমাদের উচিত)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জিন্নাহ্ ও গান্ধীর মানসিকতা পত্রদুটিতে প্রকট। গান্ধীজী তখনও পর্যন্ত ছিলেন রাজভক্ত এবং ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতায় বিশ্বাসী, এমনকী তিনি যুদ্ধের পক্ষেও সমর্থন জানিয়েছিলেন ইংরেজ তথা মিত্রশক্তির বিজয় কামনায়—যা ছিল অহিংসার পরিপন্থী। অন্যদিকে জিন্নাহ্র মধ্যে তখনও পর্যন্ত তীব্র ইংরেজ ভক্তির আধিক্য দেখা যায়নি। প্রকৃত রাজনৈতিক নেতার মতনই তিনি শর্তযুক্ত সাহায্যে বিশ্বাসী ছিলেন, যদি ভারতবাসীর পক্ষে মিত্রপক্ষকে বিশ্বযুদ্ধে সমর্থন ও সহযোগিতা করা যেতে পারে। জিন্নাহ্-চরিত্রের এই দিক আমাদের কাছে আজও অনালোচিত। জিন্নাহ্ চিরকাল যে অন্ধ ইংরেজভক্ত ছিলেন না, প্রয়োজনে ইংরেজ স্বার্থ বিরোধী বক্তব্য প্রকাশেও সাহসী হতেন তার প্রমাণ আলোচ্য পত্রে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনকে দমনের জন্য 'রাওলাট আইন' পাস করা হয়। 'রাওলাট বিল' আলোচনাকালে জিন্নাহ্ এই বিলের তীব্র সমালোচনা করে একে 'কালাকানুন' বলে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে আইনটি শাসকশ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে। ফলে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের অবনতি ঘটাবে এবং জনগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন হবে।[২৫] কিন্তু জিন্নাহ্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও 'রাওলাট আইন পাস হয় ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে। সঙ্গে সঙ্গে জিন্নাহ্ গর্জে ওঠেন : 'By passing this Bill your excellency; Govt. have actively negatived but a year ago... The fundamental principles of justice have been uprooted and the

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

constitution every agreement they advanced rights of the people have been violated at a time when there is no real danger to the state... I therefore, as a protest against the passing of the Bill and the manner in which it was passed tender my resignation."[২৬] জিন্নাহ্ কেবল রাওলাট আইনের সমালোচনা করেই তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি, প্রতিবাদে পদত্যাগ করে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই পদত্যাগ তাঁর স্বদেশপ্রীতির নামান্তর।

অন্য ঘটনায় জিন্নাহ্র দেশপ্রেম ও ইংরেজ বিরোধীতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বোম্বের পার্সি সম্প্রদায় লর্ড Willingclon-এর বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন Town Hall-এ। এই সভার সভাপতি ছিলেন রাজভক্ত স্যার জামসেদজী জীজীভয়। প্রথম থেকেই জিন্নাহ্ সংবর্ধনা সভার কাজে বিঘ্ন ঘটান। ফলে সভাপতির ভাষণ অধিকাংশ শ্রোতার বোধগম্য হয়নি। অবস্থা আয়ত্তাধীন না রাখতে পারায় পুলিশ কমিশনার সকলকে সভা ত্যাগের জন্য অনুরোধ করেন এবং সভাত্যাগে অনিচ্ছুক জিন্নাহ্কে পত্নীসহ সভাকক্ষ ত্যাগে বাধ্য করেন। এর জন্য কমিশনারকে বলপ্রয়োগ করতে হয়েছিল। সম্ভবত জীবনে এই প্রথম জিন্নাহ্ পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন।[২৭] এই ঘটনার ফলে বোম্বেবাসীর চোখে জিন্নাহ্র ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়। সেইদিন সন্ধ্যায় জিন্নাহ্ বোম্বেতে অন্য এক সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে Town Hall-এর ঘটনা গণতন্ত্রের বিজয়সূচক। জনতার কাছে শাসকদের পরাজয় অনিবার্য যদি গণঐক্য অটুট রাখা যায়। এই ভাষণও জিন্নাহ্ চরিত্র মূল্যায়ণে আমাদের অন্যতম সূত্র। পরবর্তীকালে Town Hall ঘটনার স্মরণে বোম্বের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভবন-প্রাঙ্গণে এবং গুণমুগ্ধ দেশবাসীর দানে নির্মিত হয়েছিল 'People's Ginnah Hall', যে ভবন আজও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বোম্বেবাসীদের ঐতিহাসিক বিজয়, যার প্রাণপুরুষ ছিলেন মহম্মদ আলী জিন্নাহ্। এ প্রসঙ্গে জিন্নাহ্র চরিত্রকার Wolpert-এর মন্তব্য খুবই যুক্তিযুক্ত: "Few Indian remembers that people Ginnah Hall was erected to honour the fearless leadership of Bombay's most inspiring ambassador of Hindu-Muslim Unity."[২৮] সত্যই আধুনিক প্রজন্মের ভারতীয়দের ক'জনই বা 'জিন্নাহ্ হল এবং এই হল নির্মাণের পটভূমিকার কথা জানেন! বহুনিন্দিত জিন্নাহ্র আর এক রূপ চাপা রয়েছে হলটির তলায়।

বহুনিন্দিত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখে। এই সময় জিন্নাহ্ দেশবাসীর কাছে আবেদন রেখেছিলেন ঠাণ্ডা মাথায় ঘটনা পর্যালোচনা করার জন্য। নিয়মতন্ত্রে বিশ্বাসী জিন্নাহ্ তখনও পর্যন্ত শাসন সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তার আশা ছিল 'মন্টাগুর বিল' আইনে পরিণত

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হলে ভারতবাসীর বহু অসন্তোষ দূর হবে। কিন্তু গান্ধীজী মনে করতেন আইন অমান্য আন্দোলন ছাড়া ভারতবাসীর পক্ষে আর কোনো পথ ছিল না। এক চিঠিতে জিন্নাহ্‌কে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন শুরুর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তবে গান্ধী ও জিন্নাহ্ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছিলেন দুই মেরুর বাসিন্দা। নিয়মতন্ত্রে বিশ্বাসী জিন্নাহ্ কোনো রকম গণআন্দোলন শুরুর পক্ষপাতী ছিলেন না। এ বিষয়ে দুজনের একমত হওয়া অসম্ভব ছিল। রাজনৈতিক দর্শনের পার্থক্য জিন্নাহ্‌কে গান্ধী থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে সারা জীবনই জিন্নাহ্ কংগ্রেস নরমপন্থী নেতাদের প্রভাবমুক্ত হতে পারেননি। দাদাভাই-গোখ্‌লে-সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য জিন্নাহ্‌র পক্ষে গণআন্দোলনে যোগ দেওয়া ছিল অসম্ভব। আইন মেনে রাজনীতির করার পক্ষে ছিলেন তিনি, আইন অমান্য করা জিন্নাহ্‌র কাছে ছিল পাপ।

১৯১৯ সালে কংগ্রেস ও লীগের বাৎসরিক অধিবেশন বসেছিল। ১৯১৯ সালে লীগের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায়। এ সভায় জিন্নাহ্ কঠোর ভাষায় ইংরেজদের তুরস্কনীতি এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেন। তিনি বলেছিলেন এই পাপাচারের জন্য ইংরেজদের একদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে– "They shall have to pay for it if not today then tomorrow." —এবং আরও বলেন যে ইংরেজশাসন উচ্ছেদের জন্য কংগ্রেস ও লীগের প্রস্তাব পাসই যথেষ্ট নয়। নিয়মতন্ত্রে বিশ্বাসী, নরমপন্থী জিন্নাহ্‌র গলায় এ সময় চরমপন্থার সুর ধ্বনিত হয়েছিল। তার নিজের ভাষায় আবেগ ও ক্রোধের প্রকাশ ঘটেছিল : 'We shall have to think out some other course more effective than passing resolution of disapproval to be forwarded to the secretary of State for India. And we shall senely find a way, even as France and Italy did... and the new forn Egypt has. We are not going to rest centent until we have attained the fullest political freedom in our country."[২৯] জিন্নাহ্‌র ভাষণে ছিল নতুন চিন্তা-ভাবনার ইঙ্গিত। আশাহত জিন্নাহ্ এ সময় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন পথ গ্রহণেও ইচ্ছুক ছিলেন। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় এই বিশ্বাসও জিন্নাহ্‌র ভাষণে নিহিত। গান্ধীজীর মত ও পথে অবিশ্বাসী জিন্নাহ্ এ সময় সিদ্ধান্ত নেবার ভার দেশবাসীর ওপর ছেড়ে দেন।

জিন্নাহ্‌র জ্বালাময়ী ভাষণ সত্ত্বেও ১৯১৯ সাল থেকে কংগ্রেসে গান্ধীজীর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এ সময় থেকে দেশভাগ হওয়া পর্যন্ত গান্ধীজীই ছিলেন কংগ্রেসের ডাইরেক্টর। গান্ধীজীর প্রচেষ্টার ফলে কংগ্রেস-লীগ যুক্ত আন্দোলন সম্ভব হয়েছিল। গান্ধীজী তথা কংগ্রেস ভারতীয় মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য জোরদার হয়। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য তার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জীবনব্রত হওয়া সত্ত্বেও জিন্নাহ্ গান্ধীজীর খিলাফত নীতি সমর্থন করেননি। রাজনীতি ও ধর্মের মিশ্রণ জিন্নাহ্র কাম্য ছিল না। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এখানে ছিল তার ও গান্ধীজীর মধ্যে মূল পার্থক্য। ভারতবাসীর ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কারকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে। প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন জিন্নাহ্। গান্ধীজী উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারে ছিলেন সদা প্রস্তুত। এ ছাড়া ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় দুজন ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। গান্ধীজী ছিলেন জনগণের খুব কাছের মানুষ, আচার-আচরণে সাধারণ কৃষকের সমগোত্রীয়। অন্যদিকে বেশভূষায়, চলনবলনে, জীবনযাত্রায়, ধর্মবিশ্বাসে জিন্নাহ্ ছিলেন পাক্কা সাহেব-সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যের বহু দূরে ছিল তার বিচরণ ক্ষেত্র।[৩০]

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে সেই সময় গান্ধীজী-নীতির ও কর্মপন্থার সমালোচক অনেকেই ছিলেন। লোকমান্য তিলক, শ্রীমতী বেসান্ত, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, দীনেশ ওয়াচা প্রভৃতি ভারতবিখ্যাত অনেক নেতাই গান্ধীজীর খিলাফত-নীতির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। দীনেশ ওয়াচা (Dinohaw E. Wacha) গান্ধীকে 'পাগল' বলতেও দ্বিধা করেননি— 'A mad man... mad and dirogant'। শ্রীমতী বেসান্ত গান্ধীজীর আন্দোলকে 'Channel of hatred' বলে অভিহিত করেছিলেন। সেক্ষেত্রে জিন্নাহ্র ভাষা ও বক্তব্য ছিল কম কঠোর।

১৯২০ সালের ৩ অক্টোবর বোম্বাতে অনুষ্ঠিত হোমরুল-লীগের এক সভায় গান্ধী ও জিন্নাহ্ উভয়েই বক্তব্য রেখেছিলেন। গান্ধীজীর বক্তব্যের মূলকথা ছিল ভারতের জন্য 'স্বরাজ' লাভ করা। ("To secure complete Swaraj for India according to the wishes of the Indian people") আর জিন্নাহ্ চেয়েছিলেন '...attainment of Self Govt. within the British common wealth... by constitutional methods.', অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশ হিসাবে ভারতের স্বায়ত্ত শাসন লাভ। যদিও ১৯২০ সালে গান্ধীজীর 'স্বরাজ' কথার কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ ছিল না এবং স্বরাজ বলতে গান্ধীজী যে ইংরেজ শাসনযুক্ত ভারত চেয়েছিলেন তার কোনো দৃঢ় ভিত্তি নেই। তবুও সেই সভায় গান্ধী-জিন্নাহ্র মতের মিলন ঘটানো সম্ভব হয়নি। উপস্থিত ৬১ জন সদস্যের মধ্যে গান্ধীজীর পক্ষে ৪৩ জন এবং জিন্নাহ্র পক্ষে ১৮ জন সমর্থন জানান। গান্ধীর পরামর্শে জিন্নাহ্ হোমরুল লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করেন, কারণ তার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন ছিল না। অর্থাৎ হোমরুল লীগ থেকেও জিন্নাহ্ বিতাড়িত হলেন গান্ধীজীর পরোক্ষ ভূমিকার জন্য। এর আগেই গান্ধীজীর আগমনের ফলে কংগ্রেস মহলে তার প্রভাব হ্রাস পায় এবং কংগ্রেস নেতৃত্বলাভের আশা দূর হয়। এজন্য কোনো দিনই জিন্নাহ্ গান্ধীজীকে ক্ষমা করেননি। জিন্নাহ্

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানসিকতার পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণকালে আমাদের এসব ঘটনা স্মরণ রাখা উচিত।

গান্ধীজী নিজের ভুল বুঝতে পেরে জিন্নাহ্‌কে হোমরুল-লীগে পুনরায় যোগদান করতে আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু আত্মগর্বী জিন্নাহ্ সে আহ্বানে সাড়া দিতে পারেননি।

একপত্রে জিন্নাহ্ গান্ধীজীকে লেখেন যে গান্ধীনীতি মেনে নিয়ে তার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। জিন্নাহ্ বিশ্বাস ছিল গান্ধীজীর নীতি ও কর্মপদ্ধতি জাতির পক্ষে ক্ষতিকর।[৩১] তিনি আরও লিখেছিলেন যে গান্ধীজীর উচিত এমন কর্মসূচী গ্রহণ করা যাতে অন্য দল ও সম্প্রদায়ের সমর্থন পাওয়া যায়। জাতীয় নেতাদের অনুমোদিত এবং অধিকাংশ দল সমর্থিত কর্মসূচী রূপায়ণে জিন্নাহ্ সহযোগিতা করবেন বলেও গান্ধীজীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। তবে কোনো ব্যক্তিবিশেষের মতকে সকলের ওপর চাপিয়ে দেবার বিরোধী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেদনাহত চিত্তে জানান যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধীর আবির্ভাবের পর তার কোনো কিছু করার ক্ষমতা ছিল না— 'I have no voice or power'। ১৯২০ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজী অসহযোগ প্রস্তাব তুলেছিলেন। গান্ধীজীর কাছ থেকে তার চিঠির উপযুক্ত জবাব না পেয়ে জিন্নাহ্ গান্ধীজীর প্রতি বিরূপ ছিলেন। কলকাতা কংগ্রেসে অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন তিনি বিষয় নির্বাচনী সভায়। উপস্থিত সমস্ত মুসলমান সদস্যদের মধ্যে কেবলমাত্র জিন্নাহ্‌ই ছিলেন অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধী। জিন্নাহ্‌র মতের সমর্থক ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ কংগ্রেস নেতা। এই কংগ্রেসে প্রকাশ্যে গান্ধীজীর বিরোধিতা করায় গান্ধী-জিন্নাহ্‌র সমঝোতার আশা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়। জিন্নাহ্‌র ধারণা হয় যে কংগ্রেস মঞ্চে জিন্নাহ্-গান্ধীর স্থান একত্রে সম্ভব নয়। গান্ধীজীর উপস্থিতি জিন্নাহ্‌র উত্থানের প্রতিবন্ধকস্বরূপ বলে জিন্নাহ্‌র গান্ধী বিরোধিতা মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে তখনও পর্যন্ত তিনি কংগ্রেস মঞ্চ ত্যাগ করেননি এবং জাতীয় স্বার্থের কথা ভুলে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ওপর জোর দেননি। পরবর্তী কংগ্রেসে এক ঐতিহাসিক ঘটনায় গান্ধী-জিন্নাহ্ তথা কংগ্রেস-জিন্নাহ্‌র বিচ্ছেদ স্থায়ী হয়।

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে নাগপুর কংগ্রেসের গুরুত্ব অসীম। জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক জীবনেও নাগপুর কংগ্রেসের প্রভাব যথেষ্ট। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যসংখ্যা ছিল ১৪,৫০০। কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন বিজয় রাঘবাচারিয়ার। ১৯২০ সালের ২৮ ডিসেম্বর গান্ধীজী প্রস্তাব পেশ করেন যে, "The attainment of Swaraj by the people of India by all legitimate and peaceful means."-

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ এবং আইনসঙ্গত উপায়ে স্বরাজ লাভই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জিন্নাহ্ গান্ধী প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এই বলে যে ইংরেজ সম্পর্ক ছেদ করা অবাস্তব এবং বিপদজনক। জিন্নাহ্ এখানে 'British Connection' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। গান্ধীজীর উত্তর ছিল : "I do not for one moment suggest that we want to end the British connection unconditionally, ...but let it be said by generations yet to be born that we suffered, that we shed not somebody's blood but our own; and so I have no hesitation in saying that I do not want to show much sympathy for those who had their heads broken or who were said to be even in danger of losing their lives. What does it matter?"[৩২] গান্ধীজীর বক্তব্যের অনুবাদ সহজ নয়। তার কথার সারমর্ম হল ভীতু ও স্বার্থপর লোকদের জন্য তিনি তার নীতিও কর্মসূচী ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন। শেষ বাক্যটির মধ্যে যথেষ্ট বিদ্রূপ আছে এবং বাক্যটি অবশ্যই জিন্নাহ্র উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

গান্ধীজীর জবাবের পর সমবেত সদস্যবৃন্দ জিন্নাহ্-সমালোচনায় মুখর হন। অনেকেই জিন্নাহ্র বক্তব্যের মধ্যে ভীরুতার পরিচয় পান এবং বক্তব্যকে 'Want of courage' বা সাহসের অভাবের প্রকাশ বলে নিন্দিত করেন। সহজে সদস্যমণ্ডলী গান্ধীজীর প্রস্তাবকে সমর্থন জানান, তবে প্রথাগতভাবে প্রস্তাবকে সমর্থন (seconded) করেন লালা লাজপৎ রায়। এমন সময় জিন্নাহ্ কিছু বলার জন্য দাঁড়ান। ১৯২১ সালে জুলাই ১৩ তারিখে প্রকাশিত Times of India-র বিবরণীতে জানা যায় যে স্বভাবসুলভ ধীর-স্থির চিত্তে এবং যুক্তিসহ জিন্নাহ্ গান্ধী প্রস্তাবের দোষ দর্শান। Times of India পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : "Mr. Ginnah with his usual smile on his face mounted the platform with an case, suggestive of self confidence, and the conviction of the man, and opposed in an argumentatise, lucid and clear style, the change of creed."[৩৩] জিন্নাহ্ বক্তৃতামঞ্চে বলার জন্য ওঠার সাথে সাথেই সমবেত প্রতিনিধিমণ্ডলী নানাভাবে তাকে বাধা দিতে থাকেন। অনেকেই 'shame shame', 'political imposter' প্রভৃতি ধ্বনি দিয়ে তাকে মঞ্চ থেকে নেমে আসতে বলেন। বক্তৃতা দেবার শুরুতে জিন্নাহ্ গান্ধীজীকে 'Mr. Gandhi' বলে সম্ভাষণ করলে উপস্থিত সদস্যমণ্ডলী চিৎকার করে বলে ওঠেন, "মি. গান্ধী নয়, মহাত্মা গান্ধী' (No Mahatma Gandhi)। জিন্নাহ্ 'মি. গান্ধী' বলায় বারবার বাধা পান, তখন তিনি গান্ধীজীর নাম উল্লেখ না করে বলেন যে, "বর্তমানে ভারতবর্ষের ভাগ্য দুজন মানুষের হাতে রয়েছে, তার মধ্যে একজন হচ্ছেন গান্ধী,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুতরাং এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে এবং যেহেতু আমি জানি যে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন তার পক্ষে, আমি তার কাছে আবেদন করছি যে তিনি যেন একটু ভাবেন, সদস্যগণদের থামতে বলেন, তা না হলে খুব বেশি দেরি হয়ে যাবে। তখন করার কিছু থাকবে না।" ("At the moment the destinies of the country are in the hands of two men, and one of them is Gandhi. Therefore, standing on this platform and knowing as I do that he commands the majority in this assembly I appeal to him to pause, to cry half before it is too late.")[৩৪] অহিংসার পূজারী গান্ধী কিন্তু জিন্নাহ্‌র আবেদনে কোনো সাড়া দেননি। উপস্থিত সদস্যদের জিন্নাহ্ মর্মপীড়ার কারণ হয়। অপমানিত, লাঞ্ছিত, আশাহত, ব্যথিত জিন্নাহ্ রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে মঞ্চ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কংগ্রেসে এবং ভারতীয় রাজনীতিতে জিন্নাহ্ প্রভাব যে তখন হ্রাসমান তার প্রমাণ পাওয়া যায় চেমসফোর্ডকে লেখা Frank Sly-এর নাগপুর কংগ্রেস বিষয়ক এক প্রতিবেদনে। "Gandhi canied no influence" –এই বাক্যটির মধ্যে নাগপুর কংগ্রেসে জিন্নাহ্‌র শোচনীয় ব্যর্থতার ইতিহাসনিহিত। নাগপুর কংগ্রেস জিন্নাহ্ রাজনৈতিক জীবনের বিরাম চিহ্নস্বরূপ। এরপর তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন-যদিও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রচেষ্টার প্রয়াস চালিয়ে যান। অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদে আস্থা তখনও তিনি হারাননি। এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে নাগপুর কংগ্রেসে মুসলমান সদস্যরাও জিন্নাহ্‌র পক্ষে কোনো কথা কথা বলেননি। নাগপুর কংগ্রেসেই খিলাফত নেতা মহম্মদ আলী তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জিন্নাহ্‌কে জর্জরিত করেন। জিন্নাহ্‌র ভাষণে ক্ষিপ্ত হয়ে মৌলানা সৌকত আলী জিন্নাহ্‌র দিকে ছুটে যান, কিন্তু অন্যদের বাধাদানের ফলে জিন্নাহ্‌র ভাগ্যে প্রহার লাভ ঘটেনি। সত্যই ১৯২০ সাল ছিল জিন্নাহ্‌র জীবনের এক দিকনির্দেশক বছর। স্বধর্মী এবং স্বদল থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। Wolpert সঠিক মন্তব্য করেছেন যে ঐ সময় জিন্নাহ্ সব দলের কাছেই অপাঙতেয় ছিলেন। স্বরাজ সভা, খিলাফত কমিটি, কংগ্রেস, লীগ কোথাও তার স্থান ছিল না। তিনি ছিলেন ভীরু ও কাপুরুষ অভিধায় ভূষিত।[৩৫] কংগ্রেস ত্যাগ করেননি। পাঠকদের মনে রাখা উচিত জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক জীবনের অধঃপতনের অন্যতম কারণ ছিল গান্ধী-জিন্নাহ্‌র বিরোধ। গান্ধীজীর উত্থানের ফলেই জিন্নাহ্ সমস্ত রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিতাড়িত হন। 'মুসলমান গোখ্‌লে' হওয়ার ইচ্ছা তার স্বপ্নই থেকে গেল।

নাগপুর কংগ্রেসের গুরুত্ব আধুনিক ভারতীয়-ইতিহাসে যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বে এদিকে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের দৃষ্টি তেমনভাবে আকৃষ্ট হয়নি। জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক মত ও পথ পরিবর্তনে নাগপুর কংগ্রেসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জিন্নাহ্‌র চরিত্র বিশ্লেষণে এর প্রয়োজন অপরিহার্য। প্রয়াত শিবপ্রসাদ সেন একসময় মন্তব্য

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেছিলেন যে, নাগপুর কংগ্রেসে জিন্নাহ্‌র নিগ্রহ গান্ধীজী ও কংগ্রেসের পক্ষে মারাত্মক ভুল ছিল। এই কাজের জন্য কংগ্রেস চিরতরে জিন্নাহ্‌কে হারিয়েছিল এবং ভারতবর্ষ লাভ করেছিল অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী নেতার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতদুষ্ট, ক্ষুদ্রমনা, অসহিষ্ণু এবং অনুদার এক দেশনেতাকে। নাগপুর কংগ্রেস প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর 'The Indian Struggle' পুস্তকে লিখেছেন, নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজীর বিরোধিতা করার জন্য শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশ সদলবলে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু গান্ধীজীর কৌশলপূর্ণ আচরণের জন্য গান্ধী-দাশ সমঝোতা সম্ভব হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন আইনসভা বয়কটের বিরুদ্ধে ছিলেন। নির্বাচন আগেই হয়ে যাওয়ায় গান্ধীজীও এ বিষয়ে নাগপুর কংগ্রেসে আর নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করেননি। ফলে চিত্তরঞ্জনও গান্ধীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেননি। পণ্ডিত মালব্য, শ্রীমতী বেসান্ত, মি. জিন্নাহ্‌ এবং শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল ছাড়া আর সকলের অনুমোদনের ফলে গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাব নাগপুর কংগ্রেসে পাস হয়েছিল।[৩৭] সুভাষ বোসের এই ভাষ্যে সন্দেহ প্রকাশ করে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে, 'Ginnah was the only one who strongly fought against NCO resolution at Nagpur,'। অর্থাৎ নাগপুরে কেবলমাত্র জিন্নাহ্‌ একাই অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন।[৩৮] সবচেয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন দেশবন্ধু। স্বয়ং তিনিই নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, যদিও তার নাগপুর গমনের উদ্দেশ্য ছিল গান্ধীজীর বিরোধিতা করা। চিত্তরঞ্জনের এমন আচরণের কারণ আমরা নেতাজীর লেখা থেকে বুঝতে পারি। রাজনৈতিক চালে গান্ধীজীর সমকক্ষ তখন ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে খুব কম নেতাই ছিলেন। গান্ধীজীর মোকাবিলায় জিন্নাহ্‌র সহযোগী কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ।

নাগপুর কংগ্রেসে স্বরাজের ব্যাখ্যায় গান্ধীজী বলেছিলেন, 'স্বরাজ' অর্থ স্বায়ত্ত শাসন। ইংরেজ সাম্রাজ্যের মধ্যে যদি সম্ভব হয়, না হলে ইংরেজ সাম্রাজ্যের বাইরে যদি প্রয়োজন হয়। গান্ধীজীর ভাষা ছিল : "...self-govt. within the empire, if possible, and outside, if necessary."। জিন্নাহ্‌ এই সভায় বলেছিলেন, "গান্ধী ও তার সহমতাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও আমি এই সভায় বলতে সাহসী হয়েছি যে আপনারা কখনই বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ করতে পারবেন না।"[৩৯] সাংবাদিক দুর্গাদাসের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় যে নাগপুর কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হবার দিন সন্ধ্যায় দুর্গাদাসের কাছে জিন্নাহ্‌ দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছিলেন যে গান্ধীর ধর্মের ত্বক মোড়া রাজনীতি তার পছন্দ নয়। গান্ধীর কংগ্রেসে তার কোনো স্থান থাকতে পারে না, কারণ জিন্নাহ্‌ লোক ক্ষ্যাপানোর রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। রাজনীতি তার কাছে ছিল ভদ্রলোকের খেলা। সুতরাং তিনি কংগ্রেস ও গান্ধীর সংসর্গ ত্যাগ করবেন।"[৪০] গান্ধীজী খিলাফত

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আন্দোলন সমর্থন করলে তার তীব্র সমালোচনা করে জিন্নাহ্ বলেছিলেন, "...well, I shall wait and watch developments, but as matters stand I have no place in Gandhi's congress."। জিন্নাহ্ সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে গান্ধীজীর জীবিত কালে কংগ্রেসে তার কোনো যোগ্য ভূমিকা থাকতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায় যে সেই সময় গান্ধীজীর প্রবল প্রভাব এত দৃঢ় ছিল যে তার সম্মতি ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে কংগ্রেসে নেতৃত্ব দান ছিল অসম্ভব। পরবর্তীকালে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যাবে গান্ধী-সুভাষ সম্পর্কের ইতিহাসে। নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজী জিন্নাহ্র প্রতি সুবিচার করেননি। গান্ধীজীর ভূমিকার জন্যই জিন্নাহ্ কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন। সত্যসাধক বাবু জিন্নাহ্র অসাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং জাতীয় প্রেমের মর্যাদা দিতে অপারগ হওয়ায় জিন্নাহ্র অহমিকায় লাগে। গান্ধীজী এ সময় মৌলানা মহম্মদ আলী, সৌকত আলী প্রমুখ খিলাফত নেতাদের সহযোগিতা লাভের আশায় জিন্নাহ্র পরিবর্তে মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণ জিন্নাহ্র কাম্য ছিল না। অথচ গান্ধীজী সেই কাজই অতি উৎসাহের সঙ্গে করেছিলেন; জিন্নাহ্র আবেদন-নিবেদন, সমালোচনাকে উপেক্ষা করে। এতে গান্ধীজীর প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা বজায় রাখা জিন্নাহ্র পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ জিন্নাহ্ ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন উঁচু দরের রাজনৈতিক নেতা। গান্ধীজীর জিন্নাহ্-বিরোধিতার ফল ভারতের পক্ষে হয়েছিল বিষময়। ভারত বিভাগে জিন্নাহ্র ভূমিকা সর্বজনবিদিত। কিন্তু জিন্নাহ্র কংগ্রেস ত্যাগে গান্ধীজীর ভূমিকা আজও অনালোচিত।

আমাদের ইতিহাসের এক রহস্যময় অধ্যায় নাগপুর কংগ্রেসে জিন্নাহ্র প্রতি গান্ধীজীর ব্যবহার। জিন্নাহ্র আকুল আবেদন সত্ত্বেও গান্ধীজী জিন্নাহ্র প্রতি কোনো সমবেদনা প্রকাশ করেননি। গান্ধীজীকে 'মিস্টার গান্ধী' বলায় গান্ধীভক্তরা জিন্নাহ্কে মহাত্মা গান্ধী বলার জন্য বাধ্য করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। গান্ধী ইচ্ছা করলেই ভক্তদের শান্ত করতে পারতেন, তাহলে প্রকাশ্য সভায় জিন্নাহ্ লাঞ্ছিত হতেন না এবং তাঁকে কংগ্রেসও ত্যাগ করতে হত না। এরকম ঘটনা ঘটলে হয়তো আধুনিক ভারতের ইতিহাস হত অন্যরকম। অথচ ১৯২৪ সালে তিনি নিজেই তাকে মহাত্মা বলে সম্ভাষণে আপত্তি জানিয়েছিলেন।[৪১] যদি চার বছর আগে 'মহাত্মা'র এরকম সদিচ্ছা জাগত তাহলে জিন্নাহ্র স্থান ভারত-ইতিহাসে হত অন্যরকম। ভারত বিভাজন সম্ভবত রোধ করা যেত। এ বিষয়ে এখনও তথ্যসহ বিচার- বিশ্লেষণের অবকাশ আছে, গান্ধীজীর ভূমিকা আমাদের কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়।

বর্তমান প্রজন্মের কাছে জিন্নাহ্র পরিচয় পাকিস্তানের স্রষ্টা হিসাবে- তিনি ছিলেন লীগের নেতা, দ্বিজাতিতত্ত্বের হোতা, মুসলমান স্বার্থের রক্ষাকর্তা, ক্ষুদ্রমনা, অহমিকাসম্পন্ন ভারত-বিরোধী সাম্প্রদায়িক নেতা। অনেকে এখনও তাকে ভারত-ভাগের জন্য মূলত দায়ী বলে মনে করেন। ঐতিহাসিক কারণেই জিন্নাহ্-চরিত্রের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুণাবলী আমাদের চোখে পড়ে না। আমরা ভুলে যাই যে তিনি ছিলেন 'দুর্নীতির উর্ধে'। (এ প্রশংসা আম্বেদকারের গ্রন্থে করা হয়েছে)। জিন্নাহ্‌র কঠোর সমালোচক পণ্ডিত নেহরুও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, "তিনি ছিলেন যোগ্য ও দুর্ধর্ষ। পদের প্রলোভন দ্বারা তাকে বশীভূত করা সম্ভব নয় যা কিনা এতজনের এত বড় দুর্বলতা।" জিন্নাহ্ কখনই মৌলবাদী নেতা ছিলেন না। ১৯২০ সালের নাগপুর কংগ্রেসের পর লীগের পতাকাতলে আশ্রয় লাভ করে তিনি মুসলমান স্বার্থ রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবনচর্চায়ও ধর্মবিশ্বাস ছিল সব গোড়ামিমুক্ত। তিনি আজীবন ছিলেন সেকুলারপন্থী। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের ১১ তারিখে দেওয়া তার ভাষণে। পাকিস্তান সংবিধান সভার সভাপতি হিসাবে এই ভাষণে তিনি পাকিস্তানবাসীদের সকলকে পাকিস্তানের নাগরিক হবার আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাছে সকল নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা সমান হবে। রাষ্ট্রের চোখে ধর্মবিশ্বাস নাগরিকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হবে না।[৪২] তথ্য ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে মুসলমান নেতাদের মধ্যে জিন্নাহ্‌ই ছিলেন প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবাদী। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শেষজীবনে। ধর্মকে অর্থাৎ ইসলামকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। গান্ধীজীর জন্যই তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে লীগের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। যদিও লীগের মতাদর্শের প্রতি তার কোনো আন্তরিক বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা ছিল না।

লর্ড ওয়াভেল তার 'জার্নালে' গান্ধী, নেহরু ও জিন্নাহ্ প্রসঙ্গে যে সব মন্তব্য ও মত প্রকাশ করেছেন তা গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। এক জায়গায় লিখেছেন যে তিনি গান্ধী ও প্যাটেলের প্রভাবকে অবিশ্বাস করেন। জিন্নাহ্ সত্যই সমস্যা সমাধান চাইতেন যদি সেটা তার অহমিকাতে আঘাত না করত। ওয়াভেল এমনও মন্তব্য করেছেন যে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে 'হিন্দুরাজ' প্রতিষ্ঠা করাই ছিল গান্ধীর আসল লক্ষ্য। গান্ধীজীর প্রার্থনা, উপবাসেরও কঠোর সমালোচনা করেছেন। ওয়াভেল গান্ধীজীর মধ্যে ভণ্ডামি এবং দু-মুখো নীতির প্রকাশ লক্ষ করেছেন। Wavell-এর ভাষায় গান্ধীজীর "...practice of mixing prayers with politics, or rather of making prayers a medium of political propaganda, is all a part of the make up. He is an exceedingly shrewd, obstinate, domineering, double-tongued, single minded politician; and there is little ture saintiness in him."[৪৩] এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে কংগ্রেস ত্যাগী জিন্নাহ্ কংগ্রেস নেতার অস্ত্র দিয়েই কংগ্রেসকে নস্যাৎ করতে জীবনপাত করেছেন। ধর্মহীন জিন্নাহ্ ধর্মকে গান্ধীজীর মতোই 'a medium of political propaganda' করেছেন। এখানেই গান্ধীজীর সঙ্গে জিন্নাহ্‌র মিল আবার অমিলও আছে। নতুন তথ্যালোকে এ-কথা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরিষ্কার যে ভারত বিভাজনে জিন্নাহ্, গান্ধী, প্যাটেল, নেহরু-কারও ভূমিকাই নগণ্য ছিল না। জিন্নাহ্র রাজনৈতিক নীতি ও পথ পরিবর্তনের ইতিহাসে গান্ধীজীর ভূমিকা উপেক্ষার নয়। নাগপুর কংগ্রেসে ভারতবর্ষের দুই প্রধান নেতার আচরণ আমাদের জাতীয় ইতিহাসকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। নাগপুর কংগ্রেসেই জিন্নাহ্র জন্মান্তর ঘটেছিল। 'Ambassador of Hindu-Muslim Unity' পরিণত হয়েছিলেন পাকিস্তান গঠনের প্রবক্তা। আজীবনের বিশ্বাস ও নীতি ত্যাগ করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। কংগ্রেস মঞ্চ ত্যাগ করে লীগ মঞ্চ গ্রহণের পিছনে ছিল জিন্নাহ্র নেতৃত্ব লাভের অদম্য কামনা। বিভক্ত ভারতের ইতিহাসে নাগপুর কংগ্রেসের ভূমিকা সেজন্য অবিস্মরণীয়। এজন্য শুধু জিন্নাহ্র জীবনেই নয় 'আধুনিক ভারতের ইতিহাসে'ও নাগপুর কংগ্রেসের ভূমিকা এত গুরুত্বপূর্ণ। বিভক্ত ভারতের ইতিহাস লিখিত হয়েছিল নাগপুর কংগ্রেসে।

টীকা ও তথ্যসূত্র :

১. জিন্নাহ্ চরিতকার Stanley Wolpert জিন্নাহ্র কৃতিত্ব বিচার প্রসঙ্গে লিখেছেন, "He [Jinnah] crossed Swords with at least as many great British born or Indian barristers, defeating them all in his single minded pleas for Pakistani. He burned out his life pressing a single buit, yet by winning his ease he changed the map of S. Asia world history."-Wolper, Jinnah of Pakistan, Oxford University Press. p.3.

১৯৭১ সালের সংস্করণে Encyclopaedia Britannica-তে লেখা হয়েছিল, "...but he [Jinnah] had affided his own indelible seal upon the nation he created, which continued to set its standards but the ideas he bequeathed to it." E. B. Vol. (XII) p.1086. আমরা এখনও জিন্নাহ্র মূল্যায়ণে যথেষ্ট বিচক্ষণতা ও ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে পারিনি।

২. শিবপ্রসাদ সেন ১৯৭৩ সালে মনে করেছিলেন যে জিন্নাহ্র মানস পরিবর্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বর্তমানে এ-কথা যুক্তি ও তথ্যনির্ভর নয়। বর্তমান প্রবন্ধে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে কংগ্রেস তার নীতি পরিবর্তনের জন্য জিন্নাহ্ এককভাবে দায়ী ছিলেন না। তাকে কংগ্রেস ত্যাগ করতে একরকম বাধ্য করা হয়েছিল। গান্ধীজী এবং কংগ্রেস প্রথমদিকে জিন্নাহ্কে উপেক্ষা করার জন্যই জিন্নাহ্ লীগের মাধ্যমে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং তাতে সফলও হয়েছিলেন। ড. সেন লিখেছিলেন, "The inner motives and forces behind these successive changes cannot be adequately explained."-Sen, S. P. (ed) Dictionary of National Biography, Vol-11 th, 240-46, Calcutta Girly 1973.

৩. সমকালীন বহু বিখ্যাত ব্যক্তির আত্মচরিত ও স্মৃতিচারণমূলক রচনায় জিন্নাহ্ জীবনের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এসবের মধ্যে সাংবাদিক দুর্গাদাসের 'Indian from cerzon to Nehru and After', রাজেন্দ্রপ্রসাদের আত্মচরিত 'India Divided' পণ্ডিত নেহরুর আত্মচরিত 'The Discovery of India' M. C. Chagla--র 'Roses in

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

December' মৌলানা আবুল কালাম আযাদের 'India Wins Freedom', এম. আর. জয়াকরের 'The Story of My Life', স্যার মির্জা ইসমাইলের 'My Public Life' খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪. জিন্নাহ্-চরিতের উপাদান সংগৃহীত হয়েছে এ যাবৎ প্রকাশিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দলীল প্রভৃতি থেকে। Transfer of Power সংক্রান্ত দলীল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সরকারি দলীল। এই সিরিজের সম্পাদক হচ্ছেন Mansergh। বড়লাট Wavell-এর "The Vicoroy's Journoul', V. P. Minon-এর 'Mission with Mount Deatten', দূর্গাদাস সম্পাদিত Sardar Patel's Correspondance, 1945-50.' মনিবেন প্যাটেল এবং জি. এম. নান্দুরকরের 'Sardar's Letters-Mostly unknown', ওয়াহীদ আহমদ সম্পাদিত 'Jinnah in Win Correspondence, 1927-30' Gulam Ali Allana সম্পাদিত Pakistan Movement : Historic Documents', পাকিস্তান জাতীয় মহাফেজখানায় রচিত Quid-I-Azam Papers' প্রভৃতি। মৌলিক উপাদান আজ সহজলভ্য।

৫. ২নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৬. 'I learnt my first lessons at the feet of Surendranath Banerjee'— শিবপ্রসাদ সেনের লেখায় উদ্ধৃত।

৭. Wolper লিখেছেন 'The first annual session of Congress attended by Jinnah was its 20th held under canvas on Bombay oval in December 1904.' -Jinnah of Pakistan পুস্তকের পৃ.-২০ দ্রষ্টব্য।

৮. জিন্নাহ্ বলেছিলেন, '...A thorough political union among the Indian people of all creeds and classes. ...I appeal to the Indian people for this because it is in their own hands. ... They have in them the capacity, the ebergy and intellect, to hole their own and to get their due share in all walks of life-of which the State services but a small part. ... The thorough union, therefore, of all the people for their emancipation is an absolute necessaty...' -Jinnah of Pakistan পৃ.-২৬-এ উদ্ধৃত ৮৪ বছর পরও এ-কথা আজও কত সত্য। বর্তমান ভারতের সার্বিক উন্নতির জন্যও জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং সহ অবস্থান— এককথায় সাম্প্রদায়িক মিলন এবং ঐক্য একান্তভাবে কাম্য। জিন্নাহ্ যে প্রকৃতই সর্বভারতীয় নেতৃত্বলাভের যোগ্য ছিলেন সে-বিষয়ে আজ আর কোনো সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়।

৯. গোখলেই প্রথম জিন্নাহ্কে 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজদূত' বলে বর্ণনা করেছিলেন। সরোজিনী নাইডু নয়।

১০. আগা খাঁ লিখেছিলেন, 'Our' doughtiest opponent in 1906 was Jinnah, who came out in bitter hostility toward all that I and my friends had done and were trying to do. He was the only well known muslim to take this attidude... He said that our principle of separate electorates was dirding the nation against itself.'-Jinnah of Pakistan, পৃ.-২৬-এ উদ্ধৃত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১১. সুপ্রকাশ রায় গণপতি শ্লোকের বাংলা অনুবাদ করেছেন : 'হায়! তোমাদের দাসত্বে লজ্জা নাই তাহা হইলে আত্মহত্যা করাই উচিত। হায়! এই কসাইরা দানবীয় নিষ্ঠুরতার সহিত গোমাতা ও গোবৎসদের হত্যা করে। তোমরা এই যন্ত্রণা হইতে গোমাতাকে রক্ষা করিতে বদ্ধ পরিকর হও, মৃত্যুবরণ কর, কিন্তু তার পূর্বে ইংরেজদের হত্যা কর; অলস হইয়া বসিয়া থাকিয়া বৃথা ধরণীর ভার বৃদ্ধি করিও না।' —সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ.-১১৪। যদিও ইংরেজ হত্যার কথা শ্লোকে বলা হয়েছে, গো-বধের উল্লেখ থাকায় শ্লোকটিতে মুসলমান বিরোধিতার ছাপ বর্তমান। সমকালীন মুসলিম পত্র-পত্রিকায় এই শ্লোকের সমালোচনা করা হয়েছিল।

১২. এ সময় ভারত ধর্মমহামণ্ডলের এক সভায় (ডিসেম্বর ১৯০৬) দ্বারভাঙার মহারাজা বলেছিলেন, '...with the Hindus Loyalty or Rajbhakti is an element of relegion.'

১৩. জিন্নাহ্ ভাষণটির অনুবাদ করেছেন শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। —শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জিন্নাহ্ : পাকিস্তান-নতুন ভাবনা', পৃ.-১৭-১৮।

১৪. ঐ পৃ.-১৭।

১৫. Wolpert, Jinnah of Pakistan, পৃ.-৩৪।

১৬. জিন্নাহ্র শর্ত ছিল : 'Loyalty to the Muslim League and the Muslim interest would in no way and at no time imply even the shadow of disloyalty to the larger national cause to which his life was dedicated.' -Jinnah of Pakistan, পৃ.-৩৪। ১৯১৩ সালে এরকম কথা বলা ছিল প্রগতির লক্ষণ। মুসলমান নেতাদের, এমনকী মৌলানা আযাদের পক্ষেও, কারুর কাছ থেকে এমন কথা শোনা যায়নি।

১৭. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জিন্নাহ্ : পাকিস্তান-নতুন ভাবনা', পৃ.-২২।

১৮. গান্ধীজীর উত্তর : 'Glad to find a Mahemedan not only belonging to his own region's Sabha but chairing it.' Wolpert-এর মন্তব্য : 'Had he [Gandhi) meant to be malicious rather than his usual inge now self, Gandhi could not have contrived a more eleverly. Patronizing barb, for he was not actually insulting Jinnah, after all, just informing every one of his minority religious identity.

What an odd fact to single out for comment about this multi faceted man, whose dress, behaviour, speech and manner totally belied any resemblance to his religious affiliation. Jinnah in fact, heped by his Anylophile appearance and secular ivit and wisdom to convince the Hindu majority of his colleaguis and ceantryasn that he was, indeed, as qualified to live any of their public organizations Gokhale or Wedderburn or Dadabhai yet here in the first public words Gandhi uttered about him, ever one had to note that Jinnah was a 'Mahamedan' -Wolpert, S. Jinnah of Pakistan, Oxford India Paperbacks 1988, p.-38

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জিন্নাহ্ তখনও পর্যন্ত নিজেকে একজন ভারতীয় হিসাবে মনে করতেন, এবং সর্বভারতীয় নেতৃত্ব লাভের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। মুসলমান স্বার্থরক্ষার কথা তখনও তাঁর মুখ থেকে শোনা যায়নি। সেকুলারভাবাপন্ন এই মানসিকতায় গান্ধীজী আঘাত করেছিলেন জিন্নাহ্‌কে কেবল মুসলিম নেতা বলে উল্লেখ করায়।

১৯. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জিন্নাহ্ : পাকিস্তান-নতুন ভাবনা', পৃ.-২৪।

২০. লখ্‌নৌ চুক্তি অনুসারে বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের জন্য আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট হয়েছিল এরকম :

ব্যবস্থাপক সভা	শতকরা মুসলমানদের সংখ্যা	মুসলমান আসন সংখ্যা % হিসাবে
পাঞ্জাব	৫৪.৮	৫০
যুক্তপ্রদেশ	১৪	৩০
বঙ্গদেশ	৫২.৬	৪০
বিহার-উড়িষ্যা	১০.৫	২৫
মধ্যপ্রদেশ	৪.৩	১৫
মদ্রাজ	৬.৫	১৫
বোম্বাই	২০.৪	৩.৩৩

২১. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জিন্নাহ্ : পাকিস্তান-নতুন ভাবনা', পৃ.-২৫।

২২. -ঐ-।

২৩. -ঐ- পৃ.-২৭।

২৪. Wolpert, Jinnah of Pakistan, পৃ.-৫৭।

২৫. জিন্নাহ্‌র সমালোচনা ছিল যুক্তিসঙ্গত এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, 'To substitude the executive for judicial will lead to the abuse of the those vast powers... if these measures were passed they will erente unprecedented, agitation and will have the most disastrous effect upon the relations between the Govt. and the people.' Jinnah of Pakistan, পৃ.-৬১।

২৬. -ঐ- পৃ.-৬২।

২৭. Wolpert-এর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় : '...it was he first only time Jinnah would be roughed up and bruised by any one in uniform' -Jinnah of Pakistan, পৃ.-৫৯।

২৮. সেইদিন সন্ধ্যায় জিন্নাহ্‌র ভাষণে উল্লেখ্যযোগ্য অংশ ছিল : 'Gentlemen, you are the citizen of Bombay. Your triumph today has made it clear that even the combined forces of bureaucracy and autocracy could not everpower you. December the 11th is a Red-Letter Day in the history of Bombay. Gentlemen, go and rejoice over the day that has secured us the triumph of democracy.'- Jinnah of Pakistan, পৃ.-

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৫৯। সর্বশক্তিতে বিশ্বাসী, গণতন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এ অন্য জিন্নাহ্‌র ভাবমূর্তি আমাদের কাছে তুলে ধরে।

২৯. Jinnah of Pakistan, পৃ.-৬৭।

৩০. গান্ধীজী ও জিন্নাহ্‌র পার্থক্য খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন Wolpert অল্প কয়েকটি বাক্যের মাধ্যমে : 'Jinnah was the model of urban westernized India at its clearest and sharpest. Gandhi reficeted India's Ecean of peasant wisdom and village life with its infinite capacity to enduc poverty and patiently suffer any hardship.'-Jinnah of Pakistan, পৃ.-৬৯।

৩১. গান্ধীজীর পত্রের উত্তরে জিন্নাহ্ লিখেছিলেন : '...if by new life' you mean your methods and your programme, I am afraid cannot accept them, for I am fully convinced that it must lead to disaster.' -Jinnah of Pakistan, পৃ.-৭০-৭১

৩২. -ঐ- পৃ.-৭১।

৩৩. -ঐ- পৃ.-৭১।

৩৪. -ঐ- পৃ.-৭২।

৩৫. 'Yet every Gury. Khilafat Conference, Swaraj Sabha, Congress and Muslim League had rejected his arguments as outmoded, cowandly, or invalid. There was no count of appeals left for the moments, so Jinnah went silently home... his career in politics a shambles, though hardly at an end.-Jinnah of Pakistan, পৃ.-৭২। Wolpert -এর এই বর্ণনা সত্যই মর্মস্পর্শী।

৩৬. 'As farther and events showed, it was a mistake on the part of Gandhi and the Congress leadership to treat such a man with indifferent.' S. P. Sen (ed), Dictionary of National Biography Vol-II, পৃ-২৪০-৪৬। ড. সেনের এ মন্তব্য যথার্থ।

৩৭. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'History of Freedom Movement in India, Vol-III, পৃ.-৯৭-তে সুভাষ বসুর বিবরণীর উদ্ধৃতি আছে।

৩৮. ওই বইয়ের ৯৮ পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক মজুমদার লিখেছেন, যে কেবল জিন্নাহ্‌ই গান্ধী প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন।

৩৯. 'With great, respect for Gandhi and those who think with him, I make bold to say in this Assembly that you will never get your independence without blood shed.' Durga Das. 'India from curzon to Nehru and After', পৃ.-৭৬। এ মন্তব্য সত্যই।

৪০. "Well, youngmen, I will have nothing to do with this pseudo-religious approach to polities. I part company with the congress and Gandhi. I do not believe in working up mob hysteria. Politics is a Gentleman, Durga Das, 'India from curzon to Nehru and After', পৃ.-৭৬।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪১. Wolpert, Jinnah of Pakistan, পৃ.-৮৫।

৪২. 'We are starting the state woth no discrimination, no distinction between one community and another, between easte or cread, we are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. We should keep that infront of us as our ideal, and you will find that in course of time Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizen of the nation.'–August 11, 1947 এ পাকিস্তান সংবিধান সভার সভাপতির ভাষণের অংশবিশেষ। Dr. Sachin Sen-এর লেখা 'The Birth of Pakistan', পৃ.-১৯০-এ ভাষণটি উদ্ধৃত। ভাষণটি জিন্নাহ্‌র সেকুলার মনোভাবের জ্বলন্ত প্রমাণ। জিন্নাহ্ যে প্রকৃতই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন সে-কথা ভাষণটির প্রতি ছত্রে সোচ্চার।

৪৩. Wavell, The Viceroy's Journal, edited by P. Moon, p.-314, First Indian Impression, 1974, Viceroy's Journal-এর অন্যত্র ও Wavell গান্ধীজীর কঠোর সমালোচনা করেও বিরূপ মন্তব্য করেছেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নেহরু রিপোর্ট, সাম্প্রদায়িক জটিলতা এবং জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে মুসলিম লীগের উত্থান

মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক
প্রখ্যাত ইতিহাস রচয়িতা

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা সৃষ্ট স্বল্পকালীন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বিনষ্ট হবার পর উপমহাদেশে চরম আকারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যায়।[১] প্রবল আকারে দাঙ্গা বেধে যাবার পেছনে কারণ রূপে কাজ করেছে একদিকে মোপলা বিদ্রোহ এবং অপরদিকে ১৯২৩ সালে বেনারসে চরম সাম্প্রদায়িক হিন্দু সংগঠন 'হিন্দু মহাসভা'র পুনর্গঠন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে গঠিত এ সংগঠনটি প্রথমে সামাজিক-ধর্মীয় সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও অচিরেই এটি একটি পুরোদস্তুর রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন'। শুদ্ধি অর্থ হল সমস্ত অহিন্দুকে হিন্দুধর্মে রূপান্তরিত করা এবং 'সংগঠন' অর্থ হল হিন্দুদেরকে অহিন্দুদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করা। এ দল তাদের কার্যাবলী বা উদ্দেশ্যকে কখনও রেখে-ঢেকে রাখেনি। এ দলের একজন প্রধান প্রতিনিধি লালা হরদয়াল বলেন, "হিন্দুস্তান এবং পাঞ্জাবে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ এ চারটি স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল : ১) হিন্দু সংগঠন, ২) হিন্দুরাজ, ৩) মুসলিমদের শুদ্ধি করা এবং ৪) আফগানিস্তান ও সীমান্ত জয় করা এবং শুদ্ধি করা। যতদিন হিন্দু জাতি এ-চারটি বিষয় আয়ত্ত করতে না পারবে ততদিন আমাদের পুত্র-প্রপৌত্রদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে থাকবে এবং হিন্দু জাতির নিরাপত্তা অসম্ভব হবে। লালা হরদয়ালের মতে, মুসলমানরা এ-দেশে থাকতে পারে যদি তারা "হিন্দু নাম গ্রহণ করে, আরবী ও ইরানী নাম বাদ দেয়, হিন্দু পূজা-পার্বন মান্য করে, পৌরাণিক হিন্দু বীরদের সম্মান করে, হিন্দুদের ন্যায় কাপড় পরিধান করে, হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান পালন করে এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলা ত্যাগ করে। এরপরও যদি তারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসরণ করতে চায় তবে তাদের নিজস্ব নিয়মে তা পালন করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে, তবে তাদের নিজেদেরকে অবশ্যই 'মোহাম্মদী হিন্দু' বলতে হবে।[২] কংগ্রেসের অনেক হিন্দু নেতা হিন্দু মহাসভা পরিচালিত 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠনকে সমর্থন করেন। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন, "স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদী ও মুসলমানরা সমালোচনা করেন। এই বিশেষ সময়ে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে যাই বলুক কেন, গুণাগুণ বিচারে খ্রিস্টান ও মুসলমানরা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কীভাবে এতে আপত্তি করে তা বোধগম্য নয়। তারা সর্বদা তাদের ধর্মান্তকরণের কাজে নিয়োজিত আছে এবং হিন্দুদেরকে তাদের। ধর্মে দীক্ষিত করায়; তবে অহিন্দুদের, বিশেষত যারা নিজেরাই ধর্মান্তকরণের কাজে নিয়োজিত রয়েছে, এ কাজে আপত্তি করার কোনো কারণ নেই। অন্যদের যেরূপ রয়েছে।[৪] হিন্দুদেরও তাদের ধর্ম প্রচারের অধিকার রয়েছে। লালা লজপত রায় একাধারে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন। অনেক পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য শুধু কর্মপন্থার, আদর্শগত নয়। উভয় সংগঠনই হিন্দু মানস ও আকার প্রতিফলনকারী। ড. বি. আর. আম্বেদকর-এর মতে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে, হিন্দু মহাসভা কথাবার্তায় অশালীন এবং কার্যক্ষেত্রে নিষ্ঠুর আর কংগ্রেস মোলায়েম ও বিজ্ঞ।[৫] যা হোক, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিবেশে হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে শুদ্ধি ও সংগঠন বেশ জোরদার হয়। আগ্রা থেকে সমগ্র উত্তর ভারতে এটি অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করে। শীঘ্রই এর অনুসারীরা আগ্রা ও তার আশেপাশে বিশ হাজার লোককে ভিন্ন ধর্ম থেকে পুনর্দীক্ষিত করে। তৎসঙ্গে তারা শরীরচর্চার জন্য সমাজসেবক দল' নামে একটি দল গঠন করে।[৬]

হিন্দুত্বের 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন'-এর জবাবে মুসলমানরা 'তবলীগ' সোসাইটি গঠন করে।[৭] ইসলাম প্রচারের জন্য 'তবলীগ' সংস্থাসমূহকে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য জমিয়তুল উলামা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। শীঘ্রই পাঞ্জাবে হিন্দুদের সংগঠন সভাসমূহকে মোকাবেলা করার জন্য 'তনজীম' বা সংগঠন সমিতিসমূহ গঠন করা হয়।[৮]

খেলাফত আন্দোলন শেষ হলে খেলাফত কনফারেন্স কমিটি এবং জমিয়তুল উলামা একদিকে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ, অপরদিকে জাতীয়তাবাদ—এই দু'য়ের কোন পথ ধরবে তা নিয়ে ভাবনায় পড়ে। এদের অধিকাংশ সদস্য জাতীয়তাবাদের অনুকূলে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ তা চায় না। আপামর মুসলিম জনগণ খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা প্রবলভাবে স্বাধীনতার প্রতি অনুরক্ত হয়, কিন্তু সে স্বাধীনতার সুযোগ-সুবিধাদি যেন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়ের ভিত্তিতে বণ্টন করা হয় তাও কামনা করে। অতঃপর মুসলমান তাদের ন্যায় অধিকারের জন্য আন্দোলন করে।[৯] কিন্তু গান্ধী তার ঐক্যের প্রচেষ্টা তখনও ত্যাগ করেননি। ১৯২৪ সালের নভেম্বরে বোম্বেতে তিনি একটি আলোচনা সভা ডাকেন। পরিণতিতে একটি সর্বদলীয় সভার আয়োজন করা হয়। এতে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, জাস্টিস পার্টি, লিবারেল ফেডারেশন, ইন্ডিয়ান খ্রিস্টিয়ানস ও অন্যান্য দলের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। অতঃপর ৪০ জনের একটি কমিটি করা হয় তিনটি বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য। এগুলো হল : ক) কোন পন্থা অবলম্বন করলে সব দল কংগ্রেসে যোগদান করতে পারে, খ) আইন পরিষদ ও অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থায় সব সম্প্রদায়, জাতি ও উপদলসমূহের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতিনিধিত্ব করা যায় এরূপ একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন, গ) স্বরাজের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন। ক-এর উপকমিটি তাদের প্রতিবেদন প্রদান করলেও খ-এর উপকমিটি মাত্র একবার মিলিত হয়, কারণ লজপত রায় ও অন্য হিন্দুরা এতে অংশগ্রহণ করবেন না। লজপত রায়-এর মতে, কোনো কোনো প্রদেশে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং কোনো কোনো প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা হিন্দু-মুসলিম ঐক্য আসবে এ-কথা তিনি স্বীকার করেন না।[১০]

গান্ধী এখন নিরুপায়। তাঁর আন্দোলনের সঙ্গীরা এখন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের শিকার। মুসলমানরা দলে দলে কংগ্রেস ত্যাগ করতে থাকে। হিন্দু মহাসভা যেহেতু মুসলিম লীগের ন্যায় হতে পারেনি তাই মুসলমানরা কংগ্রেসকে একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠানরূপে আখ্যায়িত করে এবং লীগকে একটি মুসলমান প্রতিষ্ঠানরূপে চিহ্নিত করে। কংগ্রেসের মধ্যে তখনও বেশ কিছু সংখ্যক উলামা ছিলেন যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ কিন্তু তা সত্ত্বেও আপামর মুসলিম জনসাধারণের নিকট এটি একটি হিন্দু সংগঠনরূপে চিহ্নিত হয়ে যায়।[১১]

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ তাদের ১৯২৪, ১৯২৫ ও ১৯২৬ সালের বার্ষিক অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক সমস্যাটি সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। অতঃপর মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে ১৯২৭ সালের ২০ মার্চ দিল্লিতে মুসলমানদের এক ঐক্যসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য পুনঃস্থাপন করা।[১২] সভায় নেতৃবৃন্দ ১৯১৯ সালের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার বা মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট ১৯১৯-এ। অন্তর্ভুক্ত পৃথক নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর জিন্নাহ্ পৃথক নির্বাচন প্রথা বাতিল করার সুপারিশ করেন। নেতৃবৃন্দ নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে এতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন :

১. বোম্বে প্রেসিডেন্সি থেকে সিন্ধুকে পৃথক করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশে রূপান্তরিত করা হবে।

২. ১৯১৯ সালের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানেও প্রয়োগ করা হবে।

৩. পাঞ্জাব ও বাংলায় সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

৪. কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব এক-তৃতীয়াংশের কম হবে না।

উল্লেখ্য, স্যার মুহাম্মদ শফীর নেতৃত্বে পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে; অপরদিকে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কিছু সংখ্যক হিন্দু সদস্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ১৯১৯ সালের সংস্কার প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও জিন্নাহ্ দিল্লি প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে যান। অপরদিকে কংগ্রেস এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। বস্তুত সিন্ধুকে প্রদেশে রূপান্তরিত করা বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সংস্কার প্রবর্তন করা মুসলমানদের নিকট পৃথক নির্বাচনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও একমাত্র হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য জিন্নাহ্ এ-প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে যান।[১৩] অতঃপর নতুন ভাইসরয় লর্ড ইরভিন (Lord Irvin) একটি রাজকীয় কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেন। এতে কোনো ভারতীয় সদস্য থাকবে না। ফলে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয়ে এটা প্রত্যাখ্যান করে। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যান্য দলের সাথে মত বিনিময় করে একটি 'স্বরাজ শাসনতন্ত্র'-এর খসড়া প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অপরদিকে মুসলিম লীগও এ ব্যাপারে একটি সাব-কমিটি গঠন করে এবং স্বরাজ শাসনতন্ত্রের খসড়ায় যাতে দিল্লি প্রস্তাব অনুযায়ী তাদের দাবি-দাওয়া অন্তর্ভুক্ত করা হয় তার ব্যবস্থা করে। পরে সমস্ত দলের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য কংগ্রেস একটি সর্বদলীয় সভা ডাকে। ইতিমধ্যে ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড ভারতীয়দের সর্বসম্মত একটি শাসনতন্ত্র রচনার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। যা হোক, ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে এলাহাবাদে সর্বদলীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু হিন্দু-শিখ আঁতাত কিছুতেই মুসলিম দাবি-দাওয়া মানতে রাজি হয় না। মুলতুবী সভা তিনবার অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সর্বসম্মত একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ব্যর্থ হয়। পরে একটি ছোট কমিটি নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত হয়।[১৪]

১৯২৮ সালের ১৯ মে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য যে কমিটি গঠন করা হয় তার প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয় পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে। এর অন্যান্য সদস্য ছিলেন এস. আলী ইমাম, তেজ বাহাদুর সপ্রু, এম. এস. এ্যানি, মঙ্গল সিং, শোয়েব কোরেশী, সুভাষচন্দ্র বোস, জি. আর. প্রধান, এম. আর. জয়কার এবং এন. এম. যোসী। শেষোক্ত দুজন কোনো সভায় যোগ দেননি। দুজন মুসলিম সদস্যের মধ্যে আলী ইমাম অসুস্থতার জন্য শুধু একটি সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং অপর সদস্য শোয়েব কোরেশি। আইন পরিষদে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব ও আইন সংরক্ষণের ব্যাপারে কমিটির মতামত সমর্থন করেননি। এটিই প্রসিদ্ধ নেহরু রিপোর্ট। নেহরু কমিটি প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে নিম্নোক্ত রিপোর্ট প্রদান করে।[১৫]

১. সমগ্র ভারতে যুক্ত মিশ্র নির্বাচন হবে।

২. গণপরিষদে (কেন্দ্রীয় আইনসভা) কোনো আসন সংরক্ষিত থাকবে না, তবে যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু তাদের জন্য এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হিন্দুদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। এ ধরনের আসন সংরক্ষণ শুধু ঐসব প্রদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যানুপাতে হবে যেখানে তারা সংখ্যালঘু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অমুসলমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যানুপাতে। যেসব প্রদেশে হিন্দু বা মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে সেখানে তারা ইচ্ছা করলে বাড়তি আসনের জন্যও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩. ক. পাঞ্জাব ও বাংলাদেশে কোনো সম্প্রদায়ের জন্য কোনো আসন সংরক্ষিত থাকবে না।

খ. পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশে মুসলমান সংখ্যালঘুদের জন্য জনসংখ্যানুপাতে আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তৎসঙ্গে বাড়তি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকারও থাকবে।

গ. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অমুসলমানদের জন্য অনুরূপ আসন সংরক্ষিত থ থাকবে এবং তৎসঙ্গে বাড়তি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকারও থাকবে।

৪. যেসব প্রদেশে আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে তা সেখানে দশ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।

৫. সিন্ধুকে বোম্বে থেকে পৃথক করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশে রূপান্তরিত করা হবে, তবে অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে আলাদা প্রদেশ কার্যকরী হবে।

৬. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং এ ধরনের গঠিত নতুন প্রদেশসমূহ অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় সরকার গঠন করবে।

শাসনতন্ত্রের সুপারিশ অনুযায়ী ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে উপনিবেশিক স্থায়িত্বশাসন-এর মর্যাদা (Dominion status) দাবি করা হয়। ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হয়, এই দাবি যাতে ব্রিটিশ মহলেও সমাদৃত হয় সেজন্য উপনিবেশিক স্থায়িত্বশাসন-এর মর্যাদা চাওয়া হয়েছে।[১৬] মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও সুভাষচন্দ্র বোস এটির বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে এটি কংগ্রেসের পূর্বেকার পূর্ণ স্বাধীনতা দাবির বিনিময়ে আপোষ করা হয়েছে বিধায় চরম বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।[১৭] অপরদিকে নির্বাচনের ব্যাপারে যে সুপারিশ করা হয়েছে সে ব্যাপারেও মুসলমানরা হতাশ হয়। নির্বাচন কি পৃথক হবে, না যুক্ত হবে, আসন সংরক্ষণ থাকবে, কি থাকবে না—এসব বিষয়ে ইতিপূর্বে অনেক আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, মুসলমানরা পৃথক নির্বাচনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তারা মনে করে, যুক্ত নির্বাচনের দ্বারা বিশাল হিন্দু সংখ্যাগুরুর সামনে মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ চরমভাবে বিঘ্নিত হবে। পৃথক নির্বাচনের এই দাবি ব্রিটিশ সরকার তাদের ১৯০৯ ও ১৯১৯ সালের শাসনতন্ত্রে স্বীকার করে নিয়েছে, অপরদিকে ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে হিন্দুরাও একে মেনে নিয়েছে। তারপরেও একটি সমঝোতার পরিবেশে কিছু দাবি পূরণ সাপেক্ষে মুসলমানদের একটি শক্তিশালী অংশ এম. এ. জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে এই মৌলিক দাবিটি ত্যাগ করতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু নেহরু কমিটি মুসলমানদের প্রদত্ত এই সহযোগিতা ও সমঝোতার প্রশংসা করেনি। মুসলিম লীগের দিল্লি প্রস্তাবের শুধু পৃথক নির্বাচনের বিষয়টিই কমিটি রক্ষা করেছে। অথচ অন্য বিষয়গুলি কমিটি গ্রাহ্যই করেনি।[১৮] আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে মুসলমানদের বক্তব্য

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বাংলায় অমুসলমানদের আসন সংরক্ষণ করা হয়নি। এখানে মুসলমানরা সংখ্যায় হিন্দুদের কিছু ওপরে। কিন্তু এখানে মুসলমানদের অর্থনৈতিক যে অবস্থা তাতে তারা কিছুতেই হিন্দুদের সাথে এঁটে উঠতে পারবে না। অপরদিকে ১৯২৭ সালের দিল্লি প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের দাবিও নাকচ করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে কমিটির বক্তব্য হচ্ছে, মুসলমানরা ব্রিটিশ ভারতের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। এই সংখ্যানুপাতের ভিত্তিতেই মুসলিম সংখ্যালঘু এলাকায় আসন সংরক্ষন্দ করা হয়েছে। অতএব, এক-তৃতীয়াংশ আসন তাদের জন্য রাখা যায় না।[১৯]

সিন্ধুকে একটি আলাদা প্রদেশ হিসেবে গঠন করার মুসলিম দাবি আপাতত ধামাচাপা দেয়া হয়েছে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা বলে। অর্থাৎ নেহরু রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার গঠন করা হলে একটি তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হবে অর্থনৈতিকভাবে সিন্ধু স্বয়ংসম্পূর্ণ কিনা, একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেই আলাদা প্রদেশ হিসেবে একে গঠন করা হবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৯১৯ সালের সংস্কার প্রবর্তন করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বেলুচিস্তানের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এটি উল্লেখ করা হলে বলা হয় যে ভুলে এইটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এই ভুলই (Overright) ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে; ভবিষ্যতে যে এ ধরনের ভুল হবে না তার নিশ্চয়তা কে দেবে।

ভারতীয় রাজনীতির অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, একটি ফেডারেল পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা ভারতের জন্য অত্যন্ত কার্যকর হবে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় কেন্দ্রের হাতে রেখে প্রদেশগুলিকে যতটা সম্ভব স্বায়ত্তশাসন দিলে একটি সমঝোতার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র কার্যকর ও অর্থবহ হবে। এ ক্ষেত্রে মুসলমানরা যেখানে সংখ্যায় অধিক যথা বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও বেলুচিস্তানে তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের উন্নতির কাজ করতে পারে। এখানে তাদের নীতি হচ্ছে : "নিজেও বাঁচ, অপরকে বাঁচতে দাও"। তারা চায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় তাদের ওপর যাতে অহেতুক কোনো দমননীতি না চালায়। নেহরু রিপোর্ট এদিকে না গিয়ে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রবক্তা হয়ে যায়। তাদের বক্তব্য হল প্রদেশের ক্ষমতা হবে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং কেন্দ্রীয় সরকার যেন প্রত্যেক বিভাগের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে। অপরদিকে মুসলমানরা চায় অনুল্লিখিত ক্ষমতা (Residuary Power) প্রদেশের হাতে থাকুক; কিন্তু রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, এ ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। একজন প্রখ্যাত শাসনতন্ত্রবিদ অধ্যাপক কপল্যান্ড বলেন : নেহরু রিপোর্টকে "ফেডারেল পদ্ধতির বলা যায় না। শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশ ১৯১৯-এর অ্যাক্টের অধিক অগ্রসর হয়নি। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিষয়াদির তালিকা পূর্ববৎ রয়ে গেছে এবং এতে অনুল্লিখিত সমস্ত বিষয় শাসনতন্ত্র কেন্দ্রকে অর্পণ করছে।[২০] কেন্দ্রীয় বিষয়াদির সংখ্যা রাখা হয় সাতচল্লিশে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, মুদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, রেলওয়ে-এককথায় রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি। অধিকন্তু প্রাদেশিক আইনের ওপর কেন্দ্রের আইনের প্রাধান্যও পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।[২১]

নেহরু রিপোর্টের ব্যাপারে মুসলমানদের আশঙ্কার আরেকটি কারণ হল কেন্দ্রের আধিপত্য। শাসনতন্ত্রে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করা হয় রাজাকে, রাজা সে ক্ষমতা কার্যকরী করবেন তার প্রতিনিধি গভর্নর জেনারেলের মাধ্যমে, গভর্নর জেনারেল একটি কার্যকরী সংসদের (Executive Council) উপদেশে সে ক্ষমতা কার্যকরী করবেন। এটি যুক্তরাজ্য ও ডোমিনিয়নে প্রচলিত আইনের পরিপন্থী। সেখানে এ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় কনভেনশন বা প্রচলিত প্রথার মাধ্যমে। যা হোক, প্রধানমন্ত্রী ও ছয়জন মন্ত্রী নিয়ে একটি কার্যকরী সংসদ গঠন করা হবে। গভর্নর জেনারেল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন এবং তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে মন্ত্রীও নিয়োগ করবেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ব্যতিক্রমে মন্ত্রীসভায় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে কিছুই নেই। ফলে সাধারণ সংখ্যাগুরুর শাসনই এখানে বোঝানো হয়েছে এবং যেহেতু দলীয় ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত, তাই এক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু হিন্দু শাসনই ভারতে চালু হবে। মুসলমান ও অন্য সংখ্যালঘুদের প্রশাসনে কোনো কথাই খাটবে না। নেহরু রিপোর্টের প্রণেতাগণ একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের আইন রচনা করেছেন, যে কেন্দ্র পরিচালিত হবে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের দ্বারা এবং মুসলমানরা চিরকাল সংখ্যালঘু হয়েই থাকবে। অতএব, নেহরু রিপোর্ট কার্যকরী হলে এ-দেশে ব্রিটিশরাজের পরিবর্তে হিন্দুরাজই কায়েম হবে।[২২]

মুসলমানদের মধ্যে নেহরু রিপোর্টের প্রতিক্রিয়া ছিল অতি বেদনাদায়ক। মুসলিম লীগের দিল্লি প্রস্তাব তো এর মধ্যে আসেইনি বরং কংগ্রেসের মাদ্রাজ প্রস্তাবও এর থেকে বাদ পড়ে। মাওলানা মুহাম্মদ আলী নেহরু রিপোর্টকে বর্ণনা করেন "অশেষ দাসত্ব ও হিন্দু আধিপত্য" হিসেবে। ১৯২৮ সালের ২৮ থেকে ৩১ আগস্ট লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত একটি সর্বদলীয় সম্মেলনে রিপোর্ট পেশ করা হয়। সম্মেলনে কিছু সংশোধনী আসে। রিপোর্টটি পুনরায় পেশ করার জন্য এবং নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব পাশ হয়। পরে মুসলিম লীগের সভাপতি জিন্নাহ্‌কে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, নেহরু কমিটি শাসনতন্ত্রটিকে একটি প্রস্তাব আকারে পরবর্তী একটি সর্বদলীয় কনভেনশনে উত্থাপন করবেন। ১৯২৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর কলকাতায় সর্বদলীয় কনভেনশন ডাকা হয়। মুসলিম লীগ কনভেনশনে যোগ দেয় এবং কিছু সংশোধনী উত্থাপন করে। এগুলো হল : কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রাখা; পাঞ্জাব ও বাংলার আইন পরিষদে সংখ্যানুপাতে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা; এবং অনুল্লিখিত ক্ষমতা (Residuary Powers) প্রদেশের হাতে দেয়া।[২৩] মুসলমানদের দাবিসমূহ বিবেচনার জন্য ইতিপূর্বে যে উপকমিটি গঠন করা হয় সে কমিটি এসব সংশোধনী সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করার সুপারিশ করে। লীগ সভাপতি জিন্নাহ্ তবুও আশান্বিত হয়ে সংশোধনীগুলি উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টায় তার ঐকান্তিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি সংশোধনীগুলি কনভেনশনে উত্থাপনই করতে পারেননি। হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিগণ অনড়, অবিচল; তারা হুমকি দেন লীগের সংশোধনীসমূহ গ্রহণ করা হলে তারা সভা ত্যাগ করবেন। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসও মহাসভার দাবির নিকট নতিস্বীকার করে। অতঃপর এটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কংগ্রেস মূলত একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান। এম. এ. জিন্নাহ্ সর্বদলীয় সম্মেলনের একজন উদ্যোক্তা হওয়া সত্ত্বেও তার এখন মোহভঙ্গ হয়; কনভেনশনে তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে তিনি একে পথের বিভক্তি বলে আখ্যায়িত করেন। তার ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও সর্বদলীয় কনভেনশনে কোনো সংশোধনী ছাড়াই নেহরু রিপোর্ট গৃহীত হয়। এভাবে নেহরু রিপোর্ট হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনের চাইতে অনৈক্যই সৃষ্টি করে। সর্বদলীয় কনভেনশন কর্তৃক নেহরু রিপোর্ট গৃহীত হলে জিন্নাহ্ শীঘ্রই মুসলিম দাবিসমূহ বিন্যস্ত করেন যা তার 'চৌদ্দ দফা' নামে খ্যাত।[২৪] মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাওলানা আবুল কালাম আযাদের নেতৃত্বে "ন্যাশনালিস্ট পার্টি" নামে একটি দল গঠন করে এবং নেহরু রিপোর্ট সমর্থন করে। অপরদিকে আগা খানের নেতৃত্বে "নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্স" নামে আরেকটি নতুন সংগঠন স্থাপিত হয়। এটি ১৯২৯ সালের ১ জানুয়ারি দিল্লিতে সম্মেলন করে। এ পটভূমিকায় জিন্নাহ্ মুসলিম কনফারেন্সের লোকদেরকে একত্রিত করে দিল্লিতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করেন। জিন্নাহ্ তার জ্বালাময়ী বক্তৃতায় মুসলমানদের সম্মোহিত করে তার উল্লিখিত 'চৌদ্দ দফা' পেশ করেন। তিনি বলেন, "আপনারা যদি কোনো দায়িত্ব কাঁধে নিতে চান, আপনাদের সিদ্ধান্তে কোনো গুরুত্ব যদি আনতে চান, আপনারা যদি চান মুসলিম ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হোক, তবে একমাত্র একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্তের দ্বারাই তা সম্ভব হতে পারে।[২৫] পরে তিনি তার 'চৌদ্দ দফা' ব্যাখ্যা করেন। এগুলো নিম্নরূপ :

১. ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের গঠন হবে ফেডারেল পদ্ধতির এবং অনুল্লিখিত ক্ষমতা (Resuduary Powers) থাকবে প্রদেশের হাতে।

২. সব প্রদেশকে একই প্রকারের স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

৩. দেশের প্রত্যেক প্রদেশের আইন পরিষদে ও অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থায় সংখ্যালঘুদের যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে এবং এই প্রতিনিধিত্ব যাতে আবার সংখ্যাগুরুকে। সংখ্যালঘুতে পরিণত না করে সেদিকেও নজর দিতে হবে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪. কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম হতে পারবে না।

৫. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব হবে বর্তমানের ন্যায় পৃথক নির্বাচনের দ্বারা তবে যে কোনো সম্প্রদায়ের যে কোনো সময় ইচ্ছা করলে যেন পৃথক নির্বাচন বাদ দিয়ে যুক্ত নির্বাচনে যেতে পারে।

৬. ভূখণ্ডগত কোনো পুনর্গঠন কখনও প্রয়োজন হলে তা এমনভাবে হতে পারবে না যা দ্বারা পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্ষুণ্ন হয়।

৭. সমস্ত সম্প্রদায়কে তাদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা—অর্থাৎ বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন, প্রচার, সংস্থা গঠন ও ধর্মীয় শিক্ষার স্বাধীনতা দিতে হবে।

৮. কোনো আইন বা প্রস্তাব বা এর কোনো অংশবিশেষ কোনো আইন পরিষদ বা কোনো নির্বাচিত সংস্থায় পাস হতে পারবে না, যদি উপস্থিত কোনো সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য সে আইন বা প্রস্তাব তাদের সম্প্রদায়ের স্বার্থহানিকর বিবেচনা করে বাধা প্রদান করতে পারে বা এর বিকল্প হিসেবে এসব বিষয়ে সমাধানের পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

৯. বোম্বে প্রেসিডেন্সি থেকে সিন্ধু পৃথক করতে হবে।

১০. অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানেও সংস্কার[২৬] চালু করতে হবে।

১১. সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের চাকুরিতে যোগ্যতার মাপকাঠির প্রতি নজর রেখে অন্যান্য ভারতীয়দের ন্যায় মুসলমানদেরকে পর্যাপ্ত অংশ প্রদান করার মতো আইন শাসনতন্ত্রে থাকতে হবে।

১২. মুসলমানদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ, মুসলমানদের শিক্ষা, ভাষা, ধর্ম, ব্যক্তিগত আইন এবং মুসলমানদের দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, রাষ্ট্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানসমুহে তাদের ন্যায্য পাওনা নিশ্চিত করার মতো যথেষ্ট আইন শাসনতন্ত্রে থাকতে হবে।

১৩. ন্যূনপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ আনুপাতিক হারে মুসলমান মন্ত্রী ছাড়া কোনো কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠন করা যাবে না।

১৪. ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সম্মতি ছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক শাসনতন্ত্রে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।[২৭]

মাওলানা আবুল কালাম আযাদের নেতৃত্বাধীন পূর্বোল্লিখিত 'ন্যাশনালিস্ট পার্টি' ছাড়া মুসলমানদের সমস্ত অংশ নেহরু রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে। তাই নেহরু রিপোর্ট ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যের চাইতে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধিক। তবে মুসলমানদের লাভ হয়েছে এই যে, ইতিপূর্বে বিভক্ত মুসলিম দলসমূহ এখন থেকে একত্রিত হয় এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগা খানের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় মুসলিম কনফারেন্স ডাকা হয়। সভায় গৃহীত বিস্তারিত প্রস্তাবমালায় উল্লেখ করা হয় যে, মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন দিতে হবে, পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশে মুসলমানদের আইনগত সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিতে হবে, কেন্দ্রে মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে এবং অনুল্লিখিত ক্ষমতা (Residuary Power) প্রদেশের হাতে দিয়ে একটি ফেডারেল পদ্ধতির সরকার গঠন করতে হবে। পরবর্তী মুসলমান রাজনীতির ধারা ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব" পর্যন্ত এ ধাঁচেই চলে।[২৮]

সায়মন কমিশন

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভাইসরয় লর্ড ইরভিনের প্রস্তাব অনুসারে ব্রিটিশ সরকার ১৯২৭ সালের নভেম্বরে স্যার জন সায়মনের নেতৃত্বে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে একটি কমিশন নিয়োগ করে। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে এ ধরনের কমিশন নিয়োগের উল্লেখ রয়েছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সাতজন সদস্য সম্বলিত এ কমিশন ভারতে দু'বার দীর্ঘ সফর করে। প্রথম সফর ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় সফর ১৯২৮ সালের ১১ অক্টোবর থেকে ১৯২৯ সালের ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ভারতীয় কোনো সদস্য এতে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় কংগ্রেস এ কমিশনের সাথে কোনো সহযোগিতা থেকে বিরত থাকে। অপরদিকে জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ একে বয়কট করে, কিন্তু লাহোরের মিয়া মুহাম্মদ শফীর নেতৃত্বাধীন লীগ এর সাথে সহযোগিতা করে। যা হোক, বয়কট সত্ত্বেও সায়মন কমিশন তার কাজ সমাধা করে এবং ১৯৩০ সালে দু'খণ্ডে এর রিপোর্ট প্রকাশ করে। কমিশন দ্বৈত সরকার (Dyarchy) বিলোপ এবং প্রদেশের হাতে ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন দিয়ে ফেডারেল পদ্ধতির সরকার গঠনের সুপারিশ করে। আরও সুপারিশ করে যে, পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি রাখা হোক এবং মুসলিম সংখ্যালঘু এলাকাগুলোতে তাদের আসন সংরক্ষণ (Weightage) দেয়া হোক। অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে সিন্ধুকে বোম্বে থেকে পৃথক করা হোক।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ কমিশনের সাথে কোনো সহযোগিতা না করলেও ব্রিটেনের বামপন্থী পত্র-পত্রিকা একে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এক বিরাট পদক্ষেপ বলে অভিহিত করে।[৩০] যে কোনো আপোষকে দুর্বলতা মনে করে, তারা এটির বিরোধিতা করে। কিন্তু ভারতের দুটি প্রধান দল এর বিরোধিতা করায় এর সুপারিশ কোনো ফলোদয় করতে ব্যর্থ হয়; এবং শাসনতান্ত্রিক জটিলতা থেকেই যায়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গোলটেবিল বৈঠক

ব্রিটিশ সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপ হল শাসনতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে লন্ডনে সর্বদলীয় ইন্দো-ব্রিটিশ গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান। বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল সায়মন কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের প্রকৃত রূপ দান করা। ১৯৩০, ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে এ তিনটি বৈঠক বসে। ১৯৩০ সালের নভেম্বরে প্রথম বৈঠকে কংগ্রেস অনুপস্থিত থাকে। তাদের ভাষ্য হল, বৈঠকের মূল লক্ষ্য হতে হবে ভারতের ডোমিনিয়নের মর্যাদা প্রদান। ব্রিটিশ সরকার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে কংগ্রেস বৈঠক বর্জন করে।৩২ ভাইসরয় লর্ড ইরভিন ব্রিটেনের শ্রমিক দলীয় সরকারকে এ-কথা ঘোষণা করতে সম্মত করান যে, ভারতে ব্রিটিশ নীতির লক্ষ্য হল ডোমিনিয়নের মর্যাদা প্রদান করা। অতঃপর এ-ব্যাপারে গান্ধী-ইরভিন সরাসরি আলোচনার পর ১৯৩১ সালের মার্চে গান্ধী কংগ্রেসের একক প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। মুসলিম প্রতিনিধিগণ বৈঠকে জিন্নাহ্‌র 'চৌদ্দ দফা' দাবি পেশ করেন এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে তাদের নিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি না মানা হলে তারা কেন্দ্রে দায়িত্বপূর্ণ সরকারের সপক্ষে ওয়াদা করতে অস্বীকার করেন। ফলে মুসলিম প্রতিনিধিদের সাথে গান্ধীর আপোষ করা সম্ভব হয়নি।[৩৩]

গোলটেবিল বৈঠকে তেমন কোনো শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি হয়নি; তবে এটুকু সুপারিশ হয় যে, কেন্দ্রে একটি ফেডারেল পদ্ধতির সরকার গঠন করা হবে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে একটি গর্ভনর শাসিত প্রদেশে উন্নীত করা হবে। সাম্প্রদায়িক সমস্যাটি অমীমাংসিত থেকে যায়। পৃথক নির্বাচন এবং বিভিন্ন আইন পরিষদে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে জোরালো আলোচনা হয় কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। গান্ধী চান এ বিষয়গুলো পরে আরেক তারিখে আলোচনা হোক কিন্তু মুসলমান সদস্যরা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দাবি করেন।[৩৪] ব্রিটিশ পক্ষ সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের (Communal Award) ঘোষণা করে অচলাবস্থার নিরসন করে। এই রোয়েদাদের দ্বারা প্রাদেশিক পরিষদসমূহে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিরূপণ করে দেয়া হয়। পৃথক নির্বাচন বহাল রাখা হয়। মুসলিম সংখ্যালঘু অঞ্চলসমূহে মুসলমানদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে ইউরোপীয়দের জন্য বাংলায় ও আসামে, শিখদের জন্য পাঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং হিন্দুদের জন্য সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আসন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। আর্থিক সংকটের পথ নিরসন হওয়া পর্যন্ত সিন্ধুকে পৃথক করার পরিকল্পনা স্থগিত করা হয়।

ভারতের ফেডারেল সরকার গঠনের পরিকল্পনা কিন্তু মুসলিমদের মন থেকে হিন্দু আধিপত্যের আশঙ্কা নির্মূল করেনি— কিছুটা লাঘব করার উপায় বের করেছে মাত্র। একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের আভাস দেয়া গেলেও স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদি পরিসরে ব্রিটিশ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সরকার সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে; তৎকালীন ভারতীয়করণরত সেনাবাহিনী ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং মুসলমানরা বেলুচিস্তান ব্যতীত চারটি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে, যদিও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ মুসলমানদেরকে পাঞ্জাব ও বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিতে ব্যর্থ হয়েছে (পাঞ্জাবে ৫৬.৫ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যার স্থলে তারা পাবে ৪৭.৬ শতাংশ মাত্র)। যা হোক, উভয় প্রদেশে শুধু বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিনিধিত্ব দেয়ার ফলে মুসলমানদেরকে ভালো কাজ করবার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।[৩৫] অবশ্য এই নেতিবাচক ক্ষমতা অনেক মুসলমানকেই সন্তুষ্ট করেনি। আবার এটাও অনেকে মনে করেন যে তৎকালীন পরিবেশে মুসলমানরা ঠিক কী চায় তারা তা জানত না, তবে অধিকাংশ মুসলমান যে কোনো কিছু একজোটে করতে চায়। তারা মনে করে যে, আপামর ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের স্বার্থের মিল হবে না, কিন্তু কংগ্রেস-সমর্থনকারী মুসলমানরা আবার এর সাথে একমত নয়।[৩৬]

শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া

পূর্বে আলোচিত নেহরু রিপোর্ট প্রকাশের পর মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়, কারণ ১৯০৯-এর ভারত শাসন আইন এবং পরবর্তী লক্ষ্ণৌ চুক্তি ও ১৯১৯-এর ভারত শাসন আইনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন তথা সংরক্ষিত আসনের যে ব্যবস্থা রাখা হয় তা এতে অবলুপ্ত করা হয়। লক্ষ্ণৌ চুক্তি ও খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের যৌথ সংগ্রামে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার বন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল তাতে করে মুসলমানরা শুধু তাদের দাবি আদায়ের জন্য পৃথক কোনো সংগঠনের প্রয়োজনের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। যে সব আধা-রাজনৈতিক মুসলিম সংগঠনের তখন জন্ম হয় সেগুলো আদর্শের দিক থেকে প্রায় কংগ্রেসের মতোই। কিন্তু নেহরু রিপোর্টের ফলে মুসলমানরা পুনরায় ভাবতে বাধ্য হয় যে তাদের দাবি-দাওয়ার জন্য সংগঠনের প্রয়োজন। তদুপরি এর সঙ্গে যোগ হয় তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় অচলাবস্থা। কেউ কেউ সমাজতান্ত্রিক পন্থায় মুক্তি দেখতে পান, আবার কেউ কেউ ধর্মীয় স্বকীয়তা বজায় রাখার ওপর জোর দেন। কেউ কেউ মনে করেন ভারতের মুসলমানরা আগে মুসলমান, তারপর ভারতীয়; আবার কেউ কেউ উলটোও ভাবেন। এমতাবস্থায় মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ মঞ্চে আসেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের হতাশাকে কাজে লাগিয়ে তিনি তাঁর দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রকাশ করেন এবং পরিণতিতে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে একাধিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তথা পাকিস্তান প্রস্তাবের জন্ম দেন।

ক. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ও মুসলিম লীগের পুনর্গঠন

ইতিপূর্বে রাজনীতিসচেতন মুসলমান শ্রেণী সর্বস্তরের মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য একটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য নির্ধারণে ব্যর্থ হয়, কারণ এতদিন তারা ওই মোহে ছিলেন যে, এ ধরনের একটি নীতি গ্রহণের জন্য সংখ্যাগুরু

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলমানের সমর্থন প্রয়োজন। ১৯৩৭ সাল পরবর্তী মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর তথা মুসলিম লীগের জনপ্রিয় আবেদনের কারণ বুঝতে হলে নির্বাচনের পূর্ববর্তী কিছু ঘটনা-প্রবাহের ওপর আলোকপাত করা দরকার।

আহরার : ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে বেশ কিছু সংখ্যক কংগ্রেস সমর্থক পাঞ্জাবি মুসলমান চৌধুরী আফজাল হকের (মৃ. ১৯৪২) নেতৃত্বে লাহোরে সমবেত হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তৎকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে ধরনের সামাজিক কর্মসূচী গ্রহণে প্রস্তুত তার চেয়েও প্রগতিশীল একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা, যথা বার্ষিক ৫০০ টাকার কম আয়ের জমি করমুক্ত করা, সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সুদ গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা।[৩৭] এটিকেই আহরার আন্দোলন বলা হয়। এরা রাজনৈতিকভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিয়ে ১৯৩০-এর অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও ভারতের জন্য এরা একটি জাতীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ধর্ম-অনুপ্রাণিত একটি ফেডারেল রাষ্ট্র দাবি করে; মতবাদের কারণে এরা আহমদীয়দের ঘোর বিরোধী এবং পুরোপুরি শরিয়তের প্রবক্তা।[৩৮]

খাকসার : একটি গণতান্ত্রিক অনুভূতিসম্পন্ন দল, যেটি অবশ্য সমন্বিত কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি দ্বারা আত্মপ্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়, তা হল আল্লামা ইনায়েতউল্লাহ্ খান মাশরিকীর (১৮৮৮-১৯৬৩) খাকসার দল। আল্লামা মাশরিকী ছিলেন একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পাঞ্জাবি। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি কৃতিত্বের সাথে পড়াশুনো সম্পন্ন করার পর তিনি ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে (Indian Education Service) যোগদান করেন। ১৯২৬ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত খেলাফত কনফারেন্সে তিনি যোগদান করেন; অতঃপর ইউরোপ গমন করে তিনি হিটলারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। হিটলারের ঝটিকা বাহিনী ও তাঁর 'বেলচা' প্রতীক তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে বলে তিনি দাবি করেন।[৩৯] ১৯৩১ সালে দক্ষ মুসলিম কারিগর ও চাষীদের মধ্যে তিনি খাকসার আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। এর সদস্যগণ উর্দি পরিধান করে, সামরিক কুচকাওয়াজ করে এবং "বেলচা নিয়ে ইসলামের সৈনিক হিসেবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে। সদস্যদের সবাই দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য জানবে এরূপ কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছোট নেতারাও এগুলো সম্পর্কে অবহিত নয়। মাশরেকী নিজে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের অহিংস নীতির প্রতি বিরূপ ছিলেন; কিন্তু কংগ্রেস পুরোপুরি হিন্দু সদস্য নিয়ে গঠিত হওয়াতে তার কোনো আপত্তি নেই। এতদিন পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে উদাসীন নিম্নমধ্যবিত্ত মুসলিমদের মধ্যে খাকসার আন্দোলন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এ পরিবেশকে ১৯৩৭-এর পরবর্তী জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাজে লাগায়। সে সময় জিন্নাহও মুসলিম লীগকে একটি গণ-আন্দোলনে রূপ দিতে সচেষ্ট ছিলেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খোদাই খিদমতগার (আল্লাহ্‌র খাদেম) : মুসলমানদের আরেকটি জনপ্রিয় আন্দোলন, যার প্রতিক্রিয়া মুসলিম সমাজের বেশ বাইরেও অনুভূত হয়েছে, তা হল 'সীমান্ত গান্ধী' খান আবদুর গাফফার খান (১৮৯০-১৯৮৮) পরিচালিত খোদাই খিদমতগার বা লালকুর্তা আন্দোলন। বিংশ শতাব্দীতে এটিই মুসলমানদের একমাত্র সুসংগঠিত দল যা ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেছে।[৪৭] এটি মূলত একটি পাঠান আন্দোলন যা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সীমাবদ্ধ থাকে। ১৯২৯ সালে অহিংসার শপথ নিয়ে একটি জাতীয়তাবাদী ও ব্রিটিশ বিরোধী সংগঠনরূপে এটি আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ সরকার এ আন্দোলন বন্ধ করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দাঙ্গা বেধে যায়, এবং পরিণতিতে অনেক প্রাণহানির বিনিময়ে পেশোয়ার থেকে সাময়িকভাবে ব্রিটিশ সৈন্য প্রত্যাহার করতে হয়। ১৯৩১ সালের আগস্ট মাসে লালকুর্তারা সরকারিভাবে কংগ্রেসের দলভুক্ত হয়। লালকুর্তা আন্দোলন পাঠানদের বল্গাহীন পৌরুষসম্পন্ন একটি আধুনিক রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আবদ্ধ করে সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে ভূসম্পত্তি পুনর্বণ্টন করতে এবং রাজস্ব না দিতে আহ্বান জানায়। এ দলের অন্তর্ভুক্তির ফলে কংগ্রেস নিজেকে একটি খাঁটি জাতীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনরূপে দাবি করার যথার্থতা পায়। কিন্তু এ দাবি নিষ্ফল। লালকুর্তা আন্দোলন জাতীয়তাবাদী শুধু এই পরিধিতে যে এটি ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি চায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা বিরানব্বই জন আর হিন্দুরা সেখানে কার্যত জিম্ম বা আশ্রিত। পাঠান সমাজে তারা নিম্নশ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা ভোগ করে থাকে। হিন্দুরাও সেখানে তাদের অধিকারের সীমা-সরহদ জানে। তাই ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় ভারতের সীমান্ত প্রদেশকে উদাহরণ হিসেবে টানা যায় না।

অপরদিকে ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকার ভারতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব সম্বলিত একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোরের সভাপতিত্বে এপ্রিল মাসে একটি যুক্ত পার্লামেন্টারি কমিটি গঠন করা হয় এবং শ্বেতপত্র বিবেচনা করে ভারতের জন্য একটি নতুন সরকারি কাঠামোর সুপারিশ পেশ করতে বলা হয়। এ কমিটি আঠারো মাস বৈঠক করে এবং ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে এর রিপোর্ট প্রদান করে। সরকার এ রিপোর্টকেই ভারত সরকারের প্রস্তাব হিসেবে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারিতে ইংল্যান্ডের কমন্স সভায় উত্থাপন করে। পার্লামেন্টের প্রথানুযায়ী এ প্রস্তাব পাস হয়, ১৯৩৫ সালের ৪ আগস্ট রাজকীয় সম্মতি নেয় এবং ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে পরিগণিত হয়।

১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহ ও দেশীয় রাজ্য নিয়ে একটি ফেডারেশন গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রদেশে ১৯১৯ সালে প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনের পরিবর্তে দায়িত্বশীল সরকারের ব্যবস্থা রাখা হয়। বিষয়াদি তিনভাগে ভাগ করা হয়, ফেডারেল, প্রাদেশিক ও সংরক্ষিত (Concurrent)। অনুল্লিখিত

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ক্ষমতা (Residuary Powers) গভর্নর জেনারেলের হাতে রাখা হয়। দু'কক্ষবিশিষ্ট ফেডারেল আইনসভার একটির নাম ফেডারেল আইন পরিষদ এবং অপরটির নাম রাষ্ট্রীয় কাউন্সিল রাখা হয়। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণ পরোক্ষ ভোটে ফেডারেল আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করবেন। কাউন্সিলের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভোট নির্বাচিত হবেন। সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু থাকবে এবং সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ অনুযায়ী সম্প্রদায়ের আসন নির্দিষ্ট করা হবে। ফেডারেল আইন পরিষদ সমস্ত আইন প্রণয়ন করবে। কিন্তু গভর্নর জেনারেলের অর্ডিন্যান্স জারি ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দ্বারা আইন পরিষদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়। তিনজন পরামর্শদাতার (Councillor) সহায়তায় গভর্নর জেনারেল বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতি পরিচালনা করবেন। অন্য মন্ত্রীরা তাকে ফেডারেল ও অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা করবেন।

প্রাদেশিক আইন পরিষদ প্রাদেশিক ও সংরক্ষিত বিষয়াদির আইন প্রণয়ন করবে, তবে সে আইন যাতে কেন্দ্রীয় আইনের পরিপন্থী না হয়। ফেডারেল পার্লামেন্টের আইন বিরোধী কোনো বিল বা প্রস্তাব অথবা গভর্নর জেনারেল প্রবর্তিত কোনো অর্ডিন্যান্সের বিরোধী কোনো প্রস্তাব প্রাদেশিক আইনসভায় উত্থাপন করতে হলে গভর্নর জেনারেলের পূর্ব সম্মতির প্রয়োজন হবে। প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকারের ব্যবস্থা করা হয়। একটি মন্ত্রিসভা গভর্নরকে তার কার্যাবলীতে সহায়তা করবে। মন্ত্রীসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য হতে হবে। গভর্নর জেনারেলের ন্যায় প্রাদেশিক গভর্নরকেও কিছু ক্ষমতা দেয়া হয়।

১৯১৯-এর ভারত শাসন আইনের তুলনায় ১৯৩৫-এর আইন অনেকটা প্রাগ্রসর, তবে উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের (ডোমিনিয়নের) মর্যাদা থেকে অনেক দূরে। ফলে কংগ্রেস। ও লীগ উভয়ে এর ফেডারেল অংশ প্রত্যাখ্যান করে। তবে এর প্রাদেশিক অংশ পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করতে রাজি হয়।

কিন্তু ভারতের মুসলমানরা তখনও এ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে যে তারা কি মুসলমান, না ভারতীয়। ১৯৩০-এর গোলটেবিল বৈঠকে মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেছিলেন, শরিয়তের বিধিনিষেধের ব্যাপারে তিনি সর্বদাই একজন মুসলমান আর ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি সর্বদাই একজন ভারতীয় তিনি আরও বলেছিলেন যে, তিনি দুটি বলয়ে বিরাজ করেন—একটি ভারতীয়, অপরটি মুসলিম বিশ্ব এবং উভয়েই অপরিত্যাজ্য।[৪১] তৎকালীন একজন লেখক এ সম্পর্কে বলেন, ব্রিটিশদের প্রস্থানের পর মুসলমানরা কীভাবে দেশ গড়ার কাজে হাত দেবে! তারা যদি গান্ধীর চরকা পরিকল্পনায় আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করে তখন তাদেরকে আখ্যা দেয়া হয় সাম্প্রদায়িক বলে, তারা যদি গান্ধীর চরকা পরিকল্পনায় আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করে তখন তাদেরকে বাদ দেওয়া হয় মাংস ভক্ষণকারী বলে আর তারা যদি অস্পৃশ্যতা দূর করার চেষ্টা করে তখন তারা স্বয়ং গান্ধীর কোপানলে পড়ে।[৪২] যুব মুসলিম

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে আবার সমাজতন্ত্রের প্রতি ঝোক দেখা যায়। কারণ তৎকালীন শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশই ছিল মুসলমান আর কলকারখানার মালিকরা ছিল হিন্দু। মুসলিম সমাজতন্ত্রীদের মতে মুসলিম জনগণ ধর্ম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন একসঙ্গে চায়। মুসলিম বুদ্ধিজীবীর মনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মার্ক্সীয় ধর্মবিরোধী নীতি একে অপরের সঙ্গে সংঘাতে পতিত হয়।[৪৩]

কোনো কোনো মুসলিম যুবশ্রেণী সমাজতন্ত্রকে ভারতের জাতীয়তাবাদের জন্য খুবই সহায়ক মনে করে, কিন্তু হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের কট্টর সাম্প্রদায়িক লোকদের মনে তখন দু'জাতি ভাব ফুটতে আরম্ভ করেছে। মুসলমানরা মনে করে ভবিষ্যতে তারা তাদের নামের জোরে এবং হিন্দুদের চেয়ে অধিক লড়িয়ে হিসেবে তারা সহজেই হিন্দুর ওপর কর্তৃত্ব করতে পারবে। তারা যদিও মনে করে যে মুসলিম ভারত একটি আলাদা জাতি কিন্তু ঘূর্ণাক্ষরেও চিন্তা করে না যে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে দু'জাতি একসঙ্গে থাকতে পারে কিনা। অতএব সাম্প্রদায়িক মীমাংসার পক্ষে গেলেই দুটি বিকল্প সামনে আসে হয়তো শান্তি রক্ষার জন্য একটি তৃতীয় শক্তির প্রয়োজন অথবা মনে করতে হবে ভারত একটি ভয়ানক অচলাবস্থার সম্মুখীন।[৪৪]

মুসলমানদের এই অচলাবস্থার মধ্যে দুটো বক্তব্য ভেসে ওঠে। একটি বক্তব্য স্যার মুহাম্মদ ইকবালের (১৮৭৭-১৯৩৮) এবং অপর বক্তব্য চৌধুরী রহমত আলীর (১৮৯৭- ১৯৫১)। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে স্যার মুহাম্মদ ইকবাল মুসলমানদের একটি আলাদা আবাসভূমির কথা উল্লেখ করেন। তাঁর স্বপ্নের পৃথক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান।[৪৫] মুহাম্মদ ইকবাল শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন। শিয়ালকোট ও লাহোরে পড়াশুনো সমাপ্ত করে তিনি ১৯০৫ সালে ইউরোপ যান। সেখানে তিনি দর্শন ও আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন এবং পরে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯০৮ সালে দেশে ফিরে তিনি লাহোর কলেজে দর্শন শাস্ত্রে অধ্যাপনার কাজ করেন এবং তৎসঙ্গে তিনি তাঁর আইন ব্যবসাও চালিয়ে যান। তিনি দর্শনশাস্ত্র ও সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। শীঘ্রই তিনি একজন দার্শনিক ও কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। রাজনীতির ব্যাপারে তিনি তেমন আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু ভারতের মুসলিম জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে তিনি কিছু বক্তব্য পেশ করেন। ১৯৩১ সালের গোলটেবিল বৈঠকেও তিনি যোগ দেন। পূর্বাপর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তিনি মুসলমানদের আলাদা বাসভূমি বা রাষ্ট্র গঠনের মধ্যে তাদের মুক্তি দেখতে পান।[৪৬]

অপরদিকে ১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্র অধ্যয়নরত পাঞ্জাবের চৌধুরী রহমত আলী মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি মুসলিম রাষ্ট্রের পরিকল্পনা পেশ করেন। Now or Never (এখনই বা কখনোই

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নয়) পুস্তিকায় প্রকাশিত তাঁর পরিকল্পিত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর ও বেলুচিস্তান। এসব প্রদেশের আদ্যাক্ষর নিয়ে তিনি পাকিস্তান নামের উৎপত্তি করেন। তাঁর মতে, এই এলাকার মধ্যেই একটি জাতির আবাসভূমি ছিল। মুসলমানরা একটি জাতি হিসেবে এ এলাকায় বারশো বছরের চেয়েও অধিককাল বাস করে এসেছে। তারা তাদের নিজস্ব ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী। তাঁর মতে, এ এলাকা মূল ভারত (হিন্দুস্তান) ভূখণ্ড থেকে যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত এবং এটি তাই ভারতের অংশ নয়।[৪৭] ১৯৩৭ সালে চৌধুরী রহমত আলীর পরিকল্পনায় বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু ১৯৩৩ সালে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য গঠিত পার্লামেন্টারি বোর্ডের নিকট সাক্ষ্য দিতে গিয়ে মুসলিম রাজনীতিবিদরা পাকিস্তান পরিকল্পনাকে নিছক 'একটি ছাত্রের পরিকল্পনা' এবং 'অবাস্তব' বলে উড়িয়ে দেন। তাঁরা তখনো আশা করেন যে, ভারতের এই শাসনতান্ত্রিক সমস্যার একটি সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান বের হয়ে আসবে, যার দ্বারা ভারতের মুসলমানদের নিরাপত্তা ও সমঅধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। কোনো একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা তারা কখনও চিন্তা করেননি। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, মুসলিম রাজনীতিবিদদের সরল ফেডারেশনের দাবি এবং সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলাদেশে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি-যথা জিন্নাহ্‌র 'চৌদ্দ দফা' শেষ পর্যন্ত সরাসরি পাকিস্তান রাষ্ট্রের দিকে পদক্ষেপ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।[৪৮]

কিন্তু মুসলিম রাজনীতিবিদগণ তখনও একটি ঐক্যবদ্ধ এবং সর্বভারতীয় মঞ্চে আসতে সক্ষম হননি। তবে ১৯৩৫-এর শাসনতন্ত্রে তাদের সামনে যে মুসলিম সাধারণ নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে, এ সম্পর্কেও তারা একেবারে অনবহিত ছিলেন না। পাঞ্জাবের স্যার ফজলী হোসেন (১৮৭৭-১৯৩৬) মনে করেন, সেখানকার ৮৬টি মুসলিম আসন নিয়ে ক্ষমতায় যাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইউনিয়নিস্ট পার্টির মাধ্যমে নির্বাচনে যাওয়া; এটি হবে একটি মিশ্র দল যেখানে হিন্দু ও শিখদের কৃষিস্বার্থ থাকবে এবং একটি কৃষি সংস্কারের কর্মসূচি দেয়া হবে। অপরদিকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় কৃষক-প্রজা সমিতির নেতা এ. কে. ফজলুল হকও একটি সার্বজনিক সমাজসেবামূলক কর্মসূচির প্রবক্তা যা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কৃষককুল দ্বারা সমর্থিত হবে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দুই প্রদেশের দুই প্রসিদ্ধ নেতাই মনে করেন ১৯৩২-এর সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ এবং ১৯৩৫-এর আইন অনুসারে সৃষ্ট শাসনতান্ত্রিক অবস্থায় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের একমাত্র উপায় হচ্ছে আন্তঃসাম্প্রদায়িক কর্মসূচি গ্রহণ করা। এদের কেউই তখনও তাদের প্রদেশের বাইরে মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে মাথা ঘামাননি।[৪৯]

তবে ১৯৩৫-এর আইন অনুযায়ী পরিচালিত প্রথম নির্বাচনে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ মুসলমানদেরকে একটি সর্বভারতীয় মঞ্চের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিকল্প প্রদান করেন। খেলাফত পরবর্তী কংগ্রেস ও মুসলিম দলসমূহ দ্বারা ধাক্কা খেয়ে জিন্নাহ্ ১৯৩১

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালে ইংল্যান্ডে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় রাজনীতিতে তার কোনো ভূমিকাই ছিল না। সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ তখন নির্জীব, এমনকী বাৎসরিক চাঁদাও তাঁর সংগ্রহ হয় না। তখন কেউ কল্পনাও করেনি যে, জিন্নাহ্‌র ন্যায় একজন গোঁয়ার, গর্বিত, সরল যুক্তিবাদী ও আইনশাস্ত্রবিদ ১৯৪০-এর দশকে মোহনীয় মুসলিম নেতায় রূপান্তরিত হবেন এবং মৃতপ্রায় মুসলিম লীগকে একটি গণআন্দোলনে পর্যবসিত করবেন। ষাট বছর বয়সে ১৯৩৫ সালে জিন্নাহ্‌ ভারতে ফিরে আসেন এবং শতধাবিভক্ত মুসলিম রাজনৈতিক শ্রেণীগুলোকে একটি একক মুসলিম রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে সচেষ্ট হন। তিনি মনে করেন, মুসলমানরা একমাত্র সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে তারা ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করতে পারবে। ১৯৩৬ সালে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের সাথে একটি অভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে গণ-উন্নয়নের চেষ্টা করা। তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন যে, মুসলিম রাজনীতি কোনো ধামাধরা বা বিত্তশালীদের রাজনীতি নয়।[৫০]

মুসলিম লীগের আওতায় জিন্নাহ্‌ একটি কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করার চেষ্টা করেন যার দায়িত্ব হবে কংগ্রেসের ন্যায় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচি নিয়ে নির্বাচনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রার্থীদের তালিকা প্রণয়ন করা।[৫১] কংগ্রেসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক স্বরাজের ডাক, বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, গ্রামীণ ঋণের হাত থেকে রেহাই প্রদান, কুটির শিল্পের উন্নতিবিধান এবং সরকারিভাবে মুদ্রা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে করা যাতে উৎপাদনের জোয়ার এসে যায়। কিন্তু জিন্নাহ্‌ এই ক্ষেত্রে অনেক বিলম্বে আগমন করেন, কারণ ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম দলসমূহ বেশির ভাগ কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডকে অগ্রাহ্য করে। এ. কে. ফজলুল হক ও স্যার ফজলী হোসেন, সৈয়দ আবদুল আজিজ (বিহারের ইউনাইটেড পার্টি) এবং যুক্ত প্রদেশের ছাতারীর নবাবের ন্যায় ব্যক্তিবর্গ কেন্দ্রীয় বোর্ডের নিকট তাদের নিজস্ব এলাকার কর্তৃত্বের ভার ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না। তা ছাড়া জিন্নাহ্‌র মতো ব্যক্তিরও তখন তার নিজস্ব এলাকা বোম্বেতে কোনো রাজনৈতিক সমর্থন ছিল না বলে তারা মনে করেন। অধিকন্তু দ্বৈত শাসনের অধীনে স্থানীয় রাজনীতির বিষয়ে তার কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক মুসলিম দেশসমূহ তাদের নিজস্ব পন্থায় কাজ পরিচালনা করে আর জিন্নাহ্‌র মুসলিম লীগ এমনকী মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত সব আসনে প্রার্থী দিতেও সক্ষম হয়নি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান ভ্রাতৃদ্বয় (খান আবদুল গফফার খান ও ডা. খান সাহেব) কংগ্রেসের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং লালকুর্তা আন্দোলনকে কংগ্রেসের সাথে এক প্রকার যুক্তই করে দেন। আহরার দল লীগ থেকে দূরে থাকে কারণ। কাদিয়ানীদেরকে লীগে আসার পথ বন্ধ করা হয়নি। অপরদিকে মাওলানা জাফর আলী ও তাঁর 'ইত্তেহাদ-ই-মিল্লাত' লীগে যোগ দেননি কারণ আহরারদেরকে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়নি।[৫২] ১৯৩৬ সালের দিকে এই ছিল ক্ষত-বিক্ষত মুসলিম লীগের অবস্থা। কংগ্রেস ও কিছু সংখ্যক মুসলিম প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা, একটি কার্যকরী ও সুনিয়ন্ত্রিত নির্বাচন যন্ত্রের অভাব, সর্বোপরি নগণ্য আর্থিক অবস্থা নিয়ে লীগ ১৯৩৭ সালে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং মোটামুটি ভালোই করে।[৫৩]

১৯৩৭-এর নির্বাচনে দেখা যায়, সঠিক বিচারে কংগ্রেস বা সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ কেউই মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে না। আরও প্রকাশ পায় যে, মুসলিম রাজনীতি তখনও প্রাদেশিক পর্যায়ে রয়েছে। কেন্দ্রে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ৪৮২টি আসনের মধ্যে লীগ জয়লাভ করে ১০৯টি আসনে। পাঞ্জাবে লীগ শোচনীয় মার খায়। এতে লীগ সাতটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র দুটি আসন লাভ করে। বাংলায় বরং ভালোই করে; সেখানে লীগ ১৭৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৩১টি জয়লাভ করে। অবশ্য মন্ত্রিসভা গঠন করার পর্যায়ে আসতে পারেনি। যুক্ত প্রদেশে লীগ ৬৬টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৩৫টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২১টি আসন লাভ করে। কিন্তু কংগ্রেসী মুসলমানরা একটি আসনও পায়নি। অনুরূপভাবে বাংলা, সিন্ধু, পাঞ্জাব, আসাম, বোম্বে, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যায় কংগ্রেস একটি মুসলিম আসনও পায়নি। প্রধানত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, বিহার ও মাদ্রাজে কংগ্রেস ২৬টি মুসলিম আসন লাভ করে। প্রদেশে মুসলমানরা তাদের প্রাদেশিক মুসলিম দল দ্বারা নির্বাচিত হতে পছন্দ করে এবং অমুসলিম দলগুলোর মধ্যে অকংগ্রেস দলগুলোর সাথে কোয়ালিশন করে।[৫৪] এ প্রসঙ্গে দুটো বিষয় প্রকাশ পায়, প্রথমত মুসলমানরা অনেক দল ও উপদলে বিভক্ত কিন্তু তারা কংগ্রেসের সাথে যুক্ত নয়, দ্বিতীয়ত বিগত ৪০ বছরে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে কংগ্রেসের দাবি নাকচ হয়ে যায়। অপরদিকে মুসলিম লীগ আসন সংখ্যা তেমন বাড়াতে না পারলেও ভবিষ্যতের জন্য তার বিরাট লাভ হয়। সব মুসলমানকে তার মঞ্চে দাঁড় করাতে না পারলেও বোঝা গেল সব খোয়া যায়নি। এতে উৎসাহিত হয়ে লীগ মাঠে নামে।[৫৫]

একটি সর্বভারতীয় শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেসের অবস্থান প্রকাশ পায় ১৯৩৭-এর নির্বাচনে। ১১৬১টি মিশ্র নির্বাচনী এলাকায় এ-দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৭১৬টি আসন লাভ করে। ব্রিটিশ ভারতের ১১টি প্রদেশের মধ্যে কংগ্রেস ৬টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং তিনটি প্রদেশে বৃহত্তম একক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলমানরা বুঝল হিন্দুরা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তারা আধিপত্য বিস্তার করবে, অপরদিকে মুসলমানরা দুটি বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ অর্থাৎ বাংলা এবং পাঞ্জাবে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না। ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালের আইনে ফেডারেল অংশটি কার্যকরী করলে, যার দ্বারা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ আসন থাকবে, সেখানেও কংগ্রেস আধিপত্য বিস্তারকারী সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে। অতএব ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলমানদের প্রধান ভূমিকা পালন করার ভবিষ্যৎ দেখা গেল একেবারে অন্ধকার।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৯৩৭-এর নির্বাচনে আরও একটি বিষয়ে পরিষ্কার বোঝা গেল যে ভারতে প্রকৃত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে দুটো-একটি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকার এবং অপরটি কংগ্রেস। জিন্নাহ্ প্রমাণ করতে লেগে গেলেন যে, ক্ষমতার তৃতীয় কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মুসলিম লীগ। তার এই প্রতিজ্ঞার কারণ কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলোতে তার অভিজ্ঞতা নয়। ১৯৩৬ সালে তার প্রতিজ্ঞা মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের নিকটও তিনি প্রকাশ করেছেন। ১৯৩৭ সালের অক্টোবরে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে তাঁর ভাষণে তা তিনি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন :

> সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোনো সমঝোতা সম্ভব নয়, কারণ ক্ষমতাধর কোনো হিন্দু নেতার মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মাথাব্যথা বা সত্যিকার আগ্রহ দেখা যায় না। সম্মানজনক সমঝোতা সম্ভব হয় শুধুমাত্র সমান সমান পক্ষের মধ্যে এবং দু'পক্ষ একে অপরকে সম্মান বা ভয় করতে না শিখলে সমঝোতার জন্য কোনো পাকা ভিত্তি পাওয়া যায় না। দুর্বল পক্ষ কর্তৃক শান্তির প্রস্তাবে শুধু দুর্বলতাই প্রকাশ পায় এবং আক্রমণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। রাজনীতি মানে ক্ষমতা-ন্যায়বিচার, সদাচরণ বা শুভেচ্ছার চিৎকারের উপর নির্ভর করা নয়।[৫৬]

মুসলিম লীগের পুনর্গঠনের তাগিদে তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রাথমিক সদস্য পদের ফিস রাখেন দু'আনা মাত্র; আবার এও বাধ্যতামূলক করা হয় যে, লীগের কাউন্সিল সদস্যগণ স্থানীয় জেলা বা তহসীল দ্বারা নির্বাচিত হবেন। মুসলিম লীগকে জিন্নাহ্ কংগ্রেসের ন্যায় একটি গণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চান এবং ইংরেজ ও কংগ্রেসের নিকট প্রমাণ। করতে চান যে, এটিই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।[৫৭]

মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় করতে জিন্নাহ্ যে সাড়া পান তা ব্রিটিশ ও কংগ্রেস উভয়কে বিস্মিত করে। তার লক্ষ্ণৌতে প্রদত্ত ভাষণের কয়েক মাসের মধ্যে ১৭০টি নতুন শাখা খোলা হয় এবং এক লক্ষ নতুন সদস্য নেওয়া হয়। যুক্ত প্রদেশে মুসলিম লীগ মুসলিম জমিদারের শ্রেণীভিত্তিকে কাজে লাগায়। ১৯৩৭-এর নির্বাচনের মাধ্যমে কৃষকদল চরম মার খায় এবং জমিদার শ্রেণীর কংগ্রেস-উৎসাহিত প্রস্তাব পেশ করা হয়। এ প্রস্তাবে জমিদারদের খাজনা অর্ধেকে নেমে আসে; কিন্তু সরকার এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। অপরদিকে ১৯৩৯ সালে এক আইন পাশ হয় যাতে প্রজাস্বত্বের মেয়াদের নিরাপত্তা বিধান করা হয়। সামাজিকভাবেও যুক্ত প্রদেশের মুসলিম অভিজাত শ্রেণী কংগ্রেস বিজয়ে শঙ্কিত হয়। কংগ্রেসের একেবারে শিকড় পর্যায়ের নতুন কর্মীদল মোটেই পাশ্চাত্য ভাবাদর্শক ছিল না। তাদের খদ্দর কাপড়, গান্ধীটুপি এবং আক্রমণাত্মক হিন্দী বক্তৃতা মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে কংগ্রেস মাদ্রাজ, যুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায় মন্ত্রিসভা গঠন করে। অপরদিকে ছোট ছোট সংখ্যালঘু দলের সহায়তায় সে বোম্বে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও মন্ত্রিসভা গঠন করে। ১৯৩৭ সালের জুলাই থেকে ১৯৩৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত কংগ্রেস এ সময়ে শুধু মুসলমানদের অপমান করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আইন পরিষদের কার্যাবলী শুরু করা হয় 'বন্দেমাতরম' সংগীত দিয়ে। এটিকে কংগ্রেস জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করে। এ গানটি একাধারে অনৈসলামিক ও মূর্তি উপাসক এবং তাই মুসলমানদের নিকট অগ্রহণযোগ্য। হিন্দু সাম্প্রদায়িক সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এ এ গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 'আনন্দমঠ'-এ মুসলমানদেরকে অপবিত্র ও বিদেশী বলে চিহ্নিত করা হয়। মুসলমান তথা মুসলিম শাসনকে হেয় প্রতিপন্ন করাই এ উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এক প্রতিবাদলিপি পাঠালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জবাবে বলেন, "জনপ্রিয় সংগীত আদেশ দিয়ে বানানো যায় না, আর এগুলো সফলভাবেও চাপিয়ে দেয়া যায় না; এগুলো জনতার আবেগ থেকে রচিত হয়।"[৫৮] কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলোর মুসলমানদের অভিযোগ সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য মুসলিম লীগ পীরপুরের রাজা মুহাম্মদ মেহদীর সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এ কমিটির প্রদত্ত প্রতিবেদনকে "পীরপুর রিপোর্ট" বলে। পীরপুর রিপোর্টে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রদেশের চান্দওয়ার লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক সেখানকার উর্দু স্কুলসমূহের প্রধান শিক্ষকদের নিকট একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়। এ বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিশ্বকে সত্য ও অহিংসার বাণী প্রদানকারী মহান ব্যক্তিত্ব মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন সরকারিভাবে পালনের জন্য আদেশ দেওয়া হয়। এ বিজ্ঞপ্তিতে আরও আদেশ দেওয়া হয় যে, "মহাত্মা গান্ধীর ছবিকে পুজো করতে হবে এবং তাঁর উচ্চ আদর্শ ছাত্রদের নিকট ব্যাখ্যা করতে হবে।" কংগ্রেসশাসিত স্কুলগুলোতে ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তকগুলো ছিল প্রধানত হিন্দুধর্ম ও দর্শন এবং তার বীরপুরুষদের প্রশংসায় ভরপুর।[৫৯] ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে বাংলার এ. কে. ফজলুল হক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, কংগ্রেস নীতি হল "মুসলমানদের ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করতে হবে, অতএব আযান নিষিদ্ধ করা, মসজিদে নামাযে রত মুসল্লিদের আক্রমণ করা এবং নামাযের সময় মসজিদের সামনে দিয়ে বিকট শব্দের বাদ্য সহকারে বিজয় মিছিলের ওপর জোর দেওয়া।"[৬০] মুসলানদেরকে সামান্য কারণেও দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং এমনকী বিচার বিভাগকেও প্রভাবিত করার চেষ্টা চালানো হয়। চাঁদপুর বিশ্ব নামক বেরারের এক ক্ষুদ্র গ্রামে একটি খুনের মামলায় ১৫০ জন। মুসলিম নরনারী ও ছেলেমেয়েকে একযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং গ্রামের সমস্ত মুসলমানদের উপর পাইকারি হারে শাস্তিমূলক জরিমানা আদায় করা হয়। এ মামলার হাইকোর্টের রায়ে লেখা হয় 'মামলাটিকে একটি পৈশাচিক আনন্দমেলা হিসেবে নেওয়া হয় যেখানে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাক্ষীগণ চোখ ঠারাঠারি করে কে কতজন মুসলমানকে শূলীতে চড়াতে পারে। আমরা দেখতে পাই গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে সাক্ষীগণ প্রত্যেক মোহাম্মদীয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় শুধু এজন্যে যে সে একজন মোহাম্মদীয়।"[৬১]

অন্যান্য কংগ্রেসশাসিত প্রদেশেও জনস্বার্থের নামে রচিত নীতিমালা মুসলিম বিবেককে দংশন করে। ওয়ার্ধা পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বইয়ের বিদ্যার সাথে সাথে শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, বিশেষত চরকায় সুতো কাটার ওপর সমধিক জোর দেওয়া, হিন্দীতে রচিত বই-পুস্তকে হিন্দু বীরপুরুষদের কাহিনী তুলে ধরা, এবং হস্তশিল্পের আয় দিয়ে চলা স্বনির্ভর বিদ্যালয়সমূহকে জাতীয় ভিত্তিতে গান্ধীর আশ্রমসদৃশ করে তোলা মুসলমানদের নিকট মোটেই গ্রহণযোগ্য ছিল না।[৬২] পরিকল্পনাটি যে কমিটি দ্বারা প্রস্তুত করানো হয় তার সভাপতি ছিলেন ড. জাকির হোসেন, আর বিহারে এটি কার্যকরী করা হয় শিক্ষামন্ত্রী ড. সৈয়দ মাহমুদ দ্বারা এবং এভাবে মুসলমানদেরকে হিন্দুভাবাপন্ন করা হচ্ছে—এ অভিযোগটি খণ্ডন করা হয়। আবার স্কুলগুলোর নাম দেওয়া হয় বিদ্যামন্দির। মন্দির বলতে যতই সম্মানিত বাসগৃহ বোঝানো হোক না কেন, সাধারণভাবে মন্দির বলতে হিন্দুদের দেবাতর গৃহকেই বোঝানো হয়। অতি উচ্চশিক্ষিত ও ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু ব্যতীত কোনো হিন্দু মন্দির বলতে সাধারণ বাসগৃহ বুঝবে না।[৬৩]

কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলিম লীগ তাদের সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব দেয়। সায়মন কমিশন এবং গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাবে এ ধরনের সহযোগিতার উল্লেখ রয়েছে। তা ছাড়া, পৃথক নির্বাচনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মন্ত্রিসভায় যাতে উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব থাকে। কিন্তু কংগ্রেস সরকার এ প্রস্তাবের বিরূপ ব্যাখ্যা করে। কংগ্রেস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং উল্লেখ করে যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় এ ধরনের কোনো নিয়ম নেই।[৬৪] ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়নি। মুসলমানদের মুসলিম লীগ থেকে পৃথক করার জন্য কংগ্রেস ব্যাপক হারে গণসংযোগ আরম্ভ করে। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সংস্পর্কে বলা হয়, তারা সাধারণ মুসলমান ভোটারদের বোঝাতে চেষ্টা করে যে ভারতের সমস্ত গরিবের স্বার্থ এক ও অভিন্ন এবং এভাবে তারা তাদের কৃষি সংস্কারের স্বপক্ষে সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। পৃথক নির্বাচনের আলোকে লীগের রাজনীতিকরা একে তাদের আসন থেকে বঞ্চিত করার প্রয়াস হিসেবে গণ্য করে, আর প্রস্তাবটি যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষ তাই মুসলমানরা একে ইসলামের ওপর আঘাত বলে বিবেচনা করে। ফলে মুসলিম রাজনীতিবিদ ও গ্রামের আলেম সমাজ একযোগে কংগ্রেসের এ প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে। সাবেক খেলাফত নেতৃবৃন্দ যথা মাওলানা শওকত আলী এবং মাওলানা হাসরত মোহানী, রাজনীতিবিদ খালেকুজ্জামান ও মাওলানা জামাল মিয়া, মাওলানা আবদুল হামিদ বাদাউনি। (মৃ. ১৯৬৯), মাওলানা সিদ্দিক হাসান

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এবং মওলানা সিবকাত উল্লাহ্-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে দেশব্যাপী সফর করেন এবং কংগ্রেসরাজ-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন।[৬৫]

কংগ্রেস রাজনীতিবিদগণ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মনোরঞ্জনার্থে স্বভাবতই গ্রামাঞ্চলে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং আচার-অনুষ্ঠান ও সভাসমিতিতে হিন্দু শব্দ ব্যবহার করেন। কারণ নেহরু ও গান্ধী মুসলমান সংস্কৃতির প্রতি যে সম্মান পোষণ করেন তা খদ্দর পরিধানকারী একজন সাধারণ কংগ্রেসকর্মীর থাকার কথা নয়। তাই এই হিন্দুয়ানী আচরণ একদিকে হিন্দু ভোটারদেরকে হিন্দু মহাসভার বিপরীতে কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট করে, অপরদিকে লীগ কংগ্রেসের এ হিন্দুয়ানী আচরণ দ্বারা এটিকে মুসলমানদের নিকট একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠানরূপে তুলে ধরে। এভাবে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত মুসলিম লীগ সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোতে একমাত্র মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশ ছাড়াও মুসলিম লীগ মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশ–পাঞ্জাবে এবং বাংলায়ও এ সময়ে বেশ অগ্রগতি লাভ করে। পাঞ্জাব ইউনিয়নিস্ট পার্টির নেতা স্যার ফজলী হোসেন ১৯৩৬ সালে মারা গেলে তার সুযোগ্য পুত্র স্যার সিকান্দার হায়াত খান (১৮৯২-১৯৪২) ১৯৩৭ সালে জিন্নাহ্র সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এর ফলে পাঞ্জাব ইউনিয়নিস্ট পার্টির মুসলিম সদস্যগণ মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং পাঞ্জাব মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এই চুক্তির ফলে তৎকালীন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী স্যার সিকান্দার হায়াত খান মুসলিম লীগের সর্বভারতীয় নীতি মেনে নিতে সম্মত হন। অপরদিকে বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হকও কৃষক-প্রজা পার্টিতে তার অনুসারীদের একই পন্থা অনুসরণ করতে বলেন এবং এভাবে তিনি চল্লিশ জন লীগ সদস্য নিয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। কিন্তু সিন্ধুতে মুসলিম রাজনীতিকগণ চারভাগে বিভক্ত ছিলেন। ফলে স্যার গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লাহ (১৮৭৯-১৯৪৮) এবং আল্লাহ্ বখস (১৮৯৭-১৯৪৩) হিন্দু সদস্যদের সহায়তায় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তাই জিন্নাহ্র শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এদেরকে লীগে আনা সম্ভব হয়নি।[৬৬] প্রায় এ সময়ে আসামের মুখ্যমন্ত্রী সফিউল্লাহ্ মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের দু'বছর অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্ব কংগ্রেস কী করতে পেরেছে তার জন্য নয়, বরং মুসলিম সমালোচনার কশাঘাত শান্ত করার ব্যর্থতার জন্য। ফলে এ সময়কে (১৯৩৭-৩৯) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বীজ বপনের যুগ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।[৬৭] কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অনেক বছর কঠোর সংগ্রাম করেছেন। এত বছরের সংগ্রাম ত্যাগ-তিতিক্ষার পর ক্ষমতার প্রথম স্বাদ পেয়ে তারা স্বভাবতই নতুন দফতরের কিছু কিছু সুযোগ গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছেন। ফলে তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বর্ণভ্রাতাগণকে তাদের আওতাভুক্ত দফতরসমূহে চাকুরি দিয়েছেন, ভাইবেরাদর প্রতিবেশীদেরকে কিছু ঠিকাদারি ইত্যাদি কাজ দিয়েছেন। এক কথায়, তারাও মানুষ বা যেটা আরও খারাপ তা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খ. দ্বিজাতিতত্ত্ব

মুসলিম লীগের চিরন্তন দাবি হচ্ছে তাকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করা, কিন্তু কংগ্রেস সর্বদা এটি অস্বীকার করে এসেছে। লীগ সর্বদা মুসলমানদেরকে তার পতাকাতলে সমবেত হতে আহ্বান জানায়। এ প্রক্রিয়ায় হিন্দু মহাসভাও হিন্দুদেরকে অনুরূপ আহ্বান জানায়। হিন্দু মহাসভা তার আগ্রাসী কার্যকলাপ আরম্ভ করলে মুসলিম লীগের কাজ সহজতর হয়ে যায়। এ সঙ্গে মুসলিম লীগ মুসলমানদের এ দাবিও সম্প্রচার করে যে ভারতের হিন্দু ও মুসলমানরা কখনও একজাতি হতে পারে না।[৭২] হিন্দু মহাসভাও এ দাবির যথার্থতা স্বীকার করে। হিন্দু মহাসভার ১৯৩৭ সালের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি বিনয়ক সাভারকার বলেন, ভারতকে কখনও একটি একক এবং সুসংবদ্ধ জাতি হিসেবে বিবেচনা করা যায় না, বরং তার বিপরীতে এখানে প্রধানত দুটি জাতি বিদ্যমান, একটি হিন্দু এবং অপরটি মুসলমান।[৭৩] তবে সাভারকারের উদ্দেশ্য এ নয় যে, ভারতকে হিন্দু ও মুসলমান এলাকায় বিভক্ত করা হোক। বরং সংখ্যাগুরু হিসেবে হিন্দুদেরকে ভারতের প্রধান জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হোক।

১৯৩৮ সালের অক্টোবরে জিন্নাহ্‌র সভাপতিত্বে সিন্ধুতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক লীগের সভায় দ্বিজাতি ভিত্তিতে ভারতকে বিভক্ত করার প্রস্তাব নেওয়া হয়। প্রস্তাবে বলা হয় :

> এই সিন্ধু মুসলিম লীগ কনফারেন্স একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করে যে, বিশাল ভারতীয় মহাদেশের শান্তির স্বার্থে এবং প্রবহমান সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার স্বার্থে হিন্দু ও মুসলমান এই দু'জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি এবং রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য ভারতকে দুটি ফেডারেশনে বিভক্ত করা হোক, যথা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ফেডারেশন এবং অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ফেডারেশন।[৭৪]

এভাবে জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতিতত্ত্বের সৃষ্টি হয়। হিন্দু ও মুসলমানদেরকে আলাদা জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে জিন্নাহ্ তার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করেন। এক বছরের মধ্যে তিনি সম্মিলিত মুসলিম সম্প্রদায়ের "কায়েদ-ই-আজম" বা মহান নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। প্রখর বাগ্মিতায় সিদ্ধহস্ত অনলবর্ষী বক্তা জিন্নাহ্ বিভিন্ন বক্তৃতায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেন। তার প্রধান বক্তব্য তিনি পেশ করেন এভাবে :

> নতুন প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র চালু হবার পর থেকে এ-কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের অন্য সব প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা এবং নিজেকে একটি নিকৃষ্ট ধরনের ফ্যাসীবাদী ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা।

এভাবে তিনি কংগ্রেস এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা করেন। তার বক্তব্যের দ্বারা গান্ধী, নেহরু, সুভাষ বোস, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃপালনী প্রমুখ কংগ্রেস নেতা তার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তার সঙ্গে পত্রালাপ করেন।[৭৫] উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৩৮ সালের শেষভাগে কংগ্রেসের ত্রিপুরা অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বোসের সভাপতিত্ব নবায়নের প্রশ্নে কংগ্রেসে বিভক্তির সৃষ্টি হয়। গান্ধীর নেতৃত্বে প্রাচীনপন্থীগণ কংগ্রেসের ইতিহাসকার পট্টভী সীতারামায়্যাকে সভাপতি করতে চান এবং বোসকে সর্দার প্যাটেলের পক্ষে সরে দাঁড়াতে বলেন। কিন্তু বোস যুবশ্রেণীর সমর্থনে বেঁকে বসেন। নির্বাচনে বোস জয়লাভ করেন। সুভাষ বোসের সামনে গান্ধীর নেতৃত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়। পরে গান্ধীর নেতৃত্বে প্রাচীনপন্থীগণ অসহযোগিতা করলে বোস পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। শূন্যপদে রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি নির্বাচিত হন।[৭৬] এরই মধ্যে লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের পত্রালাপ চলতে থাকে। কিন্তু কোনো পত্রে লীগের এসব অভিযোগের ভিত্তি কী তা উদঘাটন করেনি, কোনো পক্ষ এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে, পত্রালাপে কোনো ফলোদয় হয়নি। বরং তিক্ততা আরও বেড়েছে। কংগ্রেস সভাপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের প্রধান বিচারপতিকে দিয়ে একটি তদন্ত পরিচালনার প্রস্তাব দিলে জিন্নাহ্ তা প্রত্যাখ্যান করেন এ বলে যে, ব্যাপারটি এখন ভাইসরয়ের বিবেচনায় রয়েছে এবং কংগ্রেসশাসিত যেসব এলাকায় মুসলমানদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে সেসব প্রদেশে যাতে তাদের মধ্যে নিরাপত্তার ভাব ফিরে আসে তিনি তার ব্যবস্থা করবেন।" কিন্তু ভাইসরয় এ ব্যাপারে কিছুই করেননি। শেষ পর্যন্ত জিন্নাহ্ একটি রাজকীয় তদন্ত কমিশন দাবি করেন যাতে সুষ্ঠুভাবে ব্যাপারটি মীমাংসা করা যায়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাও প্রত্যাখ্যান করে।[৭৮]

১৯৩৯ সালের আগস্ট নাগাদ ব্রিটিশের ওপর লীগের আস্থা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। ঐ মাসের ২৮ তারিখে লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক প্রস্তাবে বলা হয়, একদা মুসলমানরা আশা করত যে, ব্রিটিশ সরকার তাদের অবস্থার নিরাপত্তা বিধান করবে, কিন্তু একটি "চিরস্থায়ী বিরূপ সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতার" মুখে সে আশা মরীচিকায় পর্যবসতি হয়েছে। প্রস্তাবে "কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচারের জন্য ভাইসরয়ের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শনে" গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।[৭৯]

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে ভারতের রাজনীতিতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। যুদ্ধ ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভারতের ভাইসরয় জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু এ ঘোষণার পূর্বে তিনি কোনো প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা বা রাজনৈতিক কোনো দলের সঙ্গে আলোচনা করেননি। তড়িঘড়ি 'ভারত প্রতিরক্ষা আইন পাশ করে জনগণের সমস্ত অধিকার হরণ করা হয়। প্রতিবাদে ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাসমূহ পদত্যাগ করে। জিন্নাহ্ এ পদত্যাগকে স্বাগত জানান এবং ঘোষণা করেন যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা যেন পুনরায় ক্ষমতায় না আসে। ২২ ডিসেম্বর তিনি মুক্তি ও শুকরিয়া

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দিবসের ডাক দেন। সমগ্র দেশে লীগ সংগঠনসমূহ এটি পালন করে এবং কংগ্রেসশাসিত প্রদেশে সমধিক উৎসাহের সাথে পালন করে।[৮০]

পরবর্তী পর্যায়ে কংগ্রেস আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হয় অখণ্ড স্বাধীনতায়; আর মুসলিম লীগের আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হয় মুসলমানদের জন্য আলাদা ও স্বাধীন একটি আবাসভূমির দাবিতে।

গ. লাহোর প্রস্তাব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জিন্নাহ্ এবং মুসলিম লীগের মর্যাদা ও দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। ব্রিটিশ সরকার স্বভাবতই যুদ্ধে ভারতীয়দের অবদান আশা করে তবে কংগ্রেসকে এজন্য বেশি কিছু দিতে নারাজ। সামরিক বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে পাঞ্জাব। পাঞ্জাব একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা। সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সে সময় ব্রিটিশদের নিকট কংগ্রেসের রাজনীতিবিদ ও দলীয় কর্মীর চেয়ে মুসলমান সমর্থন অধিক প্রয়োজনীয়। সে সময় ব্রিটিশ দৃষ্টিতে কংগ্রেসের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে একমাত্র মুসলিম লীগ; তাছাড়া সুভাষচন্দ্র বোসের দলীয় প্রভাব তখন বাড়লে কংগ্রেস বরং ব্রিটিশদের সেই বেকায়দা অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে চাইবে। বিশ্বযুদ্ধ মাথায় রেখে ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো (১৮৮৭-১৯৫২) ভারতে ব্রিটিশরাজের পরিসমাপ্তি ঘটাতে তেমন আগ্রহী হবার কথা নয়। ভাইসরয়ের যুদ্ধ ঘোষণার একদিন পর জিন্নাহ্ ভাইসরয়ের সাথে দেখা করে নিজেকে গান্ধীর সমকক্ষ বলে অনুভব করেন, কারণ তারপরই দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রে ফেডারেশন গঠনের সমস্ত প্রক্রিয়া তখন স্থগিত হয়ে যাচ্ছে এবং কিছুদিন পর আসছে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা সমূহের পদত্যাগ। ১ নভেম্বর ১৯৩৯ ভাইসরয় গান্ধী, জিন্নাহ্ ও ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে একযোগে আলোচনা করে অনুভব করেন যে ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব আরও বাড়াবার জন্য ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলকে আরও বড় করতে চাইলে এবং প্রদেশসমূহে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন করতে হলে এ ব্যাপারে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আপোষ হতে হবে। প্রদেশসমূহে ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত বিরাজমান অবস্থা পুনরায় ফিরে আসুক তা জিন্নাহ্ মোটেই চান না।[৮১] ভাইসরয়ের নিকট জিন্নাহ্ এই আশ্বাস দাবি করেন যে, ১৯৩৫ অ্যাক্ট সম্পূর্ণভাবে পুনর্বিবেচনা করা হবে এবং ভারতের দুই প্রধান দল কংগ্রেস ও লীগের সম্মতি ছাড়া ভারতের জন্য কোনো নতুন শাসনতন্ত্র পাশ করা হবে না। এ সময় ব্রিটিশ সরকার অনুভব করে যে কংগ্রেস দাবি অনুযায়ী তখন একটি গণপরিষদ দেয়ার অর্থ হচ্ছে ভারতে একটি প্রলয়ংকরী গৃহযুদ্ধের সূচনা করা।[৮২] সরকার তাই জিন্নাহ্র দাবি পূরণ করতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু কংগ্রেস এতে সম্মত নয়, কারণ সে দেখছে লীগের অবস্থান এমনকী মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা পাঞ্জাব ও বাংলায়ও তেমন সুদৃঢ় নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই পটভূমিতে জিন্নাহ্ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার মুসলমানদের সমস্যা কাজে লাগিয়ে একটি পরিষ্কার রাজনৈতিক লক্ষ্য স্থির করতে পার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জবাব অচিরেই পাওয়া গেল আলাদা রাষ্ট্রের দাবি তথা লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে।

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের যুগে সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী (১৮৩৮-৯৭) বর্তমান মধ্য এশিয়ান আফগানিস্তান এবং উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলো নিয়ে একটি মুসলিম প্রজাতন্ত্র গঠনের চিন্তা করেন। ১৮৯০ সালে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক আবদুল হালিম শরার ভারতকে হিন্দু ও মুসলিম এই দুই প্রদেশে বিভক্ত করে লোক বিনিময়ের কথা বলেন। বিলায়েত আলী যিনি 'কমরেড' পত্রিকায় 'ব্যাম্বুক' ছদ্মনামে লেখেন, হিন্দু ও মুসলমানদের আলাদাভাবে বসবাস করার কথা বলেন। এভাবে অনেকেই ইতিপূর্বে ভারত বিভক্তির চিন্তা করেন।[৮৩] তারপর কবি ইকবাল এবং চৌধুরী রহমত আলী কর্তৃক আলাদা রাষ্ট্রের প্রস্তাব।[৮৪]

১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারিতে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জিন্নাহ্ বলেন, ভারতের শাসনতান্ত্রিক জটিলতা সমাধানের একমাত্র পথ এই স্বীকৃতির মধ্যে যে ভারতে একটি নয় বরং দুটো জাতি বিদ্যমান এবং মুসলমানরা কোনো একতরফা সিদ্ধান্তের নিকট নতিস্বীকার করবে না; তারা নিজেরাই নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।[৮৫]

তিনি ক্রমশ মুসলিম মানসকে তার মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন যার অর্থ হল মুসলমানরা কোনো একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সুখী হতে পারবে না। এই পরিবেশ ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ লাহোরে তার বার্ষিক অধিবেশনে মিলিত হয়। এই যুগান্তকারী অধিবেশনে লক্ষাধিক লীগ প্রতিনিধি ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে যোগদান করেন। সভাপতির ভাষণে জিন্নাহ্ বলেন :

> এটি বোধগম্য নয় যে আমাদের হিন্দুবন্ধুরা হিন্দুধর্ম ও ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ কেন বোঝেন না। প্রকৃত অর্থে এগুলো কোনো ধর্ম নয় বরং প্রকৃত প্রস্তাবে দুটি পৃথক ও পরিষ্কার সামাজিক ব্যবস্থা। হিন্দু ও মুসলমানরা এক জাতীয়তায় মিলিত হওয়া একটি স্বপ্ন মাত্র। এই জাতীয়তার অপব্যাখ্যা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে এবং পরিণামে আমাদের অনেক গোলযোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সময়মতো আমরা আমাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে না পারলে এই অপব্যাখ্যা ভারতের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হিন্দু ও মুসলমানরা দুটো পৃথক সভ্যতার অধিকারী, যে সভ্যতা প্রধানত পরস্পরবিরোধী ভাবধারা ও আদর্শকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে...। যে কোনো সংজ্ঞায় মুসলমানরা একটি জাতি; আমাদের আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের পুরোপুরি উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজন আবাসভূমি, ভূখণ্ড ও একটি রাষ্ট্রের।[৮৬]

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চের ঐ অধিবেশনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হকের ঘোষণার ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবে সরাসরি পাকিস্তানের কথা। উল্লেখ না থাকলেও এটিকেই প্রসিদ্ধ পাকিস্তান প্রস্তাব বলা হয়। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ :

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের সুচিন্তিত মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে যে, কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা নিম্নে বর্ণিত মূলনীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করে রচিত না হলে তা দেশে কার্যকরী হবে না, যেমন ভৌগোলিক সংলগ্ন প্রদেশগুলোর (Units) সীমা নির্ধারণ করে এদেরকে নিয়ে একাধিক অঞ্চল (Regions) গঠন করতে হবে, যাতে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে অবস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোকে গোষ্ঠীবদ্ধ করে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা যায় এবং এই স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর প্রদেশগুলো (Units) স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়।

এই অঞ্চলগুলোর সংখ্যালঘু অধিবাসীদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য এদের সাথে পরামর্শ করে শাসনতন্ত্রে উপযুক্ত কার্যকরী ও বিধিবদ্ধ বিশেষ ব্যবস্থার সংস্থান করা হবে এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু সেখানেও মুসলমানদের ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য এদের সাথে পরামর্শ করে শাসনতন্ত্রে উপযুক্ত কার্যকরী ও বিধিবদ্ধ বিশেষ ব্যবস্থার সংস্থান করতে হবে।[৮৭]

প্রস্তাব সমর্থনকালে চৌধুরী খালিকুজ্জামান সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, ভারত বিভক্ত হয়ে হিন্দু ভারত ও মুসলিম ভারত প্রতিষ্ঠিত হবার পর সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানদের কী হবে তা ভেবে তাদের ভয় পাওয়া উচিত হবে না। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের যা হবে তাদেরও তাই হবে। পর্যবেক্ষকদের ধারণা, মুসলিম সংখ্যালঘু এলাকার মুসলমানদের আশঙ্কা এড়িয়ে জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম পরিচালনার সুবিধার্থে লাহোর প্রস্তাবে পরিষ্কার কোনো রাষ্ট্রীয় সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি।[৮৮] তৎকালীন এটিই মুখে মুখে ফেরে যে মুসলমানরা তাদের আলাদা রাষ্ট্রেই সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

জিন্নাহ্ ও মুসলিম লীগ ভারত বিভক্তিতে শাসনতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান দেখতে পান। হিন্দু নেতৃবৃন্দের বিরোধিতার মুখে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যে মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক উৎকর্ষ সাধন করতে পারবে একটি আলাদা রাষ্ট্রে। হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও হিন্দু সাংবাদিকতা মুসলমানদের আলাদা বাসভূমি প্রস্তাবের নিন্দা করেন এবং মুসলমানদের আলাদা জাতীয়তাকে চ্যালেঞ্জ করেন। একজন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের ভাষায় "কোনো

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্প্রদায়ের সদস্যরা একটি পৃথক সত্তা বজায় রাখতে চাইলে সে সম্প্রদায়কে একটি জাতি বলা যায়।"[৮৯] যা হোক, পরবর্তীকালে ভারত বিভক্তির বিষয়টি ভারতীয় রাজনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

লাহোর প্রস্তাবের দ্বারা গান্ধী মর্মাহত হন। তিনি এটিকে ভারত বিভক্তি প্রস্তাব বলে নিন্দা করেন। তিনি মুসলিম বিবেকের নিকট বিভক্তির মতো এক আত্মহননের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আবেদন জানান। তিনি দাবি করেন যে, "দ্বিজাতিতত্ত্ব" সঠিক নয়। অধিকাংশ মুসলমান ধর্মান্তরিত মুসলমান অথবা তাদের বংশধর। তারা যেহেতু ধর্মান্তরিত, অতএব তারা কোনো আলাদা জাতি হতে পারে না।[৯০] কংগ্রেসের মতে মুসলিম লীগের, পাকিস্তান দাবি একটি উদ্ভট ও কৃত্রিম দাবি। ক্ষমতার মোহ এবং কংগ্রেসের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের মনোবৃত্তি নিয়েই জিন্নাহ্ পাকিস্তান দাবি উত্থাপন করেছেন।[৯১] পুনরায় ১৯৪০ সালের এপ্রিলে 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধী বলেন ভারত বিভক্তির কোনো প্রস্তাবনায় যদিও তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন না এবং যে-কোনো অহিংস পথে তিনি এর বিরোধিতা করবেন, তবুও মুসলমানরা সত্যি যদি এটা চায় তবে অহিংসের একজন প্রবক্তা হিসেবে তিনি জোরপূর্বক এর বিরোধিতা করতে পারেন না।[৯২] হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে এক জাতিভুক্তির নিদর্শনস্বরূপ কংগ্রেস মাওলানা আজাদকে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত এর সভাপতি নির্বাচিত করে। পরবর্তী সাত বছর গান্ধী এবং জিন্নাহ্র মধ্যে এ ব্যাপারে অনেক পত্রালাপ হয়। লীগ ও কংগ্রেস উভয় পক্ষের সমর্থকগণ তাদের স্ব স্ব বক্তব্যের স্বপক্ষে এসব পত্রের উদ্ধৃতি দেন এবং এসবের ওপর বহু গ্রন্থও রচিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির অনেক পূর্বে এভাবে একজাতি ও দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তাদের দ্বারা ভারত একটি বিভক্ত দেশে পরিণত হয়।[৯৩]

অধিকাংশ ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ মনে করেন যে মুসলমানরা তাদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বিভক্তি প্রস্তাবকে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি অতিরিক্ত পণ হিসেবে গ্রহণ করে এবং অতঃপর এমন কথাবার্তা বলে যেন ভারতীয় রাজনীতিতে এটিই একমাত্র সমাধানের পথ। লক্ষ্য করা যায় যে, ভাইসরয় লাহোর প্রস্তাবের তড়িঘড়ি নিন্দা করেননি। ১৯৪০ সালের এপ্রিলে ভারত সচিব বলেন, ইংল্যান্ডের কোনো পার্লামেন্ট বা সরকার ভারতের মুসলমানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেবেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। ৮ আগস্টের ঘোষণায় ভারতের ডোমিনিয়নের মর্যাদার লক্ষ্যে একটি যুদ্ধ উপদেষ্টা কমিটি (War Advisory Council) গঠন ও ভাইসরয়ের নির্বাহী কাউন্সিল সম্প্রসারণের প্রস্তাব দেয়া হয়। ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা দেয় যে ভারতের জাতীয় জীবনের একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী অংশ যে সরকারের ক্ষমতা ও অধিকার স্বীকার করে না সে ধরনের কোনো সরকারের নিকট সে ভারতের দায়িত্ব হস্তান্তরের বিষয়ে বিবেচনা করতে পারে না। এ প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকার প্রকারান্তরে জিন্নাহ্কে আশ্বাস দেয় যে সে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কংগ্রেসের ন্যায় পাকিস্তানের বিরোধিতা করবে না।[১৪] লীগের সম্মতি ছাড়া ভবিষ্যতে কোনো শাসনতন্ত্র তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে না— সরকারের এ জাতীয় আশ্বাসে লীগ আশ্বস্ত হয়। লীগ ব্রিটিশ সরকারের এ ঘোষণার সম্মতি প্রদান করে এবং বলে যে, "ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনের জন্য ভারত বিভক্তিই একমাত্র সমাধান।" অপরদিকে সংখ্যালঘুদেরকে এবম্বিধ নিশ্চয়তা দানে কংগ্রেস অসন্তুষ্ট হয় এবং সরকারের এ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। সরকার তৎক্ষণাৎ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে আটক করে। জিন্নাহ্ ঘোষণা করেন যে, হিন্দু-মুসলমানদের সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হলে তাতে তিনি সম্পৃক্ত হবেন না। ১৯৪১ সালে ভাইসরয় জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিল গঠন করলে জিন্নাহ্ তার লীগ সদস্যদের পদত্যাগ করতে বলেন।

অপরদিকে কংগ্রেসী মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক-ভারতীয়তাবাদ ও অভিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায়ের ভাবধারা—যা তারা সর্বদলীয় কনফারেন্স এবং পরবর্তী দুঃখ-দুর্দশার দিনেও লালন করে এসেছেন তা এখনও তাদের একটি স্বপ্ন হিসেবে বিরাজ করে।[১৫] লাহোর প্রস্তাবের পর পূর্বের ন্যায় এখনও তারা দিল্লিতে একটি সর্বভারতীয় স্বাধীন মুসলিম কনফারেন্স গঠন করেন। সিন্ধুতে কংগ্রেস সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন খান বাহাদুর আল্লাহ বখসকে এর সভাপতি করা হয়। লীগের প্রস্তাবিত ভারত বিভক্তিকে কনফারেন্স প্রত্যাখ্যান করে এবং ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী বলে লীগের দাবিকেও খণ্ডন করে। কিন্তু পূর্বের ন্যায় এবারও কনফারেন্স ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর নেতৃত্বে জামিয়াতুল-উলামা-ই-হিন্দ লাহোর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্র হবে এ মতবাদের তিনি সমালোচনা করেন। তার মতে, এর উদ্যোক্তারা কেউ শরিয়ত মানে না, তাহলে এদের দ্বারা কিভাবে ইসলাম কায়েম হবে।[১৬]

তথ্যসূত্র

১. ষষ্ঠ অধ্যায়
২. আই.এইচ. কোরেশী কর্তৃক The Cause of War of Independence গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ.১৯৭-৯৮
৩. ঐ, পৃ.১৯৭
৪. রাজেন্দ্র প্রসাদ, India Divided রাম গোপাল কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ.-১৬০
৫. কোরেশী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮
৬. হোসাইনুর রহমান, A Hindu-Muslim Relations in Bengal, পৃ.৪৮
৭. এই তবলীগ বর্তমানে ভারতের নিযামুদ্দীন আউলিয়া থেকে পরিচালিত বিশ্ব তবলীগ জামাত থেকে ভিন্ন। বর্তমানে কার্যরত তবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দিল্লির মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহঃ) আর উনিশ শত বিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত তবলীগের প্রতিষ্ঠাতা ছিল জমিয়তুল উলামা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৮. হোসাইনুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯

৯. রাম গোপাল, AIndian Muslims : A Political Hostory, পৃ.১৬৯

১০. রাম গোপাল, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৯-১৭০

১১. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৯-১৭০

১২. জি. ডব্লিউ চৌধুরী, "The Nehru Report", প্রবন্ধ "A History of the Freedom Movement", Vol.-III, Part, পৃ.২৭৭-এ প্রকাশিত।

১৩. জি. ডব্লিউ, চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৯

১৪. জি. ডব্লিউ চৌধুরী, প্রাগুক্ত; পৃ.২৮৩

১৫. রাম গোপাল, প্রাগুক্ত, পৃ.২০১

১৬. জি. ডব্লিউ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৪

১৭. ঐ

১৮. জি. ডব্লিউ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৫

১৯. জি. ডব্লিউ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ,২৮৭

২০. কপল্যান্ড, The Constitutional Problem in India, পৃ.৯৪

২১. জি. ডব্লিউ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৩

২২. জি. ডব্লিউ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯১

২৩. কোরেশী, প্রাগুক্ত, পৃ.২০১

২৪. কোরেশী, প্রাগুক্ত, পৃ.২০১

২৫. জি. ডব্লিউ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৮

২৬. ১৯১৯ সালের মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার

২৭. জি, ডব্লিউ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৯, ৩০০

২৮. কোরেশী, প্রাগুক্ত, পৃ.২০২

২৯. পূর্বে দ্রষ্টব্য, সপ্তম অধ্যায়

৩০. কে, কে, আজীজ, Britain and Muslim India, পৃ.১১৮

৩১. ঐ, পৃ.১১৯

৩২. পি. হার্ডি, The Muslims of British India, পৃ.২১৪

৩৩. পি, হার্ডি, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৪

৩৪. কোরেশী, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৩

৩৫. পি. হার্ডি, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৫

৩৬. পি. হার্ডি, প্রাগুক্ত, পৃ,২১৫

৩৭. তোফায়েল আহমদ মাঙ্গালোরী, মুসলমানকা রওশন মুস্তাকবিল, পৃ. ৫৪৮। পি. হার্ডি কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃ.২১৬

৩৮. পি, হার্ডি, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৬

৩৯. জে. এম, এস, ব্যালজন Modern Muslim Koran Interpretation, (১৮৮০-১৯৬০), পি. হার্ডি কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত পৃ.২১৬

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৪০. পি. হার্ডি, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৭

৪১. আফজল ইকবাল (সম্পা). Selected Writings and Speeches of Mohammed Ali পৃ.৪৬৫। পি. হার্ডি কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত. পৃ.২১৮

৪২. হালিদা এদিব, Inside India, পৃ.৩৪১

৪৩. হালিদা এদিব, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৩

৪৪. ঐ, পৃ.৩৪৮

৪৫. পি. হার্ডি, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৯

৪৬. কোরেশী, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৪

৪৭. হালিদা এদিব, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫২

৪৮. পি. হার্ডি, প্রাগুক্ত, পৃ.২২১

৪৯. ঐ, পৃ.২২৩

৫০. হালিদা এদিব, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬০

৫১. পি. হার্ডি, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪

৫২. শরীফ আল মুজাহিদ, "Re-emergence of All India Muslim League" : A History of the Freedom Movement, Vol. III. Part- II গ্রন্থে প্রকাশিত, পৃ.৩১৪

৫৩. ঐ, পৃ.৩১৫

৫৪. পি, হার্ডি, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪-২২৫

৫৫. শরীফ আল মুজাহিদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৫

৫৬. এম. এ. জিন্নাহ্ বক্তৃতামালা, পি. হার্ডি কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ.২৬৬

৫৭. পি. হার্ডি, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৬

৫৮. কোরেশী সম্পাদিত প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ.২১০

৫৯. কোরেশী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ.২১১

৬০. এ. কে. ফজলুল হক, প্রেস বিজ্ঞপ্তি ডিসেম্বর, ১৯৩৯, রাম গোপাল কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত. পৃ.২৬০

৬১. কোরেশী সম্পাদিত প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ.২১১

৬২. পি. হার্ডি, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৭

৬৩. রাম গোপাল, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬১

৬৪. কোরেশী সম্পাদিত প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ.২০৯

৬৫. পি. হার্ডি, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৮

৬৬. পি. হার্ডি, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৯

৬৭. স্ট্যানলে উলপার্ট, A New History of India, পৃ.৩২৪-২৫

৬৮. ঐ

৬৯. ঐ, পৃ.৩২৫

৭০. মাওলানা আবুল কলাম আজাদ, India Wins Freedom. পৃ.২২

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৭১. লর্ড জেটল্যান্ড, Essayez পি. হার্ডি কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ.২২৯
৭২. পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃ.১০৯
৭৩. রাম গোপাল, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৪
৭৪. রাম গোপাল, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৫
৭৫. রাম গোপাল, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৫
৭৬. স্ট্যানিল উপার্ট, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৭-২৮
৭৭. রাম গোপাল, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৫-৬৬
৭৮. ঐ
৭৯. ঐ
৮০. রাম গোপাল, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৭
৮১. পি. হার্ডি, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩০
৮২. লর্ড জেটল্যান্ড, Essayez পি. হার্ডি কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ.২৩০
৮৩. কোরেশী, প্রাগুক্ত, পৃ.২১২
৮৪. পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃ.২১৬
৮৫. রাম গোপাল, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৮
৮৬. রাম গোপাল, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৮-৬৯
৮৭. এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ.২৬৭
৮৮. পি, হার্ডি, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩২
৮৯. কোরেশী কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ.২১৪
৯০. স্ট্যানলি উলপার্ট, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩১
৯১. লিওনাদ মোজলে, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ অধ্যায় (বঙ্গানুবাদ)। অনুবাদ : মোয়াজ্জম হোসেন, পৃ.৭
৯২. সচীন সেন, The Birth of Pakistan, পৃ.১২১। পি, হার্ডি কর্তৃক প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ.২৩৩
৯৩. স্ট্যানলি উলপার্ট, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩১
৯৪. রাম গোপাল, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭১
৯৫. রাম গোপাল, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭১
৯৬. রাম গোপাল, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭১

"ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন" থেকে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, অন্তবর্তী সরকার এবং কায়েদ-ই-আযম : একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণা

আবুল হাশিম

অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক

সাধারণ নির্বাচন

১৯৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর 'সংগ্রাম হোক শুরু' (Let us go to war) নামে আমি একটি প্রচারপত্র ছাপিয়েছিলাম। এই প্রচারপত্র আসাম এবং বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের পথনির্দেশক হয়েছিল। জিন্নাহ্ ঘোষণা করেন ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনকে পাকিস্তানের উপর ভারতের মুসলমানদের গণভোটস্বরূপ গ্রহণ করা হবে। সাধারণ নির্বাচনের জন্য তিনি দেশের কাছে কোনো অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক ব্যবস্থা তুলে ধরেননি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে মেজর এটলীর লেবার গভর্নমেন্ট এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেছিল। সুতরাং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ১৯৪৫ সালের ১ আগস্টের সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আমরা দাবি করেছিলাম নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারতের দশ কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং ১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের গৃহীত প্রস্তাব ভারতের মুসলমানদের মতামতেরই প্রতিনিধিত্ব করেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিরা এ-কথা কখনও সুস্পষ্টভাবে মেনে নিতে পারেনি। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি আমাদের এ দাবির তীব্র বিরোধিতা করে। তারা দাবি করল, মুসলিম লীগ ছাড়াও ভারতের মুসলমানদের আরও অনেক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে; যেমন—আহরার, খাকসার, জমিয়াতুল ওলামা। পাকিস্তান পরিকল্পনা (Scheme) কেবলমাত্র জিন্নাহ্ এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটিতে তার জনকয়েক বন্ধুবান্ধবদেরই মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। গান্ধী তাঁর এক চিঠিতে জিন্নাহ্কে এ বিষয়ে অনেক কিছু বলেছিলেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৯৪০-এ লাহোর প্রস্তাবে ভারতের শুধুমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির জন্যই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ছিল না। এক অখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্রের এবং সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে কোনো দেশ বা জাতিকে বিভক্ত করার চিন্তাও লাহোর প্রস্তাবে করা হয়নি। লাহোর প্রস্তাব বাংলাকে অথবা বাঙালি জাতিকে, পাঞ্জাবকে অথবা পাঞ্জাবিদের বিভক্ত করার কথা চিন্তা করেনি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে রাজা গোপাল আচারীর মাধ্যমে ভারত বিভক্তির বিষয়টি যাচাই করার জন্য এক প্রস্তাব করে। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ রাজা গোপাল আচারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং ক্রিপ্‌স মিশনও বিফল হয়। দুর্ভাগ্যবশত কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েই শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের রোয়েদাদ মেনে নেয়, যেটা প্রকৃতপক্ষে রাজা গোপাল আচারীর প্রস্তাবে যা ছিল তাই। সিমলা আলোচনা বিফল হওয়ার পর কংগ্রেস ভারতীয় রাজনীতির কঠিন বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নিজেদের জন্য অবাস্তবভাবে সমগ্র ভারতের নেতৃত্বের দাবি করল।

ব্যালট বাক্স একমাত্র মাধ্যম যার দ্বারা নির্ভুলভাবে জনমত যাচাই করা সম্ভব। অতঃপর মুসলিম লীগ সরল এবং স্পষ্টবাদী মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করল যে, তারা পাকিস্তানের উপর এবং ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার উপর গণভোট হিসাবে সাধারণ নির্বাচনকে গ্রহণ করবে। আমি এক প্রেস বিবৃতিতে মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ ও কর্মীদের নিজেদের একতা বজায় রাখা এবং সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়া অবধি ন্যায্য অথবা অন্য সমস্ত আভ্যন্তরীণ মনোমালিন্য আদর্শগত অথবা ব্যক্তিগত, স্থগিত রাখার জন্য আবেদন জানালাম। নিজেদের দলের সম্ভাব্য সমস্ত বিভেদের আশঙ্কাকে পরিহার করার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটি ১৯৪৫ সালের ২৭ আগস্ট কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পূর্ব অবধি ইউনিয়ন, মহকুমা, জেলা এবং প্রাদেশিক লীগের পুনর্গঠনের জন্য সমস্ত নির্বাচন স্থগিত রাখার ব্যাপারে এক প্রস্তাব অনুমোদন করল।

জিন্নাহ্ মুসলিম ভারতের অনুভূতির প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করেন যে আমাদের পাকিস্তান আন্দোলন ভারতের কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয় বরং ভারতের ব্রিটিশ শাসনকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে পরিচালিত। সিমলা আলোচনা বিফল হওয়ার পরই তিনি ভাইসরয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যান্য প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে লীগের সঙ্গে নতুন উদ্যমে বোঝাপড়া করার জন্য কংগ্রেসের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু কংগ্রেস ভারতের গ্রীষ্মাকাশের রাজধানী (সিমলা) থেকে লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করল।

প্রচারপত্র 'সংগ্রাম হোক শুরু'-তে আমি মন্তব্য করেছিলাম স্বাধীন ভারত একটি দেশ নয়, স্বাধীন ভারত কখনোই একজাতি নয়। অতীতে মোগল এবং মৌর্য শাসনে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভারত অখণ্ড ছিল এবং বর্তমান গ্রেট ব্রিটেনের শাসনে রয়েছে অখণ্ড। স্বাধীন ভারতকেও অবশ্যই হতে হবে আল্লাহ তায়ালা যেমনভাবে তাকে গড়েছেন একটি উপমহাদেশ হিসাবে– যেখানে প্রতিটি বসবাসকারী জাতি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে। বোম্বাইয়ের পুঁজিপতিদের প্রতি কংগ্রেসের যতই দুর্বলতা থাকুক এবং অখণ্ড ভারতের দোহাই দিয়ে সমগ্র ভারতকে শোষণ করার সুযোগ প্রদান করে তাদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার যত ইচ্ছাই পোষণ করুক, ভারতের প্রতিটি মুসলমান ভারতে যে কোনো গোষ্ঠী, দল অথবা প্রতিষ্ঠানের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেসের সকল উদ্যোগকে প্রতিহত করবে। পাকিস্তানের অর্থ হিন্দু, মুসলমান। একইভাবে সকলের জন্য স্বাধীনতা। আমি আরও বলেছিলাম যে, কংগ্রেসের উপলব্ধি করা উচিত যে আমরা মুসলমানরা যখন মুক্তি ও স্বাধীনতার কথা বলি তখন সত্যি অর্থেই সেটা বলে থাকি। ভারতের মুসলমানরা ব্রিটিশ অথবা ভারতীয় যেটাই হোক সকল প্রকাল আধিপত্য ও শোষণের বিরোধী।

জিন্নাহ্ ১৯৪৪ সালের ৫ অক্টোবর ঘোষণা করেন, "পাকিস্তান সরকার ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে পাকিস্তানের জনগণের প্রধান অংশের মতামত নিয়ে পরিচালিত হবে (will have the sanction)।" ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল কংগ্রেসের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা অথবা ভারতের কোনো জনগণ বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে আমরা খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলাম না। আমাদের সংগ্রাম ছিল সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষামূলক। পার্লামেন্টারি বোর্ড সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থী মনোনয়নের পূর্বে প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্রে জনমত যাচাইয়ের কথা স্থির করল।

প্রাদেশিক মুসমিল লীগের সভাপতি এবং পদাধিকার বলে পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য। মৌলানা আকরাম খাঁর পক্ষে বার্ধক্যজনিত কারণে প্রদেশব্যাপী দীর্ঘ ও পরিশ্রমসাধ্য সফর করে বেড়ানো সম্ভব ছিল না। আমরা পার্লামেন্টারি বোর্ডের অবশিষ্ট আটজন সদস্য দুজন। করে চারটি দলে বিভক্ত হলাম এবং সফরসূচি তৈরি করে প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্র সফর করলাম। স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন ও আমি একই দলে ছিলাম এবং আমরা একসঙ্গে সফর করতাম।

ম্যাকডোনাল্ড রোয়েদাদ অনুসারে বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া এবং মেদিনীপুর জেলার সমন্বয়ে গঠিত বর্ধমান বিভাগের মুসলিম সংখ্যালঘু জেলাগুলির প্রতিটি জেলার মুসলমানদের জন্য একটি করে আসন সংরক্ষিত ছিল। সুতরাং সমগ্র বর্ধমান জেলার ষোলোটি থানা ও ৬টি মিউনিসিপ্যাল এলাকা ছিল আমার নির্বাচন কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। নুরুল আমিন ও রংপুরের আহমদ হোসেন জনমত যাচাইয়ের জন্য বর্ধমান সফর করলেন। বর্ধমানে তাদের সংবর্ধনা ও থাকার সুবন্দোবস্ত করে যেদিন তাদের বর্ধমান আসার কথা সেদিন আমি আমার গ্রামের বাড়িতে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মৌলানা আকরাম খাঁর প্ররোচনায় বর্ধমানের অ্যাডভোকেট সৈয়দ আবদুল গণি বর্ধমান জেলা থেকে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসাবে তাকে মনোনয়নের জন্য পার্লামেন্টারি বোর্ডের কাছে দরখাস্ত করলেন। মৌলানা আকরাম খাঁ, সৈয়দ আবদুল গণিকে আশ্বাস দিলে যে তাঁদের চারজন তাকে সমর্থন করবেন এবং কোনো রকমে আমাদের দলের পাঁচজনের মধ্যে থেকে একটি ভোট তিনি সংগ্রহ করতে পারবেন এবং এভাবে আমার পতন ঘটাতে সক্ষম হবেন। সৈয়দ আবদুল গণি মৌলানার আশ্বাসে বিশ্বাস করলেন। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষকে দিশেহারা করে; যেমনটি হয়েছিল সৈয়দ আবদুল গণির ক্ষেত্রে। তিনি এ সত্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন যে, তখন আমি মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং পার্লামেন্টারি বোর্ডে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রয়েছে। নূরুল আমিন ও আহমদ হোসেনের কাছে বারোজনের অধিক সমর্থক উপস্থিত করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং এর সুস্পষ্ট ফল ফলেছিল।

একশো উনিশটি নির্বাচন কেন্দ্র সফর শেষ করতে আমাদের কয়েক সপ্তাহ লেগেছিল। আইনসভায় মুসলমানদের জন্য একশো উনিশটি আসন সংরক্ষিত ছিল। জনমত যাচাইয়ের কাজ শেষ করার পর আমাদের প্রার্থী নির্বাচনের জন্য আমরা সোহরাওয়ার্দীর কলকাতার বাসভবনে ৪০নং থিয়েটার রোডে মিলিত হলাম। মুসলিম লীগের একশো উনিশটি মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রস্তুত এবং ছাপানোর কাজ শেষ করার আগে আমাদের তেত্রিশবার বৈঠক করতে হয়েছিল। নির্বাচন তহবিলে টাকা সংগ্রহ ও পরিচালনা করতেন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি সোহরাওয়ার্দী।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মুখপাত্র হিসাবে একটি শক্তিশালী বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রয়োজনীয়তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অর্থনৈতিক কমিটি পত্রিকাটির জন্য প্রাথমিক চাঁদাবাবদ পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুরী প্রদান করেন। সে সময় 'দৈনিক আযাদ' ছিল একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র, যেটি মুসলিম লীগকে সমর্থন করত ও মুসলিম লীগের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল অংশের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করত। মুসলিম লীগ সরকারের নেতা খাজা নাজিমুদ্দীন সর্বশক্তি দিয়ে 'দৈনিক আযাদে'র পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। যাই হোক, মুসলিম লীগের প্রস্তাবিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মিল্লাত' ছাপানোর সবরকম ব্যবস্থা শেষ হল।

পত্রিকাটির জন্য শুভেচ্ছা কামনা এবং বাণী প্রদান করার জন্য জিন্নাহ্‌কে অনুরোধ জানিয়ে আমি একটি চিঠি লিখেছিলাম। উত্তরে জিন্নাহ্ উপদেশ দিয়েছিলেন আমি যেন মুসলিম লীগের নামে পত্রিকাটি না ছাপিয়ে নিজের প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি ছাপানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি। তিনি বলেন 'ডন' পুরোপুরিভাবে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পত্রিকা, কিন্তু সেটির মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনা ছিল লিমিটেড কোম্পানির।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথমদিকে আমি ছিলাম 'মিল্লাত'-এর সম্পাদক। কিন্তু কাজী মুহাম্মদ ইদ্‌রিস নামে একজন যুবক সাংবাদিককে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। কাজী ইদ্‌রিস একজন দক্ষ সাংবাদিক ছিলেন। তাকে আমি "দৈনিক আযাদ" থেকে গ্রহণ করেছিলাম, যেখানে তিনি অন্যতম সহ-সম্পাদক হিসাবে খুবই অল্প বেতন পেতেন। "মিল্লাত" প্রথম প্রকাশিত হল ১৯৪৫ সালের ১৬ নভেম্বর এবং অল্প দিনের মধ্যেই বাংলা ও আসামে পত্রিকাটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। 'মিল্লাত'-এর গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলিতে আমাদের পঁয়ত্রিশ হাজার কপি সপ্তাহে ছাপাতে হত।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ বাংলায় সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্লামেন্টারি বোর্ডকে প্রাথমিক চাঁদাবাবদ তিন লক্ষ টাকা প্রদান করে। বাংলার নির্বাচন তদারকির জন্য জিন্নাহ্ একটি কমিটি গঠন করেন। এম. এ. ইস্পাহানী, খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেমুদ্দীন এবং এ. ডব্লিউ. রাজ্জাক এই তিনজন ছিলেন কমিটির সদস্য।

১৯৪৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পার্লামেন্টারি বোর্ড বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে মুসলিম লীগের মনোনয়নের কাজ শেষ করল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির জন্য কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডের প্রতিনিধি হিসাবে খালিকুজ্জামান চৌধুরী এবং হাসান ইমাম ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতা পৌছলেন। নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান কলকাতায় আসতে পারেননি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড মুসলিম লীগের প্রার্থী নির্বাচনের কাজ শেষ করেছিল কিন্তু তাদের সিদ্ধান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করেনি। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড কর্তৃক বঙ্গীয় প্রাদেশিক বোর্ডের নির্বাচনের বিরুদ্ধে শুনানির ব্যবস্থা নেওয়ার পর মুসলিম লীগের অনুমোদিত তালিকা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডের পক্ষে বঙ্গীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডের দুই বিরোধী (contending) দলের নেতা খাজা নাজিমুদ্দীন এবং সোহরাওয়ার্দী প্রতিনিধিত্ব করতেন।

প্রাদেশিক পার্লামেন্টারি বোর্ড ঢাকার আতাউর রহমান খান, মিসেস সুলতানউদ্দীন আহমেদ এবং আবদুল ওয়াসেককে মনোনীত করেনি। ৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) আতাউর রহমান খান, যিনি বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় লীগের নেতা, পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর সুলতানউদ্দীন আহমদ এবং বাংলার সুপরিচিত মুসলিম ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেফ পার্লামেন্টারি বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করেন। এই ঘটনার খবর টেলিফোন মারফৎ কামরুদ্দীন আহমদ আমাকে জানান। মিসেস সুলতানউদ্দীনের থেকে মিসেস আনোয়ারা খাতুনকে অগ্রাধিকার দিয়ে মনোনীত করা হল। এখন মনে করি আমরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। মিসেস আনোয়ারা খাতুনের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শিক্ষাগত যোগ্যতায় আমি প্রভাবান্বিত হয়ে তাকে সমর্থন করেছিলাম।

কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের শুনানি গ্রহণ করেন। –আবুল কাশেম (হুগলি অঞ্চল), মোল্লা মহাম্মদ আবদুল হালিম (নদিয়া পশ্চিম), সৈয়দ কাজেম আলী মির্জা (মুর্শিদাবাদ দ.প.), কে. বি. নূরুজ্জামান (ভোলা উ.), মৌলানা মহাম্মদ কাশেম (বাকেরগঞ্জ প.), খন্দকার শামসুদ্দিন (গোপালগঞ্জ), কে. বি. সারফুদ্দীন আহমদ (ময়মনসিংহ উ.), এ. কে. আফতাবউদ্দীন তালুকদার (জামালপুর প.), আলী আহমদ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া উ.), মৌলভী রুকুনুদ্দীন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া উ.), ইলিয়াস আলী মোল্লা (২৪পরগণা কেন্দ্রীয়), আবদুর রশিদ মাহমুদ (সিরাজগঞ্জ দ.), এস. এ. সেলিম (নারায়ণগঞ্জ উ.), কে. নুরুদ্দীন (কলকাতা দ.), কে, এস. ওসমান (নারায়ণগঞ্জ দ.), মহাম্মদ ওসমান (কলকাতা উ.), আবদুস সোবহান (পিরোজপুর উ.) এবং মাদার বক্স (রাজশাহী কেন্দ্রীয়)।

মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা ছাপানোর পর নির্বাচনী সংগ্রাম শুরু হল। নেতৃবর্গ ও কর্মীবৃন্দ সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে দশজন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন। এঁরা হলেন : খান বাহাদুর ফজলুল কাদের চৌধুরী (চট্টগ্রাম), মিসেস আনোয়ারা খাতুন (ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ), হাফিজুদ্দীন চৌধুরী (ঠাকুরগাঁ), খান বাহাদুর এ. এম. এ. হামিদ (পাবনা), মৌলভী আবুল কালাম শামসুদ্দীন (ময়মনসিংহ), খান বাহাদুর মোদসসর হোসেন (বীরভূম), আবুল কাশেম (হুগলি), মিসেস হাককাম (কলকাতা), খাজা নূরুদ্দীন (কলকাতা দ.) এবং এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী (২৪ পরগণা মিউনিসিপ্যাল)।

আবুল মনসুর আহমদ বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্লামেন্টারি বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন। আযাদের তদানীন্তন সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমদের নির্বাচনের বিরুদ্ধে তার শুনানিতে অগ্রাধিকার দাবি করেন এবং শামসুদ্দীনের শুনানি গ্রহণ করা হয়।

সাধারণ নির্বাচনের দিন ধার্য করা হল ১৯ মার্চ থেকে ২২ মার্চ (১৯৪৬)। বাংলার কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে মুসলিম লীগের বামপন্থীদের সম্পর্ক ছিল খুবই ভালো। বাংলার কম্যুনিস্ট পার্টির নেতাদের আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম, যদি মুসলমানদের নির্বাচন কেন্দ্রে মুসলিম লীগের প্রার্থীদের সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তাহলে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে না। শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্রে আমরা যে কম্যুনিস্ট পার্টিকে সমর্থন জানাব, সে বিষয়ে আশ্বাস দিলাম। কম্যুনিস্ট পার্টির কিছু পকেট রয়েছে এবং সংরক্ষিত কম্যুনিস্ট পকেটে তাদের প্রার্থীর জয়লাভ সুনিশ্চিত। নোয়াখালী ও ময়মনসিংহে তাঁরা তাঁদের কিছু প্রার্থী দাঁড় করালেন। কম্যুনিস্ট পার্টির মনোনীত প্রার্থী সকলেই পরাজিত হলেন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এবং তাদের জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত হল। আমরা আমাদের কথামতো শ্রমিক কেন্দ্রগুলিতে কম্যুনিস্ট পার্টিকে সমর্থন জানিয়েছিলাম।

ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও নির্বাচন কেন্দ্রে মুসলিম লীগের প্রার্থী ছিলেন গিয়াসুদ্দীন পাঠান। ওই অঞ্চলের ধর্মীয় নেতা ছিলেন মৌলানা শামসুল হুদা, সেখানে সকলে তাকে বিশেষ সম্মান করতেন। তিনি নিজে স্থানীয়ভাবে একটি দল গড়েছিলেন যার নাম ছিল 'ইমারত পার্টি' এবং তিনি ছিলেন সেই দলের আমীর।

আবুল মনসুর আহমদ কারমাইকেল হোস্টেল, জিন্নাহ্ হল, টেলর হোস্টেল, ইলিয়ট হোস্টেল ও ইসলামিয়া কলেজ থেকে প্রায় তিনশত ছাত্র মুসলিম লীগের পক্ষে কাজ করার জন্য সংগ্রহ করেন। তাদের যশোর, বরিশাল এবং বাগেরহাট পাঠানো হল, যেখানে নওশের আলী ও ফজলুল হক মুসলিম লীগ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আইনসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

গফরগাঁও-এ ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগ এক সম্মেলনের আয়োজন করে। নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান, স্যার নাযিমুদ্দীন, এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী এবং আমি সভাটিতে যোগদান করেছিলাম।

নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান গফরগাঁও-এ এসেছিলেন বাহাদুরাবাদ ঘাট হয়ে। ঢাকা থেকে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের এক বিরাট অংশ, খাজা নাযিমুদ্দীন, সোহরাওয়ার্দী এবং আমি গফরগাঁও-এ রওয়ানা হলাম। আমরা জানতে পারলাম, মৌলানা শামসুল হুদার কর্মীরা মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা ট্রেনের যে কামরায় ছিলেন সেখানে হামলা করেছে। ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় হামলা হতে পারে এই ভয়ে খাজা নাযিমুদ্দীন ঢাকা রেলস্টেশনে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় গিয়ে ঢুকলেন। খাজা সাহেবকে আমি সেটা করতে দিলাম না, আমরা সকলে প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসলাম। গফরগাঁও-এ যখন পৌছলাম তখন দেখলাম মৌলানার কয়েক হাজার সমর্থক রামদা নিয়ে উপস্থিত রয়েছে। এই সফরে আমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ১৫ বছরের বালক বদরুদ্দীন মহম্মদ উমরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম।

খাজা নাযিমুদ্দীন ঢাকা কর্তৃপক্ষকে গফরগাঁও-এ সশস্ত্র পুলিশ পাঠাবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন। গফরগাঁও এলাকার লোকদের আমার থেকে তিনি ভালোভাবে চিনতেন। রেলস্টেশন থেকে মৌলানা শামসুল হুদার সশস্ত্র সমর্থকদের মধ্য দিয়ে আমাদের গাড়ি স্থানীয় রেস্টহাউসে গিয়ে পৌছল এবং সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল ঐ দিন বিকালে।

যেখানে সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল সেখানে মৌলানা শামসুল হুদার সশস্ত্র লোকজন রামদা এবং বল্লম নিয়ে জমায়েত হয়েছিল। আমি আমার পুত্রকে নিয়ে রেস্ট হাউসের বাইরে জনতার মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে রান্নাঘরে দুপুরে তারা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমাদের জন্য কী রান্না করছে দেখতে গেলাম। রেস্ট হাউসে ফিরে আসতে খাজা নাযিমুদ্দীন আমাকে তিরস্কার করে বললেন, "হাশিম আপনি একজন পাগল। আপনি এই বিপজ্জনক অবস্থায় জনতার মাঝে আপনার পুত্রকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন?"

সূর্যাস্তের পূর্বেই খাজা নাযিমুদ্দীন গফরগাঁও ত্যাগ করলেন। নবাবজাদা লিয়াকত আলী তারও আগে রওয়ানা হয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী এবং আমি থেকে গেলাম।

মৌলানা শামসুল হুদার বিপজ্জনক অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত লোকজনের সঙ্গে মোকাবেলা করা যথেষ্ট সাহসের ব্যাপার ছিল। সূর্যাস্তের পূর্বে সুহরওয়ার্দী কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিলেন, আমি সন্ধ্যার পর বক্তৃতা শুরু করলাম। সব প্রশংসা আল্লাহ প্রাপ্য। ওই সন্ধ্যায় আমার মানসিক প্রস্তুতি ভালোই ছিল। ফলে সেদিনের বক্তৃতা হয়েছিল আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা। বক্তৃতাটি মৌলানা শামসুল হুদার প্রশংসায় পরিপূর্ণ থাকায়, মৌলানা সাহেবের লোকেরা এতে বেশ আশ্চর্য হল। তারা মাটিতে বসে তাদের অস্ত্র ঘাসের উপর রেখে দিয়ে একাগ্রচিত্তে আমার বক্তৃতা শুনল। বক্তৃতার দ্বিতীয় অংশে আমি মৌলানা সাহেবের ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়টি খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে শুরু করলাম। বক্তৃতা শেষ হবার পূর্বে মুহূর্তে আবুল মনসুর আহমদ মঞ্চের কাছে ছুটে এসে বললেন, "হাশিম সাহেব, আপনি বক্তৃতা চালিয়ে যান, লোকেরা আপনার বক্তৃতা শুনতে চায়।"

মুসলিম লীগের জন্য জনসভাটি খুবই সাফল্যজনক হয়েছিল, কিন্তু নির্বাচনে আমরা পরাজিত হয়েছিলাম। গিয়াসুদ্দীন পাঠান তাঁর জেলা রাজনীতিতে নূরুল আমীনের প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। নূরুল আমীন গিয়াসুদ্দিন পাঠানের সাফল্য কামনা করেননি এবং তিনি গোপনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধাচরণ করেন। নূরুল আমীনের এই মনোবৃত্তি আমরা জানতে পারলাম সভাশেষে ঢাকার উদ্দেশ্যে গফরগাঁও ত্যাগ করার সময়। রেলস্টেশনে নূরুল আমীনের দেশপ্রেমবর্জিত আচরণের জন্য সোহরাওয়ার্দী তাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করলেন। ঢাকা থেকে আমি আমার নির্বাচনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বর্ধমান রওয়ানা হলাম।

নূরুল আলমকে আমি আমার নির্বাচন প্রতিনিধি করেছিলাম। নূরুল আলম ছিলেন বর্ধমানের অধিবাসী এবং বাংলার মুসলিম লীগ কর্মীদের অন্যতম যুবনেতা। সোহরাওয়ার্দী বরিশালে নির্বাচন অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং মহম্মদ আযিযুদ্দীন অ্যাডভোকেটকে বরিশালে নির্বাচন অভিযান পরিচালনায় তার সহকর্মী হিসাবে নিয়োজিত করেন। এ সিদ্ধান্তটি ভুল হয়েছিল। তার উচিত ছিল বরিশালের যুবক অ্যাডভোকেট শামশের আলীকে এ দায়িত্ব প্রদান করা। আযিযুদ্দীন তাঁর জেলায় বামপন্থীদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন না।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ. কে. ফজলুল হক তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে সত্য ও ন্যায়ের বিচার ব্যতিরেকে সোহরাওয়ার্দীর প্রতি নানা কলঙ্ক আরোপ করলেন। ফলে সোহরাওয়ার্দী তার অভিযান খুব একটা চালিয়ে যেতে পারলেন না। প্রকৃতপক্ষে পিরোজপুরে যেখানে ফজলুল হকের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল তিনি সেখানে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হলেন। সোহরাওয়ার্দী আমাকে টেলিগ্রাম করে জানালেন, "আপনি আপনার নির্বাচন অভিযান ত্যাগ করে শীঘ্র বরিশালে এসে বরিশাল জেলায় আমাদের অভিযানের দায়িত্ব গ্রহণ করুন।"

বর্ধমান জেলায় নূরুল আলম আমার নির্বাচনী অভিযানের দায়িত্ব নিলেন এবং আমি বরিশাল রওয়ানা হয়ে গেলাম। সেখানে ১৮ মার্চ পর্যন্ত ব্যস্ত থাকলাম। সোহরাওয়ার্দী কলকাতা ফিরে এলেন। বরিশালে অবস্থানকালে রণদা প্রসাদ সাহার স্টিম লঞ্চ আমার ব্যবহারের জন্য নিয়োজিত ছিল। আমি স্থির করলাম, ফজলুল হককে তার প্রভাবিত অঞ্চলে নিয়োজিত রাখতে যাতে তিনি অন্য জায়গায় কাজ করার সুযোগ না পান। আমি তাকে দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত করে রাখলাম। শ্রদ্ধাস্পদ বৃদ্ধ ফজলুল হক দেশীয় নৌকাযোগে দিবারাত্রি কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাঁর ঐ বৃদ্ধ বয়সে অক্লান্ত শ্রমশক্তির আমি প্রশংসা করেছিলাম। তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন লৌহমানব ছিলেন।

ফজলুল হক বরিশাল সদর দক্ষিণ এবং বাগেরহাট খুলনা এই দুই নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি পিরোজপুর মহকুমার পিরোজপুর উত্তরে সৈয়দ আফজাল এবং মঠবাড়িয়া থেকে হাতেম আলী জমাদারকে দাঁড় করিয়েছিলেন। ফজলুল হক এবং তার মনোনীত দুজন প্রার্থী আমাদের পরাজিত করেন এবং বরিশালের অন্যান্য নির্বাচনী কেন্দ্রে আমরা জয়লাভ করি। তিনি আমাদের মনোনীত প্রার্থী খান বাহাদুর সাদরুদ্দীন আহমদকে বরিশালে এবং বাগেরহাটে ডা. মোজাম্মেল হককে পরাজিত করেন।

প্রদেশে আমরা আরও তিনটি আসনে পরাজিত হয়েছিলাম। গফরগাঁও-এর শামসুল হুদা, মুর্শিদাবাদ জেলার খোদাবক্স তাদের নির্বাচনী কেন্দ্রে এবং ফরিদপুরের বাদশা মিয়া আমাদের প্রার্থী ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া)কে পরাজিত করেন।

সুতরাং সাধারণ নির্বাচনে আমরা সাতটি নির্বাচনী কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছিলাম কিন্তু ফজলুল হক যখন বাগেরহাট নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে পদত্যাগ করলেন তখন উপনির্বাচনে আমরা একটি আসন ফিরে পেলাম। আফজাল, ফজলুল হকের আত্মীয় ছিলেন এবং তারা বরিশালের একই গ্রাম চাখারের অধিবাসী ছিলেন। চাখারের এক মাইলের ব্যবধানে খালিশাকোটায় মুসলিম লীগের একটি নির্বাচনী শিবির ছিল।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বালাহারের কমরেড আবদুস শহীদের নেতৃত্বে বরিশালের একদল যুবকর্মীকে মুসলিম লীগের পক্ষে কাজ করার জন্য খালিশাকোটায় নিয়োজিত রাখা হয়। চাখারের বাজার এলাকায় মুসলিম লীগের কিছুসংখ্যক কর্মী একটি রেস্তোরাঁয় যখন চা পান করছিল তখন ফজলুল হকের দলের লোকজন তাদের ঘেরাও করে আফজালের বাড়িতে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যায় এবং ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে আটক করে রাখে। ফজলুল হকের অন্য এক দল, মুসলিম লীগ কর্মীদের ভোট গণনা কেন্দ্র থেকে তাড়া করে। এ ঘটনা ঘটেছিল ঐ এলাকায় যখন ভোট গণনার দিন ধার্য হয়। মুসলিম লীগ কর্মীদের যখন ছেড়ে দেওয়া হয়। তখন ফজলুল হকের কর্মীদের এরূপ বে-আইনি কার্যের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তারা আযিযুদ্দীনকে অনুরোধ জানায়। আযিযুদ্দীন মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীলদের অন্তর্ভুক্ত থাকায় মুসলিম লীগের বামপন্থী কর্মীদের অভিযোগের কোনো মূল্য দিলেন না।

বরিশালে নির্বাচনী অভিযানে আমার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এক সন্ধ্যায় ফজলুল হকের জায়গা চাখারে আমার লঞ্চে মুসলিম লীগের পতাকা উড়িয়ে আমি হঠাৎ উপস্থিত হলাম। তৎক্ষণাৎ স্টিমার ঘাটে ফজলুল হকের পার্টির এক নেতা এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা চিৎকার করে বললেন, "হাশিম ভাই, আপনাকে আমাদের ভালো লাগে এবং শ্রদ্ধা করি, কিন্তু মুসলিম লীগের পতাকাবাহী আপনার লঞ্চটির দৃশ্য আমাদের নিকট অসহ্য লাগছে, আপনি ফিরে যান।" আমি আমার কেবিন থেকে বের হয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললাম, "আমি এখানে ভোটের জন্য আসিনি, আমার চা শেষ হয়ে গেছে। কাজেই আপনাদের অতিথি হিসাবে চা পান করতে এসেছি।" তারা বললেন, "তাহলে ঠিক আছে, আসুন অতিথি হিসাবে। আমাদের সঙ্গে চা পান করুন।"

স্টিমার থেকে আমি নামতে উদ্যত হওয়া মাত্র বি. ডি. হাবিবুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে ফজলুল হাকের কর্মীদের আরেকটি দল উপস্থিত হল। আমাকে দেখামাত্র তারা আমাকে উদ্দেশ্য করে নানা রকমের অশ্লীল গালাগালি শুরু করল। তারা বলল, "আপনি বরিশালের বাঁশ দেখেননি, আপনাকে চা না পান করিয়ে বাঁশের বাড়ি মারব। আপনি কি জানেন না যে ফজলুল হক আপনার বাপ।" আমি হেসে বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ছেলেবেলা থেকে জানি যে ফজলুল হক আমার বাপের মতো।" বেশি কিছু বলার আগে হাবিবুল্লাহ্‌র লোকজন লঞ্চে ইট পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে দিল। গত্যন্তর না দেখে তাড়াতাড়ি আমি সে স্থান ত্যাগ করলাম।

নির্বাচন শেষ হওয়ার পর কলকাতায় এসে ফজলুল হকের কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করায় তিনি সেটি উপভোগ করে খুবই হেসেছিলেন। পরবর্তী সময়ে কখনো কখনো ফজলুল হক তার আশেপাশে যে সমস্ত লোকজন বসে থাকতেন তাদের কাছে গল্পটি বর্ণনা করার জন্য আমাকে অনুরোধ করতেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বর্ধমানে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন দুজন। একজন বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক আবদুস সাত্তার এবং অপরজন এম. এন. রায়ের পার্টির নূর নেওয়াজ। আমি ভোট পেয়েছিলাম ২৬,৭০২, আবদুস সাত্তার পেয়েছিলেন ৭৬৩ এবং নূর নেওয়াজ পেয়েছিলেন ২৬৩ ভোট। এভাবে ১৯৪৬ সালের ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচন শেষ হল।

বাংলায় সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রী পরিষদ

সোহরাওয়ার্দীর নিকট আমি প্রস্তাব করলাম যে, দলের নেতা নির্বাচনের পূর্বে মুসলিম লীগ সরকারের নীতি এবং কর্মসূচি নবনির্বাচিত মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির প্রথম সভায় আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য পার্টির নিকট তুলে ধরা হবে। পার্টির নীতি এবং কর্মসূচির দলীলপত্র পার্টি কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর নেতা নির্বাচন করা হবে। সোহরাওয়ার্দী রাজি হলেন কিন্তু এ ধরনের কোনো দলীলে তার স্বাক্ষর দিতে উৎসাহ বোধ করলেন না। কোনো স্পষ্ট এবং দৃঢ় অঙ্গীকারে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে তিনি পছন্দ করতেন না।

সাধারণ নির্বাচনের পর ১৯৪৬ সালের ২ এপ্রিল মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির প্রথম সভার তারিখ নির্ধারিত হল। ৩নং ওয়েলেসলী ফার্স্ট লেনে মুসলিম লীগ অফিসে সভা অনুষ্ঠিত হল। পার্লামেন্টারি পার্টির সদস্যরা বিধানসভা ও আইনসভা উভয় সভায় যোগদান করেছিলেন। সোহরাওয়ার্দী সবার শেষে সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সভা আরম্ভের কয়েক মিনিট পূর্বে ফরিদপুরের লাল মিয়া আমার নিকট এসে বললেন, "সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে আমি এক বার্তা এনেছি। গভর্নর সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সোহরাওয়ার্দী মনে করেন পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা হিসাবে তার উচিত গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষৎ করা। এটা সম্ভব যদি আপনি পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচনের পূর্বে পার্টির নীতি এবং কার্যবিধি নিয়ে আলোচনার উপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি না করেন।" সোহরাওয়ার্দীর বার্তার প্রকৃত মর্মকথা বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে হল না। অন্য কোনো দিক চিন্তা করার সময় না থাকায় আমি রাজি হয়ে গেলাম এবং লাল মিয়া টেলিফোন করে সোহরাওয়ার্দীকে সে-কথা জানিয়ে দিলেন।

সভা শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক মিনিট পূর্বে সোহরাওয়ার্দী এসে পৌছলেন এবং তিনি সর্বসম্মতিক্রমে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচিত হলেন।

বিধানসভায় দলীয় কর্মসূচির একটি খসড়া প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে কমিটি নিয়োগ করার জন্য সভা সোহরাওয়ার্দীকে ক্ষমতা প্রদান করল। সোহরাওয়ার্দী, শামসুদ্দীন আহমদ, খান বাহাদুর নুরুল আমীন, মেসার্স ফজলুল রহমান, মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, আহমদ হোসেন, হাবিবুল্লাহ্ বাহার, হামিদুল হক চৌধুরী, এম. এ. হামিদ এবং আমাকে নিয়ে পার্টি কর্মসূচির খসড়া তৈরির জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হল। গভর্নর মন্ত্রী পরিষদ গঠন করার জন্য সোহরাওয়ার্দীকে আহ্বান করে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দশ বছর মুসলমানরা বাংলায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং ১৯৪৬ সালের পর আরও ষোলো মাস। তাঁরা সর্বজনগ্রাহ্য (accredited) হিন্দুনেতাদের ক্ষমতা থেকে আলাদা রেখেছিলেন। দু'তিনজন হিন্দুমন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু তারা তাদের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতেন না। তারা ছিলেন লোকদেখানো এবং গৃহশত্রু। এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম। যার ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে বাংলা বিভাজিত হয়েছিল। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রীপরিষদ গঠনের জন্য আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। কংগ্রেসের দিক্‌পালরা এতে রাজি হতে পারেননি। তারা সন্দেহ পোষণ করেন যে, যদি বাংলায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয় তাহলে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও একইভাবে যুক্ত মন্ত্রীপরিষদ গঠনের দাবি করবে।

গান্ধী নোয়াখালী যাওয়ার প্রাক্কালে কলকাতায় সোহরাওয়ার্দীর বাসভবন ৪০নং থিয়েটার রোডে মুসলিম নেতৃবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গান্ধী বললেন, তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকার অপেক্ষা একদলীয় সরকার গঠনের পক্ষপাতী। এ বিষয়ে সোহরাওয়ার্দীর মনোভাব উদারপন্থী ছিল।

বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ সোহরাওয়ার্দীর উপর কর্মভার ন্যস্ত করার পরই তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করেন যে, তিনি কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠনে আগ্রহী রয়েছেন। বাংলায় লীগ-কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পার্লামেন্টারি নেতা নিযুক্ত হওয়ার পরই সোহরাওয়ার্দী বলেছিলে-নি, মুসলমানরা উদারভাবে সকলকে আলিঙ্গন করতে পারে এবং দেশের উন্নতির জন্য কাজ করতে পারে। তিনি কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রীপরিষদ গঠনের সম্ভাবনাকে নাকচ করেননি। সাংবাদিকদের সঙ্গে এই আলোচনা ৩ এপ্রিলের মর্নিং নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

জিন্নাহ্ কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। তিনদিনের সম্মেলন ৭ এপ্রিল দিল্লীতে অ্যাংলো এরাবিক কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। ১০ এপ্রিল বেলা আড়াইটার সম্মেলনে বক্তৃতা করার জন্য জিন্নাহ্ আমাকে অনুরোধ করেন। বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, "গান্ধী ঘোষণা করেছেন যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হবেন তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী। গান্ধী একজন ঋষি। সুতরাং কাশ্মীরের উদ্ধত পণ্ডিত কীভাবে একজন ঋষির রাজনৈতিক উত্তরাধিকারীরূপে সন্তুষ্ট হতে পারেন? তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকারী হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। যদি ন্যায়পরায়ণতা, সুবিবেচনা ও বিবেক ব্যর্থ হয় তাহলে ধারালো বাক্য নয়, শানিত অস্ত্রই সমস্যার মোকাবেলা করবে।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পূর্বাহ্নে সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে জিন্নাহ্ এক পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি পেশ করেন। আমি পয়েন্ট অব অর্ডারের কথা বললে জিন্নাহ্ বললেন, মৌলানা সাহেব আপনার কী পয়েন্ট অব অর্ডার?" আমি বললাম, "আপনার প্রস্তাবটি গ্রাহ্যতাহীন এবং কর্তৃত্ব বহির্ভূত (void and ultra vires)."

জিন্নাহ্ বললেন, "কেন কেন?" আমি বললাম, "১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ তার ১৯৪১ সালের মাদ্রাজ অধিবেশনে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মূলমন্ত্ররূপে স্বীকার করেছিল। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব এক পাকিস্তানের কথা চিন্তা করেনি, চিন্তা করেছিল ভারতীয় মুসলমানদের জন্য দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের কথা। মুসলিম লীগের আইনসভার সদস্য সম্মেলনের এমন অধিকার নেই যে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের বিষয়ের পরিবর্তন ও রূপান্তর করা যা বর্তমানে মুসলিম লীগের মূলমন্ত্ররূপে গৃহীত।"

জিন্নাহ্ বললেন, "ভালো, মৌলানা সাহেব, বহুবচন 'এস'-এর উপর চাপ দিচ্ছেন যেটি স্পষ্টত ছাপার ভুল।" আমি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নওবাবজাদা লিয়াকত আলী খানকে সভার কার্যবিবরণী পেশ করার জন্য অনুরোধ করায় তিনি সেটি পেশ করলেন এবং সেখানে জিন্নাহ্ তার স্বাক্ষরিত বহুবচন 'এস' দেখতে পেলেন। নবাবজাদা লিয়াকত আলী বললেন, "কায়েদে আযম, আমাদের পরাজয় হয়েছে।" আমাকে উদ্দেশ্য করে জিন্নাহ্ বললেন, মৌলানা সাহেব, আমি এক পাকিস্তান রাষ্ট্র চাই না, আমি চাই ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি বিধানসভা। আপনি আমার প্রস্তাবটিকে এমনভাবে সংশোধন করতে পারেন কি যাতে লাহোর প্রস্তাবের অবমাননা না করে আমার উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।" আমি বললাম, "তাহলে বিশেষণ পদ 'ওয়াজ' কেটে ফেলুন এবং অনির্দিষ্ট শব্দ 'এ' বসান যাতে আপনার প্রস্তাব এরূপ হয় আমাদের উদ্দেশ্য হল উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং বাংলা ও আসামকে নিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে একটি পাকিস্তান রাষ্ট্র।" জিন্নাহ্ এতে রাজি হলেন।

সম্মেলনে প্রকাশ্য অধিবেশনে জিন্নাহ্র উপদেশে এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী একটি প্রস্তাব পেশ করলেন। বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে জিন্নাহ্ যে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন এটি সেই প্রস্তাবের পরিবর্তিত রূপ এবং যেটি আমার সঙ্গে পয়েন্ট অব অর্ডারের আলোচনার পর তিনি (জিন্নাহ্) প্রত্যাহার করেন। সেই সময় আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন থেকে নিজেকে অনুপস্থিত রেখেছিলাম. কারণ আমি জানতাম, আমার উপস্থিতিতে প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রস্তাবটি পেশ করার জন্য জিন্নাহ্ আমাকে বলতেন। জিন্নাহ্র সঙ্গে আমার বাদানুবাদ কম্যুনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'পিপলস এজ'-এ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কংগ্রেস, মুসলিম লীগ সরকারের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত রাখতে অস্বীকার করল। সোহরাওয়ার্দী তার মন্ত্রী পরিষদ গঠন করতে বাধ্য হলেন। নতুন মুসলিম লীগ মন্ত্রী পরিষদ ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করল। এই মন্ত্রী পরিষদ এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী, রংপুরের মৌলভী আহমদ হোসেন, নোয়াখালীর খান বাহাদুর আবদুল গফরান, ময়মনসিংহের খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, চব্বিশ পরগণার খান বাহাদুর আবদুর রহমান, কুষ্টিয়ার মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদ, বগুড়ার খান বাহাদুর মহম্মদ আলী এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। আমি সোহরাওয়ার্দী ও তার মন্ত্রী পরিষদকে দায়িত্বভার গ্রহণের পরই মুসলিম লীগের পতাকা উত্তোলন এবং চা-চক্রে যোগদান করার জন্য সোজা মুসলিম লীগ অফিসে আসতে অনুরোধ করেছিলাম। মন্ত্রীদের মধ্যে কেবলমাত্র গফরান সাহেব আমার অনুরোধ রক্ষা করে মুসলিম লীগ অফিসে এসেছিলেন। সোহরাওয়ার্দী নিজে এবং তার মন্ত্রী পরিষদ পার্টির নিয়মানুবর্তিতার প্রতি আনুগত্য বজার রাখার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। সোহরাওয়ার্দী পার্লামেন্টারি পার্টির কাছে তার শাসন ব্যবস্থার নীতি ও কর্মসূচীর কোনো দলীল পার্টির বিবেচনার জন্য তৈরি এবং পেশ করেননি।

৪০নং থিয়েটার রোডে সোহরাওয়ার্দীর বাসভবনে পার্টির এক সভায় স্থির হয় যে, বিশেষ বিশেষ মন্ত্রণালয়ের নীতি ও কর্মসূচি গঠনের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের একটি করে উপদেষ্টা কমিটি থাকতে হবে। খুবই অনিচ্ছা সহকারে সোহরাওয়ার্দী পার্টির এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মূল অংশ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নিয়মানুবর্তিতাকে দুর্বল করার লক্ষ্যে তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্মী ও নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ আনুগত্য লাভের প্রচেষ্টা শুরু করলেন।

বর্ধমান জেলায় আমার গ্রামের বাড়ি কাশিয়াড়ায়, যা বর্তমানে কাশেমনগর নামে পরিচিত, সেখানে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্মী এবং যুবনেতাদের এক সম্মেলন আহ্বান করলাম। এই সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী ও তার মন্ত্রী পরিষদের অন্যতম সদস্য কুষ্টিয়ার শামসুদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে স্থির হয় যে, মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা মন্ত্রী পরিষদের নিকট থেকে কোনো ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে পারবেন না, জনসাধারণের প্রয়োজনে যেসব কাজকর্ম করার দরকার সেগুলির জন্য তাঁদেরকে জেলা মুসলিম লীগ অথবা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদের নিকট আবেদন করতে হবে।

সোহরাওয়ার্দীর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল এই যে, তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন না এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে একমত হতেন না তাদের প্রতি কোনো রকম ব্যক্তিগত বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন না। যারা প্রকৃত দুষ্ট, যাঁদের প্রতি চিন্তা ও কর্ম অন্যান্য বিবেচনা ব্যতিরেকে নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থকে কেন্দ্র করে থাকে এবং এ কারণে কোনো প্রকার নির্ভরযোগ্য নয়। তাদের তিনি পছন্দ করতেন না। নূরুল আমীন ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তফাজ্জল আলী খাজা নাযিমুদ্দীনের এবং তাঁর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু তারা নিজেদের রাজনৈতিক আচরণে ছিলেন সংযত এবং সহানুভূতিশীল। এই দুই ব্যক্তিকে নব নিযুক্ত আইনসভার স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকারের পদের জন্য সুপারিশ করে সোহরাওয়ার্দীকে বলতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং আইনসভার প্রথম অধিবেশনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নূরুল আমীন এবং টি, আলী স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার নিযুক্ত হলেন। সোহরাওয়ার্দী ও তার মন্ত্রী পরিষদ ফরিদপুরের লাল মিয়াকে পার্লামেন্টারি পার্টির চীফ হুইপ মনোনীত করার কথা স্থির করলে আমি রাজি হলাম না। আমি এরজন্য চেয়েছিলাম একজন মোটামুটি শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। এরজন্য আমি কুমিল্লার মফিজুদ্দীন আহমদের নাম সুপারিশ করেছিলাম এবং তিনি চীফ হুইপ হয়েছিলেন। মানুষ ও পরিবেশকে সোহরাওয়ার্দী আমার থেকেও ভালো বুঝতে পারতেন। আমার সুপারিশ সঠিক ছিল না।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রস্তাব

১৯ জুলাই ১৯৪৬ বোম্বেতে জিন্নাহ্ সাহেব নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলারদের এক সভা আহ্বান করেন। কাউন্সিলে যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় সেটি ইতিহাসে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রস্তাব নামে পরিচিত। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পাকিস্তান অর্জনের জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করতে হবে। প্রস্তাবে লীগ সভাপতি জিন্নাহ্কে সংগ্রাম কমিটি গঠনের কর্তৃত্ব প্রদান করে। কাউন্সিল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রস্তাব গ্রহণের পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের উপর ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত খেতাব বর্জন করলেন, তারা জিন্নাহ্র প্রতি তাদের নিঃস্বার্থ সমর্থনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। খেতাব বর্জনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হওয়ার পর সভায় বক্তৃতা প্রদানের জন্য জিন্নাহ্ আমাকে আহ্বান করলেন। আমি বললাম, "জনাব সভাপতি, আপনার প্রতি আমার নিঃস্বার্থ সমর্থনদানে আমি অপারগ। আপনার প্রতি আমার ঐকান্তিক সমর্থন থাকবে যদি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পরিচালিত হয় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের কোনো দল বা জনগণের বিরুদ্ধে নয়। আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের খেতাব বর্জন লক্ষ্য করছিলাম। আমার যতদূর জানা আছে ব্রিটিশ সরকার তাদের একান্ত নিজেদের লোক ছাড়া অন্য কাউকে উচ্চখেতাব দান করে না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ব্রিটিশদের তৈরি এইসব নেতৃবৃন্দ কি রাতারাতি তাদের স্বভাব পরিবর্তন করতে পারবেন?" জিন্নাহ্ মুচকি হেসে আমাকে বললেন, "মৌলানা সাহেব, এইসব ব্যক্তিদের প্রতি আপনি এতটা কঠোর হবেন না।"

আমি যখন আমার চেয়ারে উপবেশন করলাম তখন জিন্নাহ্র সেক্রেটারি আমার নিকট এসে অনুরোধ করলেন, বিকেলে আমি যেন মালাবার হিলসের বাসভবনে জিন্নাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি বললেন, আমার সহায়তা করার জন্যে সঙ্গে আমি একজনকে নিয়ে যেতে পারি। আমি ময়মনসিংহের শামসুল হককে আমার সঙ্গে নিয়ে সময়মতো জিন্নাহ্র বাসভবনে উপস্থিত হয়েছিলাম। তার সেক্রেটারি আমাদের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অভ্যর্থনা করে লাইব্রেরি কক্ষে উপবেশন করালেন। একের পর এক সোহরাওয়ার্দী, মৌলানা আকরাম খান, হাসান ইস্পাহানী, হামিদুল হক চৌধুরী এবং ফরিদপুরের মোহন মিয়া এসে উপস্থিত হলেন। এরপর আরব সাগরের সম্মুখভাগের বারান্দায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। জিন্নাহ্ এসে তাঁর চেয়ারে উপবেশন করলেন। কি ব্যাপার হতে পারে ভেবে আমি আশ্চর্য হলাম।

সোহরাওয়ার্দী, শামসুল হক এবং আমি জিন্নাহ্র ডানপাশে বসেছিলাম, অন্যান্যরা তার বামপাশে ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আকরাম খান আমার বিরুদ্ধে বত্রিশ পৃষ্ঠার এক টাইপ করা অভিযোগের আবেদনপত্র জিন্নাহ্র নিকট পেশ করলেন। জিন্নাহ্ মৌলানা আকরাম খানকে জিজ্ঞেস করলেন, কাগজগুলো কিসের। মৌলানা বললেন, "এগুলো আবুল হাশিমের বিরুদ্ধে অভিযোগের আবেদনপত্র।" জিন্নাহ্ মুচকি হেসে বললেন, "আমি যদি এর বিচার করতে চাই তাহলে আমাকে সমস্ত ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট (Indian Evidence Act), পেনাল কোড (Penal Code) এবং ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড (Criminal Procedure Code)-এর যাবতীয় ব্যবস্থাদি পড়তে হবে। যদি আমি আবুল হাশিমকে দোষী সাব্যস্ত করি তাহলে আমি কি করতে পারি? আমি তাকে এক সপ্তাহের জন্য সাসপেন্ড করতে পারি, এর বেশি কিছু নয়। মৌলানা সাহেব, আপনি ভেবে দেখেছেন কি বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে? জনগণের কাছে ফিরে যান। সেটাই হল পুনর্বিচারের শ্রেষ্ঠ আদালত।" জিন্নাহ্ কাগজগুলো মৌলানা সাহেবের দিকে ঠেলে দিলেন।

ফরিদপুরের মোহন মিয়া বললেন, "স্যার আবুল হাশিম আমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করেন।" উত্তরে আমি বললাম, "মোহন মিয়া আমার বিপক্ষ দলের অন্যতম নেতা। তাঁর প্রতি আমাদের অবিচারের একটি উদাহরণ আমি আপনাকে দিচ্ছি। পার্লামেন্টারি বোর্ডে আমরা সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলাম। তিনি যে ভোটকেন্দ্র থেকে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন সেখানকার জন্য তাকে আমরা মনোনীতও করেছিলাম। এই ভদ্রলোক ফরিদপুর জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি, ফরিদপুর জেলা বোর্ড এবং স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান। এতদ্সত্ত্বেও বাংলায় মুসলিম লীগ যখন অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল তখন সাধারণ নির্বাচনে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। তার পরাজয়ের পর আমরা তাকে বিধানসভার জন্য মনোনীত করি এবং বর্তমানে তিনি বিধানসভার সদস্য।"

জিন্নাহ্ মুচকি হাসলেন। চা-চক্র শেষে সভা ভঙ্গ হল। জিন্নাহ্ কয়েক মিনিট থাকার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন এবং আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছি। এখন আপনি জনগণের নিকট গিয়ে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করুন। বাংলার নিজস্ব একটি সংস্কৃতি রয়েছে।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিক্ষোভ প্রদর্শনের দিন ধার্য করা হয় ১৬ আগস্ট (১৯৪৬)। এর আগে সোহরাওয়ার্দী আন্দামান থেকে ঢাকা জেলে প্রত্যাগত (repatriated) আন্দামান বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নটি মুসলিম লীগ পার্লামেন্টার পার্টির নিকট উত্থাপন করলে পার্লামেন্টারি পার্টি সর্বসম্মতিক্রমে বন্দীদের মুক্তির স্বপক্ষে মত পোষণ করেন। সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৬ সালের ১৪ আগস্ট ঢাকায় বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং কলকাতায় অনুষ্ঠিত দাঙ্গার পরই সকল বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হল। মুক্তির পর তারা কলকাতায় এসে আমার বাসভবন ৩৭নং রিপন স্ট্রিটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এই বাসভবনে আমি মুসলিম লীগ অফিস থেকে মিল্লাতের প্রেসসহ ১৯৪৬ সালের জুন মাসে উঠে আসি। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের আমি দুপুরের আহারে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। সেদিনই আমি প্রথম বাংলার বিদ্রোহী নেতা মেসার্স অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত এবং অন্যান্যদের দেখলাম। বাংলার কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড আবদুল্লাহ রসুল আমার সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেন।

১৯৪৬ সালের ১১ আগস্ট কলকাতা জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক ওসমান ১৬ আগস্টের কর্মসূচি ঘোষণা করে এক প্রেস বিবৃতি প্রদান করলেন। কলকাতা মুসলিম লীগের পরিচালনায় ধারাবাহিকভাবে কলকাতা, হাওড়া, মেটিয়াব্রুজ এবং চব্বিশ পরগণার কারখানা অঞ্চলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করা হয়। পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ডাক ও তার বিভাগ, হাসপাতাল, ক্লিনিক, মাতৃসদন ইত্যাদির মতো অত্যাবশ্যকীয় জরুরি সার্ভিস ছাড়া সকল বেসামরিক, বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রে হরতাল এবং সাধারণ ধর্মঘট সম্পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হয়েছিল। প্রতিটি কেন্দ্র থেকে মিছিল ব্যান্ডসহ বেলা তিন ঘটিকায় অক্টরলোনি মনুমেন্টে এসে মিলিত হল। সোহরাওয়ার্দী সভায় সভাপতিত্ব করলেন। সভায় যোগদানের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় খ্রিস্টান, তফশিলী সম্প্রদায়, আদিবাসী উপজাতীয় সম্প্রদায়সমূহের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। জুমার নামাযের পর প্রত্যেক মসজিদে বিশেষ মোনাজাত হয়েছিল।

১৩ আগস্ট এক প্রেস বিবৃতিতে আমি উল্লেখ করলাম যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করবে এবং এ-কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমাদের লক্ষ্যবস্তু কেবলমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের খপ্পরে পড়ে বিশেষ এক মহলের উসকানী সত্ত্বেও, যাতে জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে হেয় প্রতিপন্ন না করে সুশৃঙ্খলভাবে পালন করা হয়, সে বিষয়ে আমি প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদের নিকট আবেদন করেছিলাম। কেননা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যই ছিল দেশে যে কোনো জনপ্রিয় গণঅভ্যুত্থানকে দমন করা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৬ আগস্টের অভূতপূর্ব সংঘর্ষ যা সকাল থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলেছিল সে বিষয়ে মুসলিম লীগের কোনোই জ্ঞান, সন্দেহ বা ধারণা ছিল না। সংঘর্ষ চলা অবস্থায় অক্টরলোনি মনুমেন্টের পাদদেশে আমরা সভার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। মুসলমানরা নিরস্ত্র এবং পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য অপ্রস্তুত ছিল। মানুষ মিথ্যা বলতে পারে কিন্তু পরিস্থিতি কখনও মিথ্যা বলে না। কলকাতায় এ উপলক্ষে প্রত্যাশিত বিরাট জনসমাবেশ দেখাবার জন্য বর্ধমান থেকে আমি আমার দুই পুত্র বদরুদ্দীন মহম্মদ উমর (১৫) এবং শাহাবুদ্দীন মহম্মদ আলী (৮)-কে নিয়ে এসেছিলাম। আমি যেমন আমার দুই পুত্রকে ময়দানে নিয়ে এসেছিলাম, তেমনি ফরিদপুরের লাল মিয়া তার ৬/৭ বছরের নাতিকে ময়দানে নিয়ে এসেছিলেন। বিপদের সম্ভাবনা আছে এমন জানা থাকলে আমরা আমাদের পুত্র এবং নাতিদের ময়দানে নিয়ে আসতাম না।

দাঙ্গা

জনসমাবেশে লাহোরের রাজা গজনফর আলী খান ও খাজা নাযিমুদ্দিন বক্তৃতা দিয়েছিলেন। খাজা নাযিমুদ্দীন তার বক্তৃতায় বললেন, "আমাদের সংগ্রাম কংগ্রেস এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে।" আমি তাঁকে মাইক্রোফোন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামের দিকে ইঙ্গিত করে দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, "আমাদের সংগ্রাম ভারতের কোনো জনসাধারণের বিরুদ্ধে নয়, আমাদের সংগ্রাম ফোর্ট উইলিয়ামের বিরুদ্ধে।" মঞ্চে আমরা যখন উপবিষ্ট ছিলাম তখন চতুর্দিক থেকে খবর পৌঁছতে লাগল যে কলকাতার সর্বত্র ভীষণ দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। লাল মিয়া এবং আমি আমাদের ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে ময়দান থেকে পায়ে হেঁটে রিপন স্ট্রীটে পৌঁছলাম।

সোহরাওয়ার্দী ১৬ আগস্ট সাধারণ ছুটির দিন ঘোষণা করে মারাত্মক ভুল করেছিলেন। শান্তিপ্রিয় হিন্দু ও মুসলমানরা দাঙ্গায় কোনোভাবে জড়িত ছিলেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল বাহিনীর দ্বারা যে দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল সেটা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের পর ভয়াবহ যেসব ঘটনা ঘটেছিল তার দ্বারা পরিপূর্ণভাবে সমর্থিত হয়। দাঙ্গা পুর্ণোদ্যমে ১৬ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী চলেছিল। শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পুলিসকে সহায়তা দানের জন্য সেনাবাহিনী তলব করতে প্রদেশের গভর্নরকে সোহরাওয়ার্দী অনুরোধ জানালেন, কিন্তু সৈন্য মোতায়েন করা হল না। পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য কলকাতার পুলিস বাহিনী যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। কলকাতা পুলিস কমিশনার ছিলেন ইংরেজ। দাঙ্গা চলাকালে সোহরাওয়ার্দী তার প্রধান কর্মকেন্দ্র পরিবর্তন করে লালবাজার পুলিসের প্রধান কর্মকেন্দ্র কন্ট্রোল রুমে দিবারাত্রি অবস্থান শুরু করলেন। তিনি ট্রাক বোঝাই করে সশস্ত্র পুলিস কনস্টেবল পাঠালেন কিন্তু তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারল না। সোহরাওয়ার্দীর অন্য আর কিছু করার ছিল না এবং মহানগরী পাঁচদিনব্যাপী অরক্ষিত অবস্থায় থাকল।

সোহরাওয়ার্দীর অনুরোধে পাঞ্জাব সরকার একটি বড় সশস্ত্র পুলিস বাহিনী কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন এবং তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছিল। সোহরাওয়ার্দী তার জীবন বিপন্ন করে দিবারাত্রি তার গাড়িতে চড়ে মহানগরীর চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করেছিলেন, বিরাট হত্যাকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল ছিল মধ্য কলকাতা।

আমার জনৈক বন্ধু জানালেন যে, তিনি মৌলানা আযাদ সুবহানীকে বউবাজার স্ট্রিটে হেঁটে যেতে দেখেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ মৌলানাকে খুঁজে বের করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও সশস্ত্র পুলিস পাঠালাম। ভাগ্যক্রমে তারা মৌলানাকে বউবাজার স্ট্রিটে দেখতে পেয়ে আমার বাসভবনে নিয়ে এলেন। মধ্য কলকাতায় স্নাতকোত্তর মহিলা ছাত্রীদের হোস্টেল, মনজান মহিলা হোস্টেল বিবেকানন্দ রোডে অবস্থিত ছিল। হোস্টেলে হামলা হয়েছিল, মহিলা ছাত্রীদের জীবন এবং সম্ভ্রমের প্রতি হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। দাঙ্গাবাজরা হোস্টেল থেকে মুসলিম লীগের পতাকা টেনে নামাতে চাইলে ছাত্রীরা সাহসের সঙ্গে বাধা প্রদান করেছিল। আমি সে খবর পেয়ে হোস্টেলের বসবাসরতা ছাত্রীদের উদ্ধার করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে একটি ট্রাকে স্বেচ্ছাসেবক ও সশস্ত্র পুলিস বাহিনী পাঠালাম। আমার বাসভবন ৩৭নং রিপন স্ট্রিটে তাদের নিয়ে আসা হল। প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীদের পিতামাতা ও অভিভাবকদের জানিয়ে দিলাম যে তারা আমার বাসভবনে নিরাপদে রয়েছেন। দাঙ্গা যখন প্রশমিত হল সোহরাওয়ার্দী কিছু সংখ্যক ছাত্রীদের পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য তহবিলের ব্যবস্থা করলেন।

কলকাতা হত্যাকাণ্ডের দুঃখজনক সংবাদ ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং এই হত্যাকাণ্ডের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। খিদিরপুর পোর্টের ডককর্মীদের অধিকাংশই ছিল নোয়াখালী ও কুমিল্লার অধিবাসী। কলকাতার দাঙ্গায় তারা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কলকাতায় ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান।

২১ আগস্ট (১৯৪৬) সোহরাওয়ার্দী তার বাসভবন ৪০নং থিয়েটার রোডে সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের এক সভা আহ্বান করলেন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সোহরাওয়ার্দী, শরৎচন্দ্র বোস, খাজা নাযিমুদ্দিন, কিরণশংকর রায়, এম. এ. ইস্পাহানী, কে. সি. গুপ্ত, এস. এম. ওসমান, শামসুদ্দীন আহমদ, হামিদুল হক চৌধুরী, খাজা নূরুদ্দীন এবং আমি। সুদীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হল যে সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ সমভাগে থেকে এক মিছিল সংগঠিত করে জনসাধারণকে অবহিত করবেন যে শান্তি আনয়নে সচেষ্ট হয়ে সব দল একত্রিত হয়েছেন। এভাবে তারা জনসাধারণকে শান্ত থাকার এবং মহানগরীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনার সম্ভাব্য আবার চেষ্টা করার জন্য জনসাধারণকে উদ্যোগী করবেন। সোহরাওয়ার্দীর বাসভবন থেকে একযোগে বিভিন্ন দলের পতাকা বহন করে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, মহাসভার এবং কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ সমভিব্যহারে মিছিল

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই মিছিল পার্ক সার্কাস, এন্টালি, বেনিয়াপুকুর, এলগিন রোড, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, কালীঘাট, আলীপুর, খিদিরপুর এবং উত্তর কলকাতার মধ্য দিয়ে ঘোরায় এবং সবদলের নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণের ফলে প্রত্যাশিত ফল লাভ হয়েছিল।

১৯৪৬ সালের ২৪ আগস্ট ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেল কলকাতা সফর করলেন। তিনি সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকা এবং ত্রাণ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করে ২৬ আগস্ট দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। খাজা নাযিমুদ্দীন, সোহরাওয়ার্দী, মির্জা আহমদ, ইস্পাহানী, কলকাতা মুসলিম লীগের সেক্রেটারি এস. এম. ওসমান, হামিদুল হক চৌধুরী, শেঠ আদমজী, হাজী দাউদ এবং আমি ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে খাজা নাযিমুদ্দীন বললেন, "মহামান্য বড়লাট বাহাদুর (Your Excellency) আমার উচিত স্পষ্টভাবে কথা বলা। ইনি হলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম। ইনি আপনাদের ভারত ত্যাগ করে চলে যাওয়ার আগ্রহে বিশ্বাসী নন।" ফল দাঁড়াল এই যে, ভাইসরয় দাঙ্গার ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। সমালোচনা করতে গিয়ে আমি বললাম, "কলকাতার প্রতিটি হত্যা, অগ্নিকাণ্ড এবং ধর্ষণের জন্য মহামান্য বড়লাট বাহাদুর দায়ী।" ভাইসরয় জানতে চাইলেন কেন তাকে অপরাধের জন্য আমি দায়ী করছি।

আমি বললাম, "সরদার প্যাটেল জোর গলায় বলেছেন যে কংগ্রেসকে ক্ষমতা হস্তান্ত র করে ব্রিটিশরা ভারত পরিত্যাগ করবেন। অপরপক্ষে জিন্নাহ্ চিৎকার করে বলেছেন মুসলমানদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্রিটিশরা ভারত পরিত্যাগ করবেন– যাদের কাছ থেকে ভারতে তারা ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এর ফলে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে এই বিশ্বাস দাঁড়ায় যে তারা গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।" ভাইসরয় বললেন, "ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উক্তিতে আমি কিভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারি?" আমি বললাম, "আমি চাই না যে আপনি হস্তক্ষেপ করুন, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে আপনি কিভাবে আপনার সুস্পষ্ট নীরবতাকে ব্যাখ্যা করবেন? আপনার উচিত ছিল আপনার সরকারের। মনোভাবকে ব্যাখ্যা করা।"

২৯ আগস্ট নোয়াখালী জেলায় হঠাৎ আকস্মিক উত্তেজনার সৃষ্টি হল। খিদিরপুরের ডককর্মীদের গণহত্যার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এটা হয়েছিল। ৭ সেপ্টেম্বর মৌলানা গোলাম সারওয়ারের নেতৃত্বে নোয়াখালীর মৌলবীদের এক সভায় ঘোষণা করা হয় যে কলকাতা হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুসলমানদের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। নোয়াখালী এবং কুমিল্লা জেলার সর্বত্র দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল এবং সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পূর্ববঙ্গের সমস্ত জেলাব্যাপী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ত। সোহরাওয়ার্দী আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছিলেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গান্ধী নোয়াখালী জেলার দত্তপাড়ায় ১৪ নভেম্বর (১৯৪৬) পৌছলেন। গান্ধীর সেক্রেটারি, ভুলাভাই দেশাই, নাতনি মুনি গান্ধী এবং নাতবউ আভা গান্ধী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী দত্তপাড়ায় গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গান্ধী পদব্রজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে হিন্দুদের মনোবল পুনরুজ্জীবিত করেন। সোহরাওয়ার্দী প্রত্যেক বিপজ্জনক জায়গায় শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করেন। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শরণার্থী শিবির খোলা হয় এবং দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গান্ধী ও তার সঙ্গীরা বঙ্গীয় সরকারের অতিথি হিসাবে নোয়াখালী যান এবং সেখানে অবস্থান করেন। গান্ধীর নোয়াখালী সফর নোয়াখালী ও কুমিল্লা এই দুই জেলায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর মুসলমানদের নিষ্ঠুর আচরণের ব্যাপারে পৃথিবীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। কলকাতা এবং বিহারে ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। গান্ধী কলকাতা বা পাটনা কোথাও সফর করেননি।

১৯৪৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পাটনায় দাঙ্গা শুরু হয়। খাজা নাযিমুদ্দীন এবং আমি পাটনা সফর করে বিহারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিনহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। পাটনার দাঙ্গা শুরু হওয়ার তিনদিন পর বিহারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী রাঁচী থেকে সিনহা পাটনায় পৌছেছিলেন। পাটনায় পৌছতে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, তিনদিন পর্যন্ত রাঁচি থেকে পাটনায় আসার কোনো প্লেন ছিল না। বিহারের দাঙ্গায় বিহার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রফেসর আবদুল বারি এবং একজন প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা নিহত হন। জিন্নাহ্‌ও কলকাতা এবং পাটনা সফর করেননি। দাঙ্গা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে স্থির মস্তিষ্কে' জিন্নাহ্ বলেছিলেন যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তার দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রমাণ করেছে।

ক্যাবিনেট মিশন

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেট লর্ড পেথিক লরেন্স, বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এবং নৌবাহিনীর প্রথম লর্ড এ. ভি. আলেকজান্ডারকে নিয়ে গঠিত ব্রিটিশ মন্ত্রী পরিষদের একটি দল ভারতে আগমন করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার সংযোগ সাধনের উপায় খুঁজে বের করা। তারা একটি কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারের অধীনে উপমহাদেশের প্রদেশগুলিকে নিয়ে তিনটি স্বায়ত্তশাসিত গ্রুপ গঠনের প্রস্তাব করেন এবং এটাই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান নামে পরিচিত। মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন। প্ল্যান গ্রহণ করেছিল। যদি ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান কার্যে পরিণত হত তাহলে লাহোর প্রস্তাবের আদর্শগত বিষয়বস্তুকে বিশেষ ক্ষুণ্ন না করে উপমহাদেশের বিভাজন পরিহার করা যেত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুর্ভাগ্যবশত এই চূড়ান্ত মুহূর্তে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে মৌলানা আবুল কালাম আযাদের স্থলাভিষিক্ত হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সাংবাদিক সম্মেলনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান মেনে চলতে অঙ্গীকারবদ্ধ নয় এবং তারা তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী যেভাবে খুশি উপমহাদেশের সংবিধান রচনা করবেন। এই উক্তির সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের দিকে ফিরে গেল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রেস বিবৃতির যুক্তিগ্রাহ্য পরিণতি হিসাবেই মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রস্তাব গ্রহণ এবং পরবর্তী বিধানসভা বর্জন করেছিল।

সোহরাওয়ার্দী ১২ আগস্ট (১৯৪৬) জনৈক আমেরিকান সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কালে বলেছিলেন, "মুসলিম লীগকে এড়িয়ে গিয়ে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার সম্ভাব্য পরিণতি দাঁড়াবে বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা এবং অনুরূপ সরকার গঠন।" তিনি আরও বলেন, "বাংলা থেকে যাতে কোনো রাজস্ব আদায় করা না যায় সে ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে বাংলাকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য করব। দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার কোনো ইচ্ছে লীগের নেই, তবে যদি আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয় তাহলে লীগ এরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।" সোহরাওয়ার্দী অভিযোগ করেন যে, কংগ্রেস যদি জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করে তাহলে তারা অন্তবর্তী সরকারে লীগের যোগদানে বাধা সৃষ্টি করবে। সোহরাওয়ার্দী মন্তব্য করেন, জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের সরকারে অন্তর্ভুক্ত করলে তা সারা ভারতকে আন্দোলনের মুখে ঠেলে দিয়ে গৃহযুদ্ধের সূচনা এবং দেশকে বিচ্ছিন্ন করবে।

২৪ আগস্ট (১৯৪৬) ভাইসরয়, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আসফ আলী, রাজা গোপাল আচারী, শরৎচন্দ্র বোস, জন মাথাই, সরদার বলদেব সিংহ, স্যার শাফাত আহমদ খান, জগজীবন রাম, সৈয়দ আলী জাহির এবং সি. এইচ. ভাবাকে নিয়ে তার কার্যনির্বাহী পরিষদ পুনর্গঠন করলেন। লর্ড ওয়াভেল অন্তবর্তী সরকারে এবং বিধানসভায় যোগদানের জন্য মুসলিম লীগকে তাদের নীতি পুনর্বিবেচনা করার জন্য আহ্বান করলেন। এর পূর্বে ভারতের সংবিধান রচনার জন্য বিধানসভা গঠিত হয়েছিল এবং বাংলা থেকে বিধানসভায় আমি অন্যতম সদস্য মনোনীত হয়েছিলাম।

ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদ কেবলমাত্র কংগ্রেসকে নিয়ে পুনর্গঠনের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ২৬ আগস্ট জিন্নাহ্ বলেন, "ভাইসরয় যে পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন সেটা খুবই অবিবেচনাপ্রসূত ও অরাজনীতিসুলভ।" জিন্নাহ্ বিধানসভা বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কলকাতা দাঙ্গার উপর আলোচনা করার জন্য কংগ্রেস ১২ সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় আইন পরিষদে মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করে। ১৩ সেপ্টেম্বর আলোচ্য বিষয় নিরূপণের পর বিরোধী দলের নেতা ধীরেন দত্ত, সংসদ সদস্য বিমল সিনহা মুখ্যমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রী পরিষদের উপর দুটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। মুলতবী প্রস্তাব আলোচনার দিন ১৯ সেপ্টেম্বর ধার্য করা হল। সোহরাওয়ার্দী Censure Motion-কে স্বাগত জানিয়ে বললেন, "কলকাতার বিভীষিকার উপর সংসদ সদস্যদের আলোচনার সুযোগ দেওয়ায় খুশি হয়েছি।"

কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করে আমার বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, "আপনারা সব সময়েই বলে আসছেন যে, তৃতীয় দল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের দরুন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কোথায় এখন সেই তৃতীয় দল? হিন্দুরা মুসলমানদের এবং মুসলমানরা হিন্দুদের দোষী সাব্যস্ত করছে। কোথায় এখন সেই তৃতীয় দল? অনুগ্রহ করে বিস্মৃত হবেন না যে, ভারতে ব্রিটিশদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রক্তরঞ্জিত পথে। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে আপনাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে ভারতীয় মানচিত্রে সেই লাল রঙ মুছে গেছে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয়দের রক্তে ভারতীয় মানচিত্রে গাঢ় লাল রঙ লেপন করতে।" দুটি অনাস্থা প্রস্তাবই আলোচনান্তে ভোটে নাকচ হয়ে যায়। ইউরোপীয়ান সদস্যরা নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

অন্তর্বর্তী সরকার

১৯৪৬ সালের ১৫ অক্টোবর মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করল। মুসলিম লীগের মনোনীত ব্যক্তিরা হলেন : নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান, সরদার আবদুর রব নিশতার, আই. আই. চুন্দ্রীগড়, রাজা গজনফর আলী এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। এটা খুবই আশা করা হয়েছিল যে, অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য নবাব মহম্মদ ইসমাইল এবং খাজা নাযিমুদ্দীনকে মনোনীত করা হবে। রাজা গজনফর আলী ও চুন্দ্রীগড়ের কোনো প্রকার রাজনৈতিক প্রাক্‌পরিচিতি ছিল না। জিন্নাহ্ বাংলা থেকে কোনো মুসলমানকে গ্রহণ করেননি। বাংলাকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে নির্বাচন করা হয়েছিল।

সরদার প্যাটেল স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের দপ্তর গ্রহণ করেন। তারা অর্থ মন্ত্রণালয়ের দপ্তর মুসলিম লীগকে প্রদান করার প্রস্তাব করেন। কংগ্রেস ভেবেছিল অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবে। জিন্নাহ্ এ বিষয়ে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। পাঞ্জাব অর্থ বিভাগের চৌধুরী মহম্মদ আলী অর্থ দপ্তর গ্রহণ করার জন্য জিন্নাহ্‌কে পরামর্শ দিলেন এবং নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানকে সর্বান্তকরণে সমর্থন দানের প্রতিজ্ঞা করলেন। জিন্নাহ্ তার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। লিয়াকত আলী খানকে অর্থ বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হল। ভারত সরকারের অর্থ বিভাগের আরও দুজন অর্থ বিষয়ক দক্ষ ব্যক্তি গোলাম মহম্মদ এবং মীর্জা মমতাজউদ্দীন, চৌধুরী মহাম্মদ আলীর দলে যোগ দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম বাজেট তৈরিতে সাহায্য করেন। বাজেটটি প্রগতিশীল জনগণের বাজেটরূপে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল।

কংগ্রেস দারুণভাবে হতাশ হল। কংগ্রেসের প্রত্যাশা ছিল যে, নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবেন। যেটা সত্যে পরিণত হল না।

কংগ্রেস অচিরেই উপলব্ধি করল যে, মুসলিম লীগকে অর্থ দপ্তর হস্তান্তর করে তারা বিরাট ভুল করেছে। মৌলানা আবুল কালাম আযাদ তার বই 'India Wins Freedom'-এ লিখেছেন, "প্রত্যেক দেশে অর্থ দপ্তরের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী শাসন প্রণালীতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। ভারতে তার অবস্থিতি আরও গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ব্রিটিশ সরকার অর্থমন্ত্রীকে তাদের স্বার্থের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে গণ্য করে থাকে। এ দপ্তরের দায়িত্ব বরাবর এক-একজন ইংরেজকে দেওয়া হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে তাদেরকে ভারতে নিয়ে আসা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী প্রতিটি বিভাগেই হস্তক্ষেপ এবং কার্যসূচি প্রণয়ন করতে পারতেন। লিয়াকত আলী খান যখন অর্থমন্ত্রী হলেন তখন তিনি শাসনপ্রণালীতে মুখ্য অধিকার লাভ করলেন। প্রতিটি বিভাগের প্রতিটি প্রস্তাব তার বিভাগের সূক্ষ্ম পর্যালোচনাসাপেক্ষ ছিল। এ ছাড়াও তাঁর যে কোনো প্রস্তাব নাকচ করার অধিকার ছিল। তাঁর বিভাগের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো বিভাগের চাপরাসী নিয়োগ করাও সম্ভব ছিল না।"

ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদে মুসলিম লীগ সদস্যদের স্থান দেওয়ার জন্য কিছু সংখ্যক কংগ্রেস সদস্যদের বাদ দিতে হয়েছিল। কংগ্রেস স্থির করল, লীগ মনোনীত প্রার্থীদের স্থান সংকুলানের জন্য শরৎচন্দ্র বোস, স্যার শাফাত আহমদ খান এবং সৈয়দ আলী জাহিরের পদত্যাগ করা উচিত। শরৎচন্দ্র বোস ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জেল থেকে মুক্তিলাভ করার পরই শরৎচন্দ্র বোস কলকাতায় মির্জাপুর পার্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "পাকিস্তান একটি অর্থহীন আজগবী ব্যাপার।" এরপর থেকে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম যে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বোঝাব, ভারতকে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন করতে হলে ভারতের প্রতিটি দেশ ও জাতিকে স্বাধীন এবং সার্বভৌম হতে হবে। আমি স্থির করলাম শরৎচন্দ্র বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেসের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল এবং তারা ভালোভাবে বুঝেছিল যে, মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের নিয়ে যে সরকার সেটার অর্থই হল কংগ্রেসের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জন্য অশেষ ঝামেলাস্বরূপ। কার্যনির্বাহী পরিষদের কংগ্রেস সদস্যদের যে কোনো প্রস্তাব অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পরিবর্তন নতুবা অগ্রাহ্য করতেন। কংগ্রেসের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন সাধন করল। সাধারণভাবে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষভাবে সরদার প্যাটেল বুঝতে পারলেন যে, ভারত বিভাগই একমাত্র সমাধানের পথ।

ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ব্যর্থ হল এবং লর্ড ওয়াভেলকে ডেকে পাঠানো হলো। ভারতের। শেষ ভাইসরয় হিসাবে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতে পাঠানো হলো। তিনি ২২ মার্চ ভারতে পৌঁছান এবং ২৪ মার্চ ভারতের ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরিশিষ্ট

শুরু হোক সংগ্রাম

(১৯৪৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর প্রদত্ত প্রেসবিবৃতি)

কায়েদে আজম মহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেছেন যে, ভারতের কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক আইনসভার আসন্ন সাধারণ নির্বাচন পাকিস্তানের উপর ভারতীয় মুসলমানদের গণভোট হিসাবে গ্রহণ করা হবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটিতে ১৯৪৫ সালের ১ আগস্টের সভায় এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে মেজর এটলীর সরকার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন।

আমরা দাবি করি যে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারতের দশ কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন এবং লাহোরে ১৯৪০ সালের অধিবেশনে গৃহীত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধুনা প্রখ্যাত প্রস্তাব যেটা সাধারণভাবে পাকিস্তান পরিকল্পনা' নামে পরিচিত, মুসলিম ভারতের অভিমতের প্রতিনিধিত্ব করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিরা সুস্পষ্টভাবে কখনও এটাকে মেনে নিতে পারেনি এবং ভারতে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি তীব্রভাবে আমাদের দাবির বিরোধিতা করেছে। তারা মনে করেন, মুসলিম লীগ ছাড়াও ভারতে আহরার, খাকসার, জামিয়াতুল ওলামা ইত্যাদির মতো ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক কয়েকশো প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পাকিস্তান পরিকল্পনা প্রথম দিকে জিন্নাহ্ ও মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটিতে তার কিছু সংখ্যক বন্ধু-বান্ধবদেরই অভিমতের প্রতিনিধিত্ব করে। গান্ধী তার এক চিঠিতে জিন্নাহ্কে এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন। পরিশেষে কংগ্রেস মুসলিম লীগকে, মুসলিম ভারতের কিছু অংশের, সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এবং মুসলিম লীগের পাকিস্তান পরিকল্পনা মুসলিম ভারতের সেই অংশেরই সাম্প্রদায়িক দাবি হিসাবে বর্ণনা করে যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করে মুসলিম লীগ। কিন্তু ভারতে লীগ প্রতিষ্ঠানের অসাধারণ বিকাশলাভ, তার সভাসমিতি, বিক্ষোভ ইত্যাদি এবং সর্বোপরি গত আট বছরে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার উপনির্বাচনে তার শতকরা একশো ভাগ সাফল্য, ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে পরিচিতদের এ-কথা মেনে নিতে সাহায্য করেছিল যে, মুসলিম ভারতের পক্ষ থেকে কেবলমাত্র মুসলিম লীগই দায়িত্ব পালনে সক্ষম এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান পরিকল্পনা বিশ্বস্ততার সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের সমগ্র অংশের অভিমতের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রকৃতপক্ষে ক্রিপস্ প্রস্তাব যা গ্রেট ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে আলোচনার ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল এবং রাজা গোপাল

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আচারীর পরিকল্পনা যা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে আলোচনার ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল তা মূল পাকিস্তান নীতি এবং মুসলিম লীগের দাবিকে পরোক্ষভাবে গ্রহণ করার কথাই ব্যক্ত করে। যদিও রাজাজী এবং স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস্ উভয়েই নিজেদের মতো করে তাদের পরিকল্পনায় পাকিস্তান বিরোধী উপাদান আমদানি করে লাহোর প্রস্তাব নস্যাৎ করার জন্য সুচতুর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

সিমলা আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর খুবই দুর্ভাগ্যবশত কংগ্রেস ভারতীয় রাজনীতিকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করে এবং বাস্তব সত্যতাকে অস্বীকার করে তার পুরাতন মনোভাব অবলম্বন করল। তারা লীগের এবং পাকিস্তান পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তাদের একই পুরাতন প্রচারকার্য শুরু করল। তারা এখন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অন্যায়ভাবে ভারতের নেতৃত্বের জন্য নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে লীগকে এবং তার দাবিকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। বিদেশে প্রেরিত তাদের প্রতিনিধিরা সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে জনমত গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছে এই উদ্দেশ্যে যাতে করে স্তালিন, এটলী ও ট্রুম্যানকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করে পটস্ডাম থেকে তারা নিজেদের পক্ষে রায় পেতে পারে।

বর্তমান কালে একমাত্র ব্যালট বাক্সের মাধ্যমেই সম্ভব নির্ভুলভাবে জনমত যাচাই করা। সুতরাং মুসলিম লীগ, সহজ-সরল মুসলমান, যারা ছলচাতুরীতে অনভ্যস্ত তাদেরই সংগঠন হিসাবে সোজাসুজিভাবে ভারতে সাধারণ নির্বাচন দাবি করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে তারা এই নির্বাচনকে পাকিস্তানের উপর গণভোট হিসাবে ও সারা ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবির উপর গণভোট হিসাবে গ্রহণ করবে। মহামান্য সম্রাটের সরকার পরবর্তী শীত মওসুমে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুতরাং আমরা এখন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি যেহেতু সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে পাকিস্তানের জন্য মুসলিম ভারতের শত্রুদের সঙ্গে প্রথম খণ্ডযুদ্ধ।

এই সংগ্রামের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ প্রয়োজনীয় প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এই সংগ্রামে বিজয়লাভের জন্য আমাদের সম্পদকে সংগঠিত করতে হবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ বাংলার সাড়ে তিন কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করে এবং বর্তমান হিসাবে এর দশ লক্ষেরও অধিক সদস্য রয়েছে। এরূপ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে এটা স্বাভাবিক যে এর নেতৃবৃন্দ, কর্মী, সদস্য ও সমর্থকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকবে। আমি সকলের নিকট আন্তরিকভাবে আবেদন জানাচ্ছি, আমাদের এই সাধারণ সংগ্রাম অব্যাহত থাকাকালে তাদের সকল মতপার্থক্যকে পুঁটলি পাকিয়ে রেখে, প্রয়োজন হলে সেগুলোকে হিমাগারে আবদ্ধ রাখুন। এই সন্ধিক্ষণে ক্ষমতার জন্য, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ এবং অন্য কিছুর জন্য অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসংঘর্ষ হবে আত্মঘাতী। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুদূরপ্রসারী পরিণতি বয়ে আনবে এবং কিছুকালের জন্য এর দ্বারা ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

কংগ্রেস নিজেদের ব্যাপারে যাই চিন্তা করুন না কেন অথবা অন্যকে সে বিষয়ে যাই চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়াসী হন না কেন, মধ্যদিনের সূর্যের মতো এ-কথা পরিষ্কারভাবে সত্য যে তারা মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেন না। কিছু সংখ্যক মুসলমান হয়তো-বা তাদের বদ্ধমূল রক্ষণশীলতার জন্য যা ক্রমবর্ধমান এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে তাদের তাল মিলিয়ে চলার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে, অথবা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য এখনও কংগ্রেসের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কিত রেখেছেন, তাঁদের কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতা নেই, কেননা, তাঁরা নিজেদের ছাড়া অন্য কারও প্রতিনিধিত্ব করেন না। মৌলানা আবুল কালাম আযাদের প্রতি যথাযথ সম্মান রেখে বলা চলে যে, তাঁর কংগ্রেস সভাপতির পদটি হচ্ছে যারা ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত নন। তাদেরকে সুপরিকল্পিতভাবে প্রতারণা করারই একটি কৌশল মাত্র।

গান্ধী-জিন্নাহ্ আলোচনার অব্যবহিত পরই বিশ্বস্ততার সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের অনুভূতির প্রতিধ্বনি করে কায়েদে আযম ঘোষণা করেন যে, আমাদের পাকিস্তান সংগ্রাম কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়, বরং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে নির্মূল করার লক্ষ্যেই পরিচালিত। সিমলা আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার অব্যবহিত পরই ভাইসরয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশিত প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে লীগের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করতে তিনি কংগ্রেসের প্রতিও আবেদন জানান। কিন্তু কংগ্রেস যথোপযুক্ত সাড়া প্রদানের তোয়াক্কা করল না। ক্ষমতা ও প্রভুত্বের উন্মাদনায় বিভোর ব্যক্তিদের যে অবস্থা হয়ে থাকে, কংগ্রেস নেতৃবর্গ কায়েদে আযমের এরূপ ইঙ্গিতকে দুর্বলতার চিহ্ন হিসাবে মনে করল এবং ভারতের গ্রীষ্মাবকাশের রাজধানী (সিমলা) থেকে লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দিল। সুতরাং কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম হবে। আত্মরক্ষামূলক, যদিও আমাদের পাকিস্তান সংগ্রাম মূলত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয় বরং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে নির্মূল করার লক্ষ্যেই পরিচালিত। কংগ্রেস তাঁদের নিজেদের চিন্তা অনুযায়ী তাদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে আমাদের বাধ্য করেছেন। সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল লীগ এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের ব্যাপারে বিতর্কের চির অবসান ঘটাবে।

আদর্শগত অথবা ব্যক্তিগত, বৈধ অথবা অন্য কিছু সবরকম মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। আমাদের দলের মধ্যে সম্ভাব্য সব রকমের বিশৃঙ্খলা পরিহার করার নিমিত্তে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ১৯৩৫ সালের ২৭ আগস্ট এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আইনসভাগুলির নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত প্রাদেশিক লীগ, জেলা, মহকুমা এবং ইউনিয়ন পুনর্গঠনের জন্য সর্বপ্রকার নির্বাচন স্থগিত রাখা হোক। আমি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন আহ্বান করি। সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ যে পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠনের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল, সেটা উপলব্ধির জন্য বেশি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এখন থেকে কাউন্সিলের ভদ্রমহোদয়দের সাবধান করে দিচ্ছি তারা যেন তাদের স্বদেশপ্রেমের চেতনাকে ব্যক্তিগত স্বার্থের বশীভূত হতে না দেন।

কায়েদে আযম মহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ চান আমরা যেন আইনসভায় প্রথম শ্রেণীর একটি দল প্রেরণ করি। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের বিগত আট বৎসরে অযোগ্য ও অনির্ভরশীল দলের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। আমরা কেবলমাত্র ভালো ধরনের নির্বাচন করতে পারি যদি আমরা একটি পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করতে সক্ষম হই যেটি প্রার্থী মনোনয়ন করার সময় সততা, যোগ্যতা এবং ন্যায়পরায়ণতা ব্যতিরেকে অন্য কিছু বিবেচনা করবে না। পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্যদের এমন হতে হবে যাতে তারা জনগণের আস্থাভাজন হতে পারেন।

চতুর্দিক থেকে আমরা খবর পাচ্ছি যে, আইনসভার ভাবী প্রার্থীরা তাদের জন্য ভোট প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছেন। কিছুসংখ্যক ব্যক্তি তাদের সম্ভাব্য বিরোধীপক্ষকে ভীতিপ্রদর্শনের নিমিত্তে এই মর্মে গুজব রটাচ্ছেন যে, তাদের নিজেদের নির্বাচনী এলাকার জন্য ইতিমধ্যে লীগ তাদের মনোনীত করেছেন। এ ধরনের প্রচারণার জন্য যে সব ব্যক্তি দায়ি তারা যদি এ কাজ অব্যাহত রাখেন তবে তারা লীগের সব চেয়ে বড় শত্রু হিসাবে বিবেচিত হবেন। মুসলিম লীগ জনগণের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে যাতে তারা লীগের আদর্শ ও দাবির পক্ষেই নিজেদের ভোট প্রদান করেন, কোনো ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নয়।

পার্লামেন্টারি বোর্ড যদি সততার সঙ্গে গঠিত হয় তাহলে তাঁরা প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে স্থানীয় মতামত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। বহু বছর ধরে আমরা উঁচু গলায় চিৎকার করে আসছি মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ, পাকিস্তান এবং কায়েদে আযম জিন্দাবাদ। এখন লীগের মূলনীতির প্রতি, পাকিস্তান এবং তার নেতা কায়েদ আযম মহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে সত্য যাচাইয়ের সময় ও সুযোগ এসেছে। সুতরাং আমাদের উচিত স্বদেশপ্রেমের সর্বোচ্চ আদর্শ স্থাপন করা।

আমার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, মুসলিম বাংলা একযোগে, এক ব্যক্তিরূপে, তার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করবে এবং একজন মুসলিম মুজাহিদের চেতনা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করবে। একজন গাজীর সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্যমণ্ডিত হতে পারবে। কিছুসংখ্যক ব্যক্তি মনে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেন যে, মুসলিম লীগ নির্বাচনে সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করবে এবং শতকরা একশো ভাগ সাফল্য অর্জন করবে। আল্লাহ তায়ালার আশীর্বাদে আমরা তাই আশা করি, কিন্তু অতিরিক্ত আত্মপ্রসাদের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আসুন, আমরা বিনম্রভাবে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের আশীর্বাদ করেন এবং সেই সঙ্গে তার আশীর্বাদ লাভের যোগ্যতার জন্য আসুন আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করি। এটাই হচ্ছে চিন্তা ও কোনো কাজ করার প্রকৃষ্ট মুসলিম রীতিনীতি।

পাকিস্তান বলতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বোঝায়। তারা হচ্ছেন মূর্খ, কল্পনাবিলাসী অথবা কপট যাঁরা মনে করেন যে, চরম ত্যাগ ও সংগ্রাম ছাড়াই পাকিস্তান অর্জন করা সম্ভব। পাকিস্তানের প্রতিটি সৈনিকের পরিষ্কারভাবে জানা দরকার যে, পাকিস্তান অর্জনের পথ ক্যাল্ভ্যারির পথ থেকেও অনেক দুরূহ।

আমাদের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও কারিগর, ছাত্র ও যুবক, কৃষক ও ভূস্বামী, উলেমা ও অপেশাদারী ব্যক্তির উচিত মুসলিম ভারতের মহান নেতার তূর্যধ্বনির আহ্বানে সাড়া দেওয়া, সমস্ত মতপার্থক্যের অবসান ঘটানো, অতীতকে ভুলে যাওয়া এবং শীতকালীন সংগ্রাম, আইনসভার সাধারণ নির্বাচনের জন্য নিজেদের সকল সম্পদকে কাজে লাগানো। মুসলমান হিসাবে আমাদের ব্যক্তিসত্তা ও সম্পত্তি সবই আল্লাহ তায়ালার এবং আমাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে যখন যেমন প্রয়োজন হবে সেইমতো আমাদের সকল সম্পদ আল্লাহ্ তায়ালার পথে নিয়োজিত রাখতে হবে। যাদের অর্থ আছে তারা প্রয়োজনমতো যেভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে হযরত আবুবকর মু'তার যুদ্ধের জন্য রসূলের নিকট তার বিষয়–সম্পত্তি দান করেছিলেন, সেইভাবে মুসলিম লীগের নিকট তা নির্বাচনী যুদ্ধের জন্য সমর্পণ করবেন। যাঁদের লেখনীশক্তি রয়েছে তাঁরা লেখা দিয়ে, যাদের বাচনশক্তি আছে তাঁরা তাঁদের বাগ্মীতার দ্বারা সাহায্য করবেন। ছাত্র এবং যুবকেরা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম কাজে লাগাবেন।

কায়েদে আযম মহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তাঁর সাম্প্রতিক প্রেস বিবৃতিতে ভারতীয় মুসলমানদের কাছে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী আবেদন জানিয়েছেন। আসুন, আমরা তার আশ্বাসে যথাযোগ্য সাড়া প্রদান করি। মুসলিম লীগের মতো একটি মহান প্রতিষ্ঠানের কারও প্রতি প্রতিহিংসা অথবা বিদ্বেষ থাকতে পারে না এবং সৎ ও সরল উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে যাঁরা যোগ দিতে চান তাদের লীগ স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। মুসলিম লীগের বাইরে এখনো যারা রয়েছেন তাদের উচিত পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং অনতিবিলম্বে লীগে যোগদান করা।

কংগ্রেস নিজেদের অহেতুক এবং অনর্থকভাবে লীগের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে ফেলেছে। আসুন, আমরা সাহসের সঙ্গে এর মোকাবেলা করি। মৌলানা আবুল কালাম আযাদ তার সাম্প্রতিক প্রেস বিবৃতিতে রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্তশাসনের এবং কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলেছেন ও অনুগ্রহপূর্বক প্রস্তাবটি নিখিল ভারত কংগ্রেস

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কমিটিতে পেশ করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি খুবই অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কংগ্রেস ভারতীয় মুসলমানদের যতটা বোকা বলে মনে করলেন তারা ততটা বোকা নন। আল্লাহ্‌র করুণায় এখন তারা আসল ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

পাকিস্তান সূত্রটি খুবই সোজা এবং ভারতীয় রাজনীতির বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাকিস্তানের মূলসূত্র হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও সমতা। সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য ও অর্থনৈতিক শোষণ, যা কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের ভিত্তি, তার বিরোধিতা।

স্বাধীন ভারত কখনও এক দেশ ছিল না। স্বাধীন ভারতীয়রা কখনও এক জাতি ছিল না। অতীতে মোগল ও মৌর্য আধিপত্যে ভারত ছিল অখণ্ড এবং বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেনের আধিপত্যে রয়েছে অখণ্ড। স্বাধীন ভারতকে আল্লাহ্‌ তায়ালা যেমন সৃষ্টি করেছেন সেইভাবে হতে হবে একটি উপমহাদেশ যেখানে প্রতিটি বসবাসকারী জাতি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে। বোম্বাইয়ের পুঁজিপতিদের প্রতি কংগ্রেসের যতই দুর্বলতা থাকুক এবং অখণ্ড ভারতের দোহাই দিয়ে সমগ্র ভারতকে শোষণ করার ক্ষেত্রে তাদের জন্য তারা যতই সুযোগ সৃষ্টি করুন, প্রতিটি ভারতীয় মুসলিম, ভারতে কংগ্রেস কর্তৃক যে কোনো চক্র, গ্রুপ অথবা সংগঠনের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগকে প্রতিরোধ করবে। পাকিস্তান বলতে হিন্দু ও মুসলমান সকলের স্বাধীনতা বোঝায়, ভারতীয় মুসলমানরা প্রয়োজন হলে রক্তস্নানের মাধ্যমে তা অর্জন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কংগ্রেসের এ-কথা বোঝা উচিত যে, যখন আমরা মুসলমানরা স্বাধীনতার কথা বলে থাকি তখন সেটি সত্যিভাবেই বলি এবং ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশ অথবা ভারতীয় সব রকমের আধিপত্য ও শোষণের বিরোধী। পাকিস্তানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য সুযোগ-সুবিধার ন্যায়সঙ্গত ও সমতাভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা থাকবে। শরিয়ত অনুযায়ী তাদের সমাজকে শাসন করার অধিকার ছাড়া নিজেদের জন্য কোনো বিশেষ সুযোগের সংরক্ষণ রাখা মুসলমানদের চিন্তার মধ্যে নেই। এটা বললে মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিমূলক হয় যে, পাকিস্তান বলতে মুসলমানদের আধিপত্য এবং অন্যান্যদের শোষণ করার সুযোগ-সুবিধা বোঝায়।

কায়েদে আযম মহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেছেন, "পাকিস্তান সরকারের প্রতি পাকিস্তানের সাধারণ মানুষদের সমর্থন থাকবে এবং পাকিস্তান সরকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পাকিস্তানের সকল জনগণের ইচ্ছে অনুযায়ী ও অনুমতি নিয়ে পরিচালিত হবে।" (৫ অক্টোবর ১৯৪৩)

মুসলমানদের লীগে যোগদানের এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের আবেদন জানাতে গিয়ে তাদের সাবধান করে দিতে চাই, তারা যেন দিল্লী

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও লন্ডনের আপাত উদাসীন সাম্রাজ্যবাদীদের ভুলে না যান। আমরা যেন ভুলে না যাই যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের উপর পাকিস্তান অর্জন নির্ভরশীল। সাম্রাজ্যবাদীরা কংগ্রেসে ক্ষমতার লোভের আভাস পেয়েছে এবং তার যথাযথ সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস মুসলিম লীগকে জড়ানোর জন্য সাবধানে ফাঁদ পেতেছে। সিমলায় উর্দি পরিহিত ভৃত্য কর্মচারী এবং মার্শাল ওয়াভেলের সুমধুর কথাবার্তা সাফল্যের সঙ্গে কংগ্রেসকে ফাঁদে আকর্ষণ করেছে। কংগ্রেস মুসলমানদের পরাজিত করার জন্য সৈনিক ভাইসরয়কে তাদের মিত্র হিসাবে পাওয়ার চেষ্টা করেছে। কায়েদে আযমকে ধন্যবাদ, তিনি ভারতীয় মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে মাথা উঁচু করে সিমলা ত্যাগ করেছিলেন এবং একজন সৎ নেতার সাহস নিয়ে সাধারণ নির্বাচন দাবি করেছেন। সুতরাং লীগ আমাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের নিকট নয়, জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। আমরা পাকিস্তান অর্জন করব আমাদের নিজেদের জনগণের ত্যাগ ও তিতিক্ষার দ্বারা, ব্রিটিশদের সৌজন্য ও বদান্যতার মাধ্যমে নয়। যেহেতু আমরা সমদর্শিতা, ন্যায় বিচার ও ন্যায্য ব্যবহারের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের নীতি নির্ধারণ করেছি, যেহেতু আধিপত্য ও শোষণ নয়, স্বাধীনতা ও মুক্তিই হল আমাদের প্রেরণার উৎস, তাই ঐক্যবদ্ধ থাকলে আমাদের জয় হবেই।

আমার বাংলা সফরকালে আমি দেখেছি জনগণের বুদ্ধি ও হৃদয় খুবই সুস্থ এবং উপরতলার নেতারা যদি তাদের নেতৃত্ব অর্জনের ব্যর্থতায় জনগণের হৃদয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করেন তাহলে তারা কোনো রকম ভুল করবেন না। সুতরাং এই একটি ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। এক মুহূর্তের জন্যও যাতে আমরা বিস্মৃত না হই যে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পাকিস্তান এবং ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের অধীনে মন্ত্রীত্ব শুধু একটি আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। নেতৃবর্গের মধ্যে যাঁরা ভাবী বিধানসভায় মন্ত্রী অথবা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিজের অবস্থান বজায় রাখার প্রবণতা প্রদর্শন করবেন তাদেরকে ভালোভাবে চিহ্নিত করা হবে এবং মুসলিম বাংলা তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবে না।

সাধারণ নির্বাচন আমাদের সংগ্রামের সূত্রপাত। ভোটকেন্দ্রে পাকিস্তানের স্বপক্ষে আমাদের ভোট প্রদানের পর, কংগ্রেসের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের মিথ্যা দাবিকে নিশ্চিহ্ন করে গণভোটে বিজয়লাভের পর মুহূর্তেই সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করব এবং পাকিস্তানের ভিত্তিতে ভারতের জনগণের কাছে আশু ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করব। আমাদের সংগ্রাম সকলের মুক্তির সংগ্রাম, আমরা বিশ্বাস ও আশা করি প্রত্যেক মুক্তিকামী নারী ও পুরুষ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে চলেছি কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা খুব একটা খুশি নই, কেননা কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা অথবা প্রকৃত অর্থে ভারতীয় জনগণের কোনো অংশ অথবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংগ্রামে আমরা কখনও শক্তির অপচয় করতে চাইনি। আমাদের সংগ্রাম শতকরা একশো ভাগ আত্মরক্ষামূলক। আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে সংগ্রাম করতে চাইনি, তারা ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারীদের ন্যায়-অন্যায় ও অশোভনভাবে জোরপূর্বক আমাদের সংগ্রামে নামতে বাধ্য করেছে। সুতরাং বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা ব্যতিরেকে চূড়ান্ত বিজয়ের প্রত্যয় নিয়ে অন্তর দিয়ে এবং আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি আস্থা রেখে শুরু হোক আমাদের সংগ্রাম।*

* মূল ইংরেজি রচনা 'Let us go to war' থেকে অনূদিত-অনুবাদক।

শাহাবুদ্দীন মুহাম্মদ আলী কর্তৃক In Retrospect-এর বাংলা অনুবাদ— "আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জিন্নাহ্‌কে ইতিহাসের রূপকার ও সেকুলার আখ্যা দেওয়া ভুল নয়

বেদ প্রতাপ বেদকর

লালকৃষ্ণ আদবানীর কোন কথাটা ভুল? প্রথমে জিন্নাহ্‌র বিষয়টা নেওয়া যাক। যদি জেনারেল পারভেজ মুশাররফ মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে যেতে পারবেন, তাহলে লালকৃষ্ণ আদবানী জিন্নাহ্‌র মাযারে কেন যেতে পারবেন না? অটলবিহারী বাজপেয়ী লাহোরে গিয়ে 'মিনারে পাকিস্তান' গিয়েছিলেন, যেটা পাকিস্তান সৃষ্টির কেন্দ্রভূমি, যেটা পাকিস্তানের জন্মভূমি। আডবানীকে করাচীতে জিন্নাহ্‌র মাযারে নিয়ে যাওয়া আবশ্যক ছিল। জিন্নাহ্‌কে তিনি দুটি উপাধি দিয়েছেন– ইতিহাসের রূপকার বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এবং সেকুলার। জিন্নাহ্, ইতিহাসকে রূপ দিয়েছেন তাতে সন্দেহ কোথায়? অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত খোদ জিন্নাহ্ স্বপ্নেও পাকিস্তান গঠনের কথা ভাবেননি। যারা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব তারা স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেন। যে বিষয়টা স্বপ্নেও ভাবা যায় না, সে বিষয়টাই জিন্নাহ্ বাস্তবায়িত করেছেন। ভারতের স্বাধীনতার শিরোপা গান্ধীজী ছাড়াও আরও অনেকের মাথায় পরানো হয়, কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শিরোপা কেবলমাত্র জিন্নাহ্‌র মাথায় পরানো হয়। একদিক থেকে গান্ধীজী ব্যর্থ লিডার ছিলেন এবং জিন্নাহ্ সফল। তিনি পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছেন এবং তা লাভ করেছেন। আর গান্ধীজীর ভারত কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, তবে সম্পূর্ণ অহিংস পন্থায় হয়নি। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে গান্ধীজী ও জিন্নাহ্‌র কোনো তুলনা করা যায় না। গান্ধীজী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন আর জিন্নাহ্‌কে পাকিস্তানের লোকেরাও ভালোভাবে জানে না। তবুও আমরা তাকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বলব না সেটাই বা কীভাবে সম্ভব?

পাকিস্তান গঠন আমাদের কাছে ঠিক তেমনি ঘৃণাহ্য বিষয় মনে হয়, যেমনভাবে পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশ গঠন। যদি আমরা জিন্নাহ্‌কে প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে পাকিস্তানীরা মুজিবকে প্রত্যাখ্যান করবে না কেন? মুজিব আমাদের কাছে মহানায়ক এবং পাকিস্তানের কাছে খলনায়ক। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা কি সঠিক ও স্বাস্থ্যকর? কিসের ভিত্তিতে এটা করা হচ্ছে? এই দৃষ্টিভঙ্গিটা দক্ষিণ এশিয়ায় ঐক্যস্থাপন করতে পারে? এটা দক্ষিণ এশিয়াকে সংযুক্ত করবে না বিভক্ত করবে? আমরা দক্ষিণ এশিয়ার এক দেশের লোকরা যদি অন্য দেশের রাষ্ট্রনায়কদের প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে সেই

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেশের অস্তিত্ব ও বৈধতাকেও প্রত্যাখ্যান করব? যদি আমরা পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি তাহলে তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের কিভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারি? সন্তান বৈধ এবং পিতা অবৈধ এটা কিভাবে সম্ভব?

জিন্নাহ্‌র সেকুলার হওয়া সম্পর্কে বলা যায় যে, ভারতীয়রা যেরূপ শক্তিশালী যুক্তি দিয়ে এই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করবে, পাকিস্তানীরা তার চেয়ে বেশি জোরালো যুক্তি দিয়ে সেটা বাতিল ঘোষণা করবে; কারণ ইসলাম ধর্মের নাম নিয়েই তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাকে দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রবক্তা রূপে স্বীকার করা হয়। জিন্নাহ্ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার উৎস, সেটাই তার পরিচিত ও স্পষ্ট চিত্র। জিন্নাহ্‌কে সেকুলার অভিহিত করলে এই চিত্রের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করতে হয়। তাকে মহান ব্যক্তিরূপে পেশ করা, তার পাপরাশিকে পর্দায় ঢেকে দেওয়া। সংঘ পরিবার ও বিশ্বহিন্দু পরিষদ সেটাকে কিভাবে সহ্য করতে পারে?

এই পাঁয়তারা কংগ্রেস দলও হজম করতে পারছে না। লালকৃষ্ণ আদবানীর এই বিবৃতি পাকিস্তানে খুব বেশি শোরগোল তোলেনি, কারণ সেখানে যা বলা হয়েছিল সেটা প্রশস্তিতেই বলা হয়েছিল। কিন্তু ভারতে তো তুফান বয়ে গিয়েছে। আডবানীকে দেশের শত্রু, হিন্দুর শত্রু এবং রাষ্ট্রদ্রোহী বলা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, তাহলে আদবানী কি ভুল বলেছেন? প্রকৃত অর্থে তিনি ভুল বলেননি। তিনি যে ভুলটা করেছিলেন তা হল এই যে, কোনো রাজনৈতিক নেতাকে যেটা পরে বলা উচিত ছিল সেটাই তিনি আগেভাগে বলেছিলেন। প্রথমে বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিরা বলতেন, তারপরে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বলতেন, সেটাই ভালো হত। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে তাদের বিশ্লেষণে বলতে আরম্ভ করেছেন যে, জিন্নাহ্ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অগ্রদূত ছিলেন। তিনি ইসলামী চরমপন্থার বিরোধী ছিলেন, প্রকৃত অর্থে তিনি তো পুরোপুরি মুসলমানও ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাথে ভারত-বিভাজন কবুল করেছিলেন। গান্ধীজী ও নেহরু তাঁকে মুসলিম নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য করেছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি বলেছিলেন যে, এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল। তিনি ফিরে এসে বোম্বেতে বসবাস করতে চেয়েছিলেন। তিনি জাতীয় অ্যাসেম্বলীতে বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন, মি. আদবানী যার উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, অর্থাৎ পাকিস্তান গঠনের পর এখানে কোনো হিন্দু হিন্দু থাকবে না এবং কোনো মুসলমান মুসলমান থাকবে না, পাকিস্তানের সকল নাগরিক সমান হবে। জিন্নাহ্ তো পাকিস্তানের কায়েদ-ই-আযম হওয়ার চেয়ে 'মুসলিম গোখলে' হতে চেয়েছিলেন।

সাভারকার যতটা হিন্দু ছিলেন, জিন্নাহ্ ততটা মুসলমান ছিলেন না। সাভারকার যেমন রাজনৈতিক হিন্দু ছিলেন জিন্নাহ্‌ও তেমনি রাজনৈতিক মুসলমানে পরিণত

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়েছিলেন। প্রথমদিকে সাভারকার যেমন জাতীয়তাবাদী ছিলেন, জিন্নাহ্ও তেমনি ন্যাশনালিস্ট ছিলেন। ১৯২০-২১ সালে পুঙ্গা উপত্যকার মুসলমানদের খেলাফত আন্দোলনের বিরোধীতা করেছিলেন জিন্নাহ্। অথচ গান্ধীজী তাদেরকে পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন। এটাই পাকিস্তান আন্দোলনের মাইল ফলক বা ভিত্তিপত্তন ছিল। ভারত বিভাজনের মূলে কোথাও গান্ধী ও জিন্নাহ্র ব্যক্তিগত আমিত্ববোধের লড়াই ছিল না তো? জিন্নাহ্ সম্পর্কে এসব প্রশ্নের নতুন করে বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। তবে এটাও ঠিক যে, ভারত বিভাজনের সময় যেরূপ শত্রুতা, বিদ্বেষ ও রক্তের নদী বয়ে গিয়েছে তার জন্য জিন্নাহ্ ততটাই দায়ী, যতটা দায়ী কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল আমরা কাকে সেকুলার বলব? আর কাকে বলব না। কোন লিডারের দীর্ঘ জীবনের কোন দিকটা উন্মোচিত করব এবং কোন দিকটা আবৃত রাখব? যদি আমরা এই দেশকে পুনরায় খণ্ডিত করতে চাই, তাহলে আমরা সেই দিকগুলোর প্রতি জোর দেব যার দ্বারা বর্তমান ভারতে বিদ্বেষ ও হিংসা ছড়িয়ে পড়েছে। আর যদি আমরা বিশাল ভারতের স্বপ্ন দেখতে আগ্রহী হই, যা অখণ্ড ভারতপন্থীদেরও সন্তুষ্ট করবে, তাহলে তো আমাদেরকে গান্ধী, জিন্নাহ্, মুজিব, এমনকী সাভারকার প্রমুখকেও ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা যেমন হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি নয়, তেমনি মুসলিমও নয়, বা বৌদ্ধ নয়, সেটা হবে খাঁটি ভারতীয় দৃষ্টিকোণ। পিছনের দিকে তাকানো নয়, বরং সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

এই দৃষ্টিকোণটা আদবানী পাকিস্তানে অত্যন্ত সোজাভাবে পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমরা পাকিস্তানকে একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র মনে করি। তিনি এটা না বললে আর কি বলতেন? তিনি কি বলতে পারতেন যে, আমরা পাকিস্তানকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব? সেটা দখল করে নেব? আমরা অখণ্ড ভারত গঠন করব? এগুলো হাস্যকর কথা হত না কি? এর অর্থ এটা কিভাবে হল যে, আদবানী দ্বিজাতি-তত্ত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন? তিনি যদি সেটাই বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দু-মুসলিম দুটো পৃথক পৃথক জাতি তাহলে তো বর্তমান ভারতকেও তো তিনি ভাগ করতে রাজি হয়ে যেতেন। প্রকৃত অর্থে তিনি পাকিস্তানকে স্বাধীন দেশ এই জন্য মেনে নিয়েছেন যে, এটা একটা চরম সত্য কথা। ভবিষ্যতে যদি তার সাথে আমাদের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহলে বিশাল ভারতের স্বাচ্ছন্দ্য ও শক্তি অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।

বর্তমানে ভারতের কোনো পাগল মানুষ কি এটা বলবে যে পাকিস্তানকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও? তাহলে দেশের এক বড় পার্টির নেতার মুখ থেকে এরূপ দায়িত্বহীন মন্তব্য আশা করা তো বোকামি হবে। তবে আদবানী যেটা বলতে পারতেন, সেটা আমি নিজেও বিশ্বাস করি যে, ইরান থেকে বার্মা এবং তিব্বত থেকে মালদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত জনগণ একই। এক বংশোদ্ভূত, এক সংস্কৃতি এ একই চিন্তা-ভাবনার লোক,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একই জাতি। দক্ষিণ এশিয়া 'বহু রাষ্ট্রীয় জাতি' (Multi State Nations)। এটা সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো 'বহু জাতীয় রাষ্ট্র' (Multi Nations State) নয়। সেজন্য অখণ্ড ভারতপন্থীদেরও এখন উপলব্ধি করতে হবে যে, তারা যদি নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত না করেন তাহলে আজ যে ভারতবর্ষ দেখা যাচ্ছে সেটাও তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। এখন আমাদের ভাবনা গান্ধী ও জিন্নাহ্, হিন্দুত্ব ও ইসলাম, একজাতি ও দ্বিজাতি নয়, বরং মূল বিষয় এটাই যে, আজকের দক্ষিণ এশিয়া ও ভারতের ভবিষ্যৎ কী হবে?

বঙ্গানুবাদ : ফায়জুলবাশার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপমহাদেশের বিভক্তির দায়ভার বর্তায় কার ওপর কতটা?

গুলামুল হুসনাইন কাইফ নূগানভী

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ২০-২১ এপ্রিল ১৯৬৮ সালে সাবেক রাজ্যমন্ত্রী এবং সর্বোদয় নেতা আর. কে. প্যাটেলের সভাপতিত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের বিষয় ছিল 'Muslims in India today' (আজকের ভারতে মুসলমান)। এই দু'দিন ব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয় সামাজিক সংগঠনসমূহের কর্তাব্যক্তিগণ, পণ্ডিত, সাংবাদিক, আইনজ্ঞ এবং উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সাবেক আইনমন্ত্রী জনাব ইউসুফ শরীফ, সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বসন্ত সাঠে, মহারাষ্ট্র জনসংঘ সভাপতি সুন্দরলাল রায়, নাগপুর টাইমস সম্পাদক জি. শিউড়ে, অবসর প্রাপ্ত কমিশনার কাজী আবদুল ওহাব, মাওলানা। আবদুল করীম পারেখ, ড. সিরাজ আহমদ (জামায়াতে ইসলামী) প্রমুখ। এর লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের সমস্যা, অভিযোগ এবং তাদের বিরুদ্ধে আরোপিত অপবাদ শোনা এবং জাতীয় সংহতি অর্জনের সম্ভাব্য উপায় সমূহ খতিয়ে দেখা এবং এর সম্ভাব্য পথ অনুসন্ধান করা। অংশগ্রহণকারীরা তাদের মতামত প্রকাশ করেন অত্যন্ত খোলাখুলি। বর্তমান নিবন্ধকারও এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন এই সেমিনারে। যাতে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরোপিত কিছু অভিযোগ ও অপবাদের যোগ্য জবাব দেওয়া হয় এবং মিল্লী সমস্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এখানে ঐ নিবন্ধের নির্বাচিত অংশ তুলে ধরা হয়েছে যেখানে দেশভাগ ও এর দায়ভারের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

স্বাধীনতা আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। এমনকি অবশেষে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। আর মুসলিমরা এতে অংশ নেয় অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা হাসরত মুহানী, ড. আনসারী, মাওলানা আযাদ, হাকীম আজমল খান, ড. সাইয়েদ মাহমুদ, রফী আহমদ কিদওয়ায়ী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ হিন্দু নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। খোদ মুসলিম লীগের অনেক বড় বড় নেতৃবৃন্দ জিন্নাহ্‌র সঙ্গে শামিল ছিলেন কংগ্রেসে। তুরস্কের খিলাফতে উসমানীয়ার সমর্থনে হিন্দু ও মুসলিমরা একত্রে গান্ধীজীর সঙ্গে খিলাফত আন্দোলন সংগঠিত করেন ১৯২০ সালে। এটা এক বড় হিন্দু মুসলিম ঐক্যের দৃষ্টান্ত।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু কংগ্রেসের কিছু সংকীর্ণমনা ও সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মুসলিমদের ক্ষোভ জমতে শুরু করে। কংগ্রেসের বাইরেও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে। অবস্থা এমন পর্যায়ে যায় যে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস যখন প্রাদেশিক রাজ্যসভা গঠন করে তখন মুসলিমদের প্রতি না-ইনসাফী ও বঞ্চনা করা হয়। যার কারণে মুসলিমদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে এখন থেকেই যখন এই অবস্থা তখন আগামী সংযুক্ত ভারতে হিন্দু নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে কি এমন ইনসাফের প্রত্যাশা করা যেতে পারে? কংগ্রেসের প্রতি মুসলিমদের অসন্তোষ ও পার্থক্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও তাদের সঙ্গী-সাথীরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন আগেই। মাওলানা আযাদ তার বিখ্যাত 'INDIA WINS FREEDOM' (ভারত স্বাধীন হল) গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বলেছেন, কিভাবে কংগ্রেসের কিছু নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষভাবে পণ্ডিত নেহরুর ভুলত্রুটির কারণে মুসলিম লীগের শক্তিবৃদ্ধি হয় এবং শেষ পর্যন্ত দেশ ভাগ হয়। আজ মুসলিমদের প্রতি সবচেয়ে বড় এবং সঙ্গীন অভিযোগ আরোপ করা হয় যে তারা দেশভাগের জন্য দায়ী এবং তাদের এ অপরাধ ক্ষমা করা যায় না কোনমতেই।

প্রকৃত কি দেশভাগকে অপরাধ বলা যেতে পারে ? যদি ধরেও নেওয়া যায় যে দেশভাগ একটি অপরাধের মধ্যে পড়ে তাহলে কি এরজন্য কেবল মুসলিমরাই দায়ী? এতে কি কংগ্রেসের ঐসব নেতৃবৃন্দের কোন দায় নেই যারা সংকীর্ণ মানসিকতা প্রদর্শন করেন এবং তাদের অযৌক্তিক আচরণের মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য যাবতীয় রাস্তা রুদ্ধ করে দেন এবং অবশেষে দেশভাগ মজুর করে দেন খুশির সঙ্গে। বিগত দিনে দিল্লীর একটি দৈনিকে সাক্ষাৎকার দিয়ে আচার্য কৃপালিনী স্বীকার করেন যে, "দেশভাগের জন্য দায়ী কেবল জিন্নাহ্ই ছিলেন না, বরং জওহরলাল নেহরু, সরদার প্যাটেল, ড. রাজিন্দর প্রসাদ এবং আমরা সকলেই এর জন্য দায়ী।" যদি বাস্তবিকভাবে মুসলিমদের সম্পূর্ণ এই আশ্বাস দেওয়া হত যে সংযুক্ত ভারতে তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং ভাষা ইত্যাদি তাদের নিজস্ব বৈশিষ্টসহ সংরক্ষিত হবে তাহলে তারা বিভক্তির ওপর জোর দিত না। মাওলানা আযাদের প্রামাণ্য গ্রন্থ "ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম"-এ এর বিস্তারিত প্রমাণ রয়েছে। প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী ড. জাহিদ হুসাইন তার হিন্দুস্তানী মুসলমান : 'আয়নায়ে আইয়াম মে' গ্রন্থে লিখেছেন যে দেশভাগের দাবি একটি রাজনৈতিক ভুল ছিল যাকে অপরাধ বলা যেতে পারে না। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন হিন্দু চিন্তাবিদ ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মতামত শোনা যাক।

'ভারতে ইংরেজ রাজ'-এর গ্রন্থকার এবং বিখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা পণ্ডিত সুন্দরলাল 'who is responsible for the partition of India' (ভারত ভাগের জন্য দায়ী কে?) শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন যে, দেশভাগের প্রস্তাব সর্বপ্রথম

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৯২৬ সালে কংগ্রেস নেতা লালা রাজপত রায় দেন গোরখপুরে তার একটি ভাষণে। এর বিরোধিতা করেন মুসলিম নেতৃবৃন্দ। এই নিবন্ধে পণ্ডিত সুন্দরলাল লেখেন, "It may sound strange to many, many may not even believe it that Mr. Jinnah was not in favour of partition and that partition was thrust upon him." [Radiance : Independence special. 15.08.1967] অনুবাদ : 'অনেকে গভীর বিস্মিত হবেন, এমনকি অনেকে বিশ্বাস পর্যন্ত করতে পারবেন না যে, মি. জিন্নাহ্ দেশভাগের পক্ষে ছিলেন না, দেশভাগ চাপিয়ে। দেওয়া হয়েছে তাঁর ওপর।

উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মি. চরণ সিংহ তার একটি বক্তৃতায় বলেন, "You hold Muslims responsible for the creation of Pakistan, but in fact Muslims are not so much to be blamed as you Hindus are. The virus of caste system has deeply taken root in you. When Muslims found that you practice untouchability with your own Hindus bretheren, hold them in contempt and can not do justice to your own people, they started apprehending that you will not do them justice after attaining independence. It was your unjust behaviour which was responsible for the creation of Pakistan' [Radiance. Delhi, 03.03.1968]

অনুবাদ : 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য আপনারা মুসলিমদের দায়ী করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের চেয়ে আপনাদের হিন্দুদের ওপর এ দায় বেশি করে বর্তায়। জাতপাতের অভিশাপ গেড়ে আছে আপনাদের মধ্যে গভীরভাবে। যখন মুসলিমরা দেখল যে, আপনারা নিজেদের হিন্দু ভাইদের সঙ্গেই অস্পৃশ্য আচরণ করেন, তাদেরকে ঘৃণা করেন, স্বজনদের প্রতিও ইনসাফ সৃষ্টি হয় যে স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পরে আপনারা ইনসাফ করবেন না তাদের (মুসলিমদের) প্রতিও। এটা ছিল আপনাদের অসৎ আচরণ, আর এটাই ছিল পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য দায়ী। (রেডিয়েন্স ভিউজউইকলি, দিল্লী, ০৩.০৩.১৯৬৮)।

প্রখ্যাত আইন বিশারদ, শিক্ষাবিদ এবং দেশপ্রেমিক চমনলাল সিতলবাদ লেখেন, 'The real percentage of Pakistan must be traced to the congress who, by the way they handled the communal problem and by their behaviour when they were in power, created great distrust in the mind of Muslim community. There is the tragic perversity which the congress displayed when they dealt unjustly with the muslim community and

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

made them hostile.' তরজমা : 'পাকিস্তানের জন্মের আসল সম্পর্ক কংগ্রেসের সঙ্গে। কংগ্রেস যেভাবে সাম্প্রদায়িক বিষয় পরিচালনা করেছে, যখন ক্ষমতায় এসেছে তখন তারা। যেমন আচরণ করেছে, তাতে মুসলিমদের মনে গভীর অনাস্থার সৃষ্টি করে। ১৯৩৫-এর এ্যাক্টের অধীনে যখন কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হয় তখন তারা দুঃখজনক হটধর্মীতা প্রদর্শন করে। তারা মুসলিমদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে এবং তাদেরকে শত্রুভাবাপন্ন করে তোলেন।'

এসব উদ্ধৃতি থেকে এটা প্রমাণিত হয় না কি যে দেশভাগের দায়ভার মুসলিমদের চেয়ে হিন্দুদের ওপর বর্তায় বেশি করে। তাহলে দেশ বিভক্তির জন্য মুসলিমদের দায়ী কেন করা হয় এককভাবে?

আজ যেভাবে দেশভাগের জন্য মুসলিমদের অপরাধী আখ্যা দিয়ে সাজা দেওয়া হচ্ছে, একই অভিযোগ যদি পাকিস্তানী হিন্দুদের প্রতি লাগানো হয় যে, তারা মুসলিম লীগের দাবি পাকিস্তানের বিরোধিতা করে এবং কংগ্রেসকে সমর্থন করে অপরাধ করেছে এবং এর শাস্তি তাদেরকে এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিতে হবে তাহলে একথা কি সঠিক হবে? বাস্তব কথা হল, যেভাবে ভারতীয় মুসলিমদের অপরাধী বলা সত্যের অপলাপ তেমনি পাকিস্তানী হিন্দুদের অভিযুক্ত করা অবিচারের নামান্তর।

আর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, ভারতীয় সীমান্ত হ্রাসবৃদ্ধি হতে থেকেছে। এক সময়ে বৃটিশ ভারতে বার্মা, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, আদনও ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা বার্মা ও সিলং বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ভারত থেকে। এই বিভক্তি আমরা কেন মেনে নিয়েছি ঠাণ্ডা মাথায়? কেন আমরা বৌদ্ধদের এর শাস্তি দিইনি? তেমনি অন্য কিছু এলাকা আমাদের এবং অন্যান্যদের ভুলত্রুটির জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটা এতবড় অপরাধ হতে পারে কি করে? যার শাস্তি দেওয়া হচ্ছে একের পর এক প্রজন্মকে।

ভাষান্তর : আবু রিদা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভারত বিভক্তির দায় কার?

এম. এ. বারী খান

বোকারো স্টিল সিটি * ঝাড়খণ্ড

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক আত্মিরতার পারদ চড়তে শুরু করে। রাজনৈতিক পার্টিসমূহ বিভক্ত হতে শুরু করে এবং মানুষের মধ্যে এ বাসনা দানা বাঁধতে শুরু করে যে তারা নিজেদের আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থা সংস্কারের কাজে লেগে পড়ে যাতে পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন ও উন্নত জাতির সমপর্যায়ে উন্নীত হতে পারে।

ভারতে বঙ্গদেশ ছিল একটি বড় রাজ্য এবং ইংরেজ সরকারের রাজধানীও ছিল এখানেই। এই রাজ্যে মুসলিম ছিল পঞ্চাশ শতাংশেরও অনেক বেশি। কিন্তু নানান কারণে শিক্ষাগত, আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারে তারা ছিল অনেক পিছিয়ে। পাবলিক লাইফ অথবা সরকারি চাকরি-বাকরিতে তাদের অস্তিত্ব ছিল নিতান্তই নগণ্য। হিন্দু রাজা মহারাজা এবং জমিদার গোষ্ঠী মুসলিমদেরকে সর্বস্বান্ত করে তুলছিল এবং তাদেরকে ক্রীতদাসের পর্যায়ে রেখে দিতে চাইত। হিন্দু সংখ্যালঘুরা—যারা আর্থিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে মুসলিমদের চেয়ে ছিল অনেক অগ্রগণ্য—মুসলিমদের কল্যাণ ও উন্নতির দিকে নজর দিত না আদৌ।

এই অবস্থায় মুসলিমরা তাদের আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য বৃটিশ সরকারের কাছে আবেদন করে যে তারা যেন বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে পৃথক করে দেয়, যাতে মুসলিমরা স্বয়ং তাদের আর্থিক, শিক্ষাগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে এবং তাদের স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট বজায় রাখতে পারে। কারণ সংখ্যায় ৫০ শতাংশের বেশি হয়েও সরকারি কর্মসংস্থান, পৌরসভা ও অন্যান্য স্থানে তাদের অস্তিত্ব ছিল যৎসামান্যই। এজন্য বৃটিশ সরকার ১৯০৫ সালে মুসলিমদের এই বৈধ দাবি মেনে নেয় এবং বাংলা ও আসামের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় বিভক্ত করে দেয়। এই বিভাজন ফলে মুসলিমদের মধ্যে খুশির লহর বয়ে যায়। কিন্তু অমুসলিমদের কাছে এটা ছিল অপছন্দনীয় এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে।

পূর্ববঙ্গ ও আসামের কিছু অংশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। সেখানকার হিন্দুরা এসব এলাকায় সংখ্যালঘু হয়ে থাকতে চায়নি। আর এজন্য তারা [illegible]

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেয় এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। প্রথম প্রথম এ হাঙ্গামা সীমাবদ্ধ ছিল বাংলাতেই। কিন্তু ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে দেশের অন্যান্য অংশে। সুরীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত ব্যক্তিরাও হিন্দু জমিদারদের পক্ষ নেন এবং বিভক্তির বিরুদ্ধে চালান জোরদার অভিযান। বিভক্তির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন ছোট ছোট কবিতা, যাতে শিশু ও যুবকরা গলি-গলিতে গাইতে পারে এবং কণ্ঠস্বর উচ্চকিত করতে পারে বিভক্তির বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কলকাতায় প্রোটেস্ট মার্চের (Protest March) নেতৃত্ব দেন।

এই পরিস্থিতির মূল্যায়নের জন্য ১৯০৬ সালে ঢাকায় নবাব জনাব সলীমুল্লাহ খান মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের এক কনফারেন্স আহ্বান করেন ঢাকায়, যাতে বাংলা-ভাগ ও এর প্রভাবের প্রতি বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। এই কনফানেরন্সে স্যার আগা খান, জনাব আলী মুহাম্মদ খান (মাহমুদাবাদের নবাব), মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, শওকত আলী, মাওলানা মাযহারুল হক, ইমাম ব্রাদার্স প্রমুখ হাজির ছিলেন। কনফারেন্সে সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে মুসলিমদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত দূরবস্থার অবসানের জন্য একটি আঞ্জুমান' (সংস্থা) কায়েম করা হোক। এই প্রস্তাবের অধীনে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' নামে একটি আঞ্জুমান গঠন করা হয় ১৯০৬ সালে। এটাই রাজনৈতিক পার্টির রূপ পরিগ্রহণ করে পরবর্তীকালে।

এই আর্থিক, শিক্ষাগত, রাজনৈতিক এবং সামাজিক দূরবস্থা নিরসনের জন্য ১৯০৬ সালে একটি মুসলিম প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন ভাইসরয় কার্জনের সঙ্গে সিমলায় এবং মুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণের রক্ষাকবচ হিসাবে 'পৃথক নির্বাচনী এলাকা' দাবি করেন। বৃটিশ সরকার এ দাবিকেও সঙ্গত মনে করে মেনে নেন। এভাবে জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলিমদের জন্য অহিনসভা, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, পুরসভা ও সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব মঞ্জুর করেন।

এদিকে বাংলাভাগের বিষয়টি আস্তে আস্তে যখন দেশজোড়া আন্দোলনে পরিণত হতে লাগে তখন বৃটিশ সরকার বাধ্য হয়ে বাংলাভাগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেন ১৯০৬ সালে। যার ফলে হিন্দুদের আন্দোলনের তো অবসান ঘটে। কিন্তু অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে গভীর হতাশার সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে এ বিশ্বাস গভীরতর হয়ে ওঠে যে হিন্দুরা মুসলিমদের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক .এবং তারা কখনও মুসলিমদের খুশহাল অবস্থা মেনে নিতে চায় না। মুসলিমদের মধ্যে এ বিশ্বাসও অটুট হয় যে, ব্রিটিশ সরকার হিন্দু সংখ্যাগুরুর চাপে মস্তক অবনত করে এবং এভাবে ইনসাফের খুন হয়। আর এভাবে দু'ধর্মের মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয় তা পরবর্তীকালের শত চেষ্টা সত্ত্বেও সমাধান হয়নি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, সেই একই সময়কালে চলে আর একটি আন্দোলন যার। লক্ষ্য ছিল বাঙালীদের শাসনক্ষমতা থেকে মুক্ত হতে বিহারকে একটি পৃথক রাজ্য বানানো যাতে বিহারের বাসিন্দাদের শিক্ষাগত, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটতে পারে। অবশেষে বিহার একটি পৃথক রাজ্যের মর্যাদা পায় ১৯০৮ সালে। কিন্তু এই বিভক্তির বিরুদ্ধে তো বাংলায় কোন আন্দোলন সংগঠিত হয় না, কোন হাঙ্গামা হয় দেশের কোন অংশে।

কোন দেশের বা ভূখণ্ডের আর্থিক সাম্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সত্যকে মি. গোখলে ব্যক্ত করেছেন খুবই স্পষ্ট ভাষায়। সংযুক্ত জাতীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথক নির্বাচনী অধিকার ভালো না লাগতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে ভারতীয় নির্বাচকদের মানসিকতাও উপেক্ষা করা যেতে পারে না। তিনি এর বাস্তব দৃষ্টিকোণ খুব ভালোভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে : 'কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনাবলী ছাড়া পৌরসভা, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, আইনসভার প্রতিনিধিত্বের দিকে লক্ষ্য করলে কোথাও মুসলিমদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। এজন্য যে কোনরকম দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছাড়াই মুসলিম এবং হিন্দু উভয়ে প্রার্থী হন। কিন্তু দেখা যায় যে, জনগণ ব্যক্তিগত যোগ্যতা, ত্যাগ ও কুরবানীকে বিচার্য বিষয় হিসাবে গণ্য করে না এবং হিন্দু ভোট দেয় হিন্দুকে আর মুসলমান মুসলমানকে। পরিণতিস্বরূপ, মুসলিম সংখ্যালঘু এলাকায় মুসলিম প্রতিনিধির অস্তিত্বই টের পাওয়া যায় না। এমনকি মাওলানা মাযহারুল হকও—যার খিদমত দেশ ও কংগ্রেসের জন্য ছিল দৃষ্টান্তহীন এবং যিনি মনপ্রাণ ও জানমাল মাতৃভূমির জন্য উৎসর্গ করেন—১৯২৬ সালে আইনসভার নির্বাচনে হিন্দু প্রার্থীর মুকাবিলায় জয়ী হতে পারেননি এবং অবশেষে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যান রাজনীতি থেকে।

একইভাবে মি. সি. আর. দাস ছিলেন গভীর বাস্তববোধের অধিকারী। তিনি অতি দ্রুত উপলব্ধি করেন যে, সমস্যা প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থানগত। তিনি উপলব্ধি করেন যে, মুসলিমদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানগত জরুরী সংরক্ষণ যদি না দেওয়া যায় তাহলে তাদের কাছ থেকে এ প্রত্যাশা করা যায় না যে তারা কংগ্রেসের সঙ্গে থাকবে মনেপ্রাণে। এজন্য তিনি একটি ঘোষণা দেন যার দরুন শুধু বাংলা নয় গোটা ভারত বিস্মিত হয়। তার ঘোষণা ছিল যে, বাংলায় যখন কংগ্রেসের হাতে শাসনক্ষমতার লাগাম আসবে তখন যতদিন পর্যন্ত মুসলিমরা তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে যথার্থ প্রতিনিধিত্ব অর্জন করতে না পারে (ততদিন পর্যন্ত) তামাম নতুন নিযুক্তিতে ৬০ শতাংশ মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কলকাতা কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা বেড়ে যায় আরো এবং এই শর্তানুযায়ী ৮০ শতাংশ নিযুক্তির সংরক্ষণের প্রস্তাব দেন। তিনি এ বিষয়টির ব্যাখ্যা দেন এভাবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পাবলিক লাইফ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব যথার্থ না

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। একবার এই বৈষম্যের অবসান ঘটলে মুসলিমরা সমনাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্য হয়ে উঠবে, আর তখন কোন বিশেষ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। তিনি অবশেষে বাংলা কংগ্রেস কমিটিকে এ প্রস্তাব মানতে রাজী করান।

আর এস এস, ভি এইচ পি এবং বজরঙ দল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌কে পাকিস্তান-স্রষ্টা প্রতিপন্ন করে লালকৃষ্ণ আদবানীকে তিরস্কার করতে থাকে যে তিনি কেন জিন্নাহ্‌র মাযারে যান এবং কেন তাকে সেকুলায় নেতা বলেন? তাদের মতে, জিন্নাহ্ দ্বিজাতি তত্ত্বের সমর্থক এবং পাকিস্তান-স্রষ্টা। বস্তুত তারা এই অপ্রত্যাখিত সত্যকে ধামা চাপা দেয় এবং এ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয় যে, দ্বিজাতি তত্ত্ব সর্বপ্রথম ভি. ডি. সাভারকার ১৯২৩ সালে তার। 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থে উত্থাপন করেন। তার এই বই আজও পাওয়া যায় গ্রন্থাগার ও পুস্তকের দোকানে। সাভারকারই ১৯৩৮ সালে হিন্দু মহাসভার উদ্দেশে তার সভাপতির ভাষণে দ্বিজাতি তত্ত্বের (Two Nation Theory) ওপর জোর দেন এবং বলেন যে, ভারতকে অখণ্ড (United) এবং একজাতিক (Hemogenous) দেশ বলা যেতে পারে না। বরং এখানে দুটি জাতি রয়েছে। একটি হিন্দু এবং অপরটি মুসলমান। হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা ড. সঞ্জয়, আর্য সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও ভাই প্রমানন্দ এবং বেনারস হিন্দু ইউনির্ভাসিটির প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ছিলেন দ্বিজাতি তত্ত্ব মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য। পাঞ্জাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নেতা লালা রাজপত রায় কেবলমাত্র দ্বিজাতি তত্ত্বকে সমর্থনই করেননি বরং ১৯৩০ সালে দেশকে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার মতবাদও পেশ করেন। ১৯৩৯ সালে আর এস এসের প্রধান এম. এস. গোলওয়ালকর তার 'We or our nationhood defined' লেখায় বলেন, যারা হিন্দু নয় তারা হিন্দু সভ্যতা, ভাষা ও হিন্দু ধর্মকে সম্মান করতে শিখুক এবং হিন্দু জাতি ও কৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে শিখুক, তারা তাদের পৃথক পরিচয় ও অস্তিত্ব ভুলে যাক, এবং হিন্দু জাতীয়তায় বিলীন হয়ে যাক এবং কোনরকমের স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে যাক। এমনকি ভারতীয় নাগরিকত্বের অধিকার পর্যন্ত ভুলে যাক। অর্থাৎ মুসলিমদের যদি ভারতে থাকতে হয় তাহলে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে থাকতে হবে।

ভারত বিভক্তি প্রসঙ্গে দৃঢ়ভাবে একথা বলা যেতে পারে না যে এর দায় মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ওপর বর্তায় অথবা পণ্ডিত জওহর লাল নেহরুর ঐ উক্তিতে, 'আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, স্বাধীনতার পরে যা মন চায় তাই করব।' কিন্তু দৃঢ়ভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে অবশ্যই একথা বলা যেতে পারে যে এই বিভক্তির পিছনে দায়ী ঐ নিন্দনীয় মস্তিষ্ক যারা কৃত্রিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার অজুহাতে জনগণের কণ্ঠরোধ করে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে চলেছে এবং সংখ্যালঘু, দুর্বল এবং অনগ্রসর শ্রেণির

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাছে প্রকৃতসত্য আড়াল করে, মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে, গণতন্ত্রের নামে সরকারি সিংহাসনে বসতে লালায়িত।

শত প্রশ্নের পরেও এ ধারণা পোষণ করতে আমরা বাধ্য যে ভারতে সংখ্যাগুরুরা যদি ১৯০৫ সালে বাংলাভাগের বিরুদ্ধে গর্জে না উঠত তাহলে সম্ভবতঃ ভারতবিভক্তি বাস্তবায়িত হত না। বাংলাভাগ রদের চল্লিশ বছরও কাটেনি, এমন সময়ে কেবলমাত্র বাংলা ও আসামের বিভক্তিই বাস্তবায়িত হয়নি বরং পাঞ্জাবও বিভক্ত হয়। এছাড়াও সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রাজ্য এবং গুজরাতেরও কিছু অংশ বেরিয়ে যায়। যা জন্ম দেয় 'পাকিস্তান' নামক এক নতুন রাষ্ট্রের।

ভাষান্তর : আবু রিদা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আদবানী, জিন্নাহ্ এবং ভারতীয় মুসলমান

মাওলানা মুহাম্মদ ইসরারুল হক কাসেমী

পাকিস্তানের কায়েদ-ই-আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সম্পর্কে বিজেপি সভাপতি লালকৃষ্ণ আদবানীর বিবৃতি ও মনোভাব সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিতেও অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে। তবে একটা বিষয় এখনও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। বিজেপি বা তার মূল সহযোগী সম্পর্কে যদি কেউ মনে করে যে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন এসে যাবে বা আসতে পারে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, সে মূর্খদের স্বর্গে বাস করছে। এক দশকের বেশি সময় ধরে বিজেপির মূল লক্ষ্য হল যে কোনোভাবে ক্ষমতা দখল করা। বাহ্যিকভাবে যদি তার চালচলন ও কাজকর্মে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাহলে সেটা ক্ষমতা হাসিলের জন্যই, তার বেশি কিছু নয়।

মূল কথা হল যে, এইসব বিপজ্জনক মতাদর্শ ও চিন্তাধারাই তো আদবানীর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য অমৃতস্বরূপ, যেদিন প্রকৃত অর্থে তারা এগুলো পরিত্যাগ করবে, সেদিন তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। এই কথাটি তিনি নিজে জানেন, তার দল এবং আর.এস.এস. খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করে। তবে বিজেপি সেজন্য অন্য একটা চেহারা তৈরি করে নিয়েছে। নরেন্দ্র মোদী নামে অপর এক আদবানী তাদের কাছে রয়েছে। তবে রাজনৈতিকভাবে তার প্রসার অনেক কম। আর.এস.এস. অনেকবার চেষ্টা করেছে যে, বয়স্কদের পরিবর্তে নতুন প্রজন্ম বা গরম রক্তের হাতে বিজেপির দায়িত্ব অর্পণ করা হোক। সেই উদ্দেশ্যে আর.এস.এস. উমা ভারতীকে আগে বাড়ানোর চেষ্টা করেছে। তবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও অন্যান্যরা নরেন্দ্র মোদীর উপর দায়িত্ব অর্পণ করতে চাপ সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে আদবানী লাভবান হয়েছে। ভি.এইচ.-র তীব্র প্রতিক্রিয়ার প্রতিবাদে আদবানীর ইস্তফা দেওয়া থেকেও সেটা প্রমাণিত হয়ে যায়।

বিজেপি যে এন.ডি.এ-র কাঁধে ভর দিয়ে প্রায় ছয় বছর দেশ শাসন করেছে, জনগণ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিজেপি সেই জোটের নামটুকুও যে কোনোভাবে ধরে রাখতে চাইছে, কারণ তারা যেরূপ বিপজ্জনক মতাদর্শ নিয়ে রাজনীতি করেন, তাতে তারা কখনও ক্ষমতায় আসতে পারবে না। ভারতের বেশির ভাগ লোক হিংসাত্মক ও ন্যাক্কারজনক রাজনীতির বিরোধী বলেই এন.ডি.এ. সরকারের পতনে মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, অন্যথায় হয়তো আদবানী

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রধানমন্ত্রী হতেন। যাই হোক, জিন্নাহ্‌কে ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যায়িত করার পর এন.ডি.এ.-র কিছু শরীক আদবানীকে ভূয়শী প্রশংসা করেন। ভারতের সেইসব মুসলিম ভোটদাতাদের সন্তুষ্ট করাই মূল উদ্দেশ্য যারা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বিজেপি ও সহযোগীদের পরিবর্তে অন্য দলগুলোকে ভোট দেয়। এই অবস্থাতে নীতিশকুমার ও শাবদ যাদব প্রমুখ ফায়দা তুলতে চাইছেন, কিন্তু এটাই কি আসল পরিস্থিতি? জিন্নাহ্‌কে ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যা দেওয়ার জন্য মুসলমানরা কি আদবানীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে?

প্রকৃত ঘটনা কিন্তু আদৌ সেটা নয়। ভারতীয় মুসলমানরা তো আদবানীকে ধর্মনিরপেক্ষ দেখতে চেয়েছিল, জিন্নাহ্‌র ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া না-হওয়া নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। জনগণের প্রয়োজনে রাজনৈতিক মতাদর্শে পরিবর্তন আনা যায়, কিন্তু ধর্ম, বর্ণ ও বংশের ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। মুসলমানরা ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক মনে করে না, তেমনি বাস্তব জীবনে দুটোকে একসাথে মিশিয়ে ফেলে না। নতুবা মনমোহন সিং, লালুপ্রসাদ যাদব ও মুলায়ম সিং প্রমুখ আমাদের নেতা হতেন না।

আদবানী ও তাঁর দল সবসময় অভিযোগ করে থাকে যে, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো মুসলমানদের শুধু মৌখিক আশ্বাস বা উৎকোচ দিয়ে থাকে। এখন তাকেই প্রশ্ন করা যায় যে, জিন্নাহ্‌কে ধর্মনিরপেক্ষ অভিহিত করে তিনি কাদের উৎকোচ দিতে চাইছেন? যারা আদবানীর এই সাহসিকতার জন্য প্রশংসা করছেন, তাদের কাছেও প্রশ্ন রাখা যায় যে, তারা কিসের ভিত্তিতে আদবানীর প্রশংসা করছেন। এই আদবানীই তো ১৯৯২ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সমগ্র ভারতীয় মুসলমানদের সরাসরি নিন্দা-ভর্ৎসনা করেছিলেন।

বিজেপি-র অনেক নেতা দেশভাগের জন্য ভারতীয় মুসলমানদের নিন্দা ও গালি দিয়ে থাকেন। আদবানীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শিবসেনা প্রধান তো ভারতীয় মুসলমানদের পাকিস্তানপন্থী ও গাদ্দার বলে থাকেন। নরেন্দ্র মোদী পাকিস্তানের ও 'মিঁয়া মুশাররফে'র নামে ভারতীয় মুসলিমদের উপহাস করে থাকেন। তবে মোদী ও তাঁর পূর্বপুরুষ মুশাররফকে নিন্দা করুক বা পাকিস্তানী নেতাদের গালাগালি দিক তাতে ভারতীয় মুসলমানদের কিছু এসে যায় না।

জিন্নাহ্‌কে সাম্প্রদায়িক বলা হোক বা ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যা দেওয়া হোক, সেটা বড় কথা নয়। তবে বিজেপি ও সমগোত্রীয় অন্যান্য দলগুলোকে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ও তাদের কার্যকলাপের আলোকে পরখ করতে হবে। মুসলিমরা এইরূপ দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ রূপধারী দলগুলোকে সমর্থন করে থাকেন। তারা জানে যে, তাদের নাগরিক সমস্যাবলী সমাধান বিষয়ে কোনো দলই

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আন্তরিক নয়। আদবানী কর্তৃক মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌কে ধর্মনিরপেক্ষ অভিহিত করলেই মুসলিমরা আদবানীর প্রতি সদয় ও নরম হয়ে পড়বে এরূপ ভাবনা নিঃসন্দেহে মুসলমানদের অপমান করার শামিল।

জিন্নাহ্‌ ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন অথবা সাম্প্রদায়িক ছিলেন সে-আলোচনা আজ একেবারেই অর্থহীন। যে পরিস্থিতিতে দেশভাগ হয়েছিল সে-আলোচনা করেও কিছু পাওয়া যাবে না। আদবানী যদি সত্যিই নিজের রূপ সংশোধন করতে চাইতেন, তাহলে সর্বপ্রথম তাকে গুজরাতের গণহত্যার জন্য নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে দায়ি করে নিন্দা করতে হত। বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর অবশ্য তার প্রথম প্রতিক্রিয়া এটাই ছিল যে, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখময় দিন। তবে মূল প্রশ্ন হল যে, সেই দিনকে সম্ভব করে তুলেছে কে? এই দুঃখময় দিনের জন্য ভূমি প্রস্তুত করেছিল কে?

পাকিস্তানে একটা মন্দিরের ভিত্তিপত্তন করে তিনি অত্যন্ত আবেগ-বিহ্বল হয়ে পড়েন। প্রশস্তিতে এতদূর এগিয়ে যান যে, জিন্নাহ্‌কে ধর্মনিরপেক্ষ অভিহিত করেন। অথচ এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিনি জেনারেল মুশার্‌রফ ও তাঁর সরকারকে ধর্মনিরপেক্ষ বলতে পারতেন। অথচ সাংবাদিকরা যখন তাকে প্রশ্ন করলেন যে, তিনি ভারতে ফিরে বাবরী মসজিদ পুনর্নির্মাণ করবেন কি? তখনই তিনি উত্তর দিলেন যে, সেদিনটা তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখময় দিন ছিল। কথায় ও কাজে দ্বিচারিতা গোপন থাকল না। যদি পাকিস্তানে মন্দির সংরক্ষণ ও পুনর্নির্মাণে তিনি এমনই প্রভাবিত হয়ে থাকেন এবং ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ এর ঘটনার জন্য তার এতই দুঃখ ছিল, তাহলে তাকে সাহসিকতাপূর্ণ বিবৃতি দিতে হত যে, বাবরী মসজিদের পুনর্নির্মাণ করা হবে। সেটা তিনি তখনই বলতে পারতেন, যখন তিনি বুনিয়াদী মতাদর্শ ও চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করে তওবা করতেন। এমনটি কখনও হয়নি এবং আদৌ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

তরজামা : ফায়জুলবাশার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেশভাগের জন্য ইসলামকে দায়ী করা এক মারাত্মক অভিসন্ধি

গুলামুল হুসনাইন কাইফ নূগানভী * মহারাষ্ট্র

একজন তথাকথিত অমুসলিম পণ্ডিত উপমহাদেশ বিভাজনের জন্য ইসলাম ধর্মকেই দায়ী করেছেন এবং ইসলামকে বিভাজনকারী ও বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী ধর্মরূপে উল্লেখ করেছেন। সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রসুলুল্লাহ (স.)-এর পূতপবিত্র জীবনকে বিকৃতরূপে পেশ করেছেন। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, ইসলামের প্রতি অভিযোগ সেইসব ব্যক্তিরা আরোপ করছেন যারা চার হাজার বছর ধরে এই উপমহাদেশের মানবসমাজকে জাত-পাত, উচু-নিচু, ইতর-ভদ্র, উচ্চশ্রেণি ও নিম্নশ্রেণিতে বিভক্ত করে রেখেছে। উঁচুজাতের লোকেরা নিচুজাতের লোকেদের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসন করেই এসেছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্ম সমগ্র মানবজাতিকে বংশ, বর্ণ ও স্থান নির্বিশেষে, একখোদার বান্দাহ ও এক আদমের সন্তান অভিহিত করে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে, ইসলাম তো মানবজাতিকে একখোদার পরিবাররূপে আখ্যায়িত করেছে। ইসলাম তো বংশ-বর্ণ, ভাষা-ভূমি, উচ্চ-নীচের পার্থক্যের ভিত্তিতে মানবকে বিভাজিত করে না , বরং ঐক্যবদ্ধ করে।

ইসলাম বংশাভিমান, জাত্যভিমান ও স্বদেশাভিমানের সমর্থক নয়। ইসলাম তো খোদাপূজারী, সত্যপূজারী, মানবপ্রেমী, শান্তি-সাম্য ও ন্যায়বিচারের শিক্ষাদান করে থাকে। মুসলমান ও ইসলামের আগমনের আগে উপমহাদেশ শত শত টুকরোতে বিভক্ত ছিল। এই দেশ কুফর ও শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল এবং মানবতা, বংশকৌলিন্য, জাত-পাত, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের অবিচার ও অত্যাচারমূলক নিয়মের শিকার ছিল। দক্ষিণে আরব বণিক ও উত্তরে সূফীগণ, উলামাগণ ইসলামের সেইবাণী পেশ করেছিল যা মানুষকে সততা ও সাম্যের বন্ধনে গ্রথিত করেছিল এবং লক্ষ লক্ষ সত্যপিপাসু, অত্যাচারিত মানুষ সেটাকে কবুল করেছিল। উচ্চশ্রেণির কিছু লোকও ইসলাম কবুল করেছিল। আরব বণিকদের আখলাক, কৃতিত্ব ও তাদের দাওয়াত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মালাবারের রাজা চিরামন পেরুমল সামুত্রী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইসলামের তাবলীগ ও প্রচার করেছিলেন। একটা মসজিদও নির্মাণ করিয়েছিলেন, যেটা আজও চিরামন জামে মসজিদরূপে বিখ্যাত। ভারতের রাষ্ট্রপতি এ. পি. জে. আব্দুল কালাম কেরালা সফরের সময় সেই মসজিদে নামায আদায় করেছিলেন। রাজা পেরুমল হজ সমাপনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গিয়েছিলেন, প্রত্যাবর্তনের সময় সফরে তার ইন্তেকাল হয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলমান বাদশাহরা উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে সাত'শ বছর ধরে রাজত্ব করেছেন। তারা আদর্শ ইসলামী শাসক তো ছিলেন না, কিন্তু ইসলামী শিক্ষার প্রভাবে তারা প্রজাদের সাথে সহমর্মিতা ও ন্যায়বিচার করেছিলেন। হিন্দুদের জন্য তাদের ধর্মশাস্ত্র কার্যকর ছিল। কখনও তাদের উপর ইসলামী শরীয়ত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় নি। শত শত খণ্ডে বিভক্ত উপমহাদেশকে মুসলিম শাসকরাই রাজনৈতিক ঐক্যের রূপ দিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, আফগানিস্তান যার একটা রাজ্য ছিল এবং একজন হিন্দু রাজপুতকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। পঞ্চাশ বছর ধরে আওরঙ্গজেব এই বিশাল ও বিস্তৃত সাম্রাজ্য সফলভাবে শাসন করেছিলেন, যার বৈশিষ্ট্যই ছিল, শান্তি, ইনসাফ ও সহমর্মিতা। নিরপেক্ষ অমুসলিম ঐতিহাসিকরাও সেই সত্যতা স্বীকার করেছেন।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ "মৌলবাদী কট্টর মুসলমান" ছিলেন না। তিনি স্বাধীনচেতা সেকুলার মুসলমান ছিলেন। তার বাহ্যিকরূপরেখা, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা ও জীবনযাত্রা সবই পাশ্চাত্য ভাবধারায় ছিল। তিনি উর্দু-আরবী তেমন জানতেন না। তিনি নামায রোজার ধার ধারতেন না। একজন অমুসলিম মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। মুসলিম লীগও ধর্মীয় নয়, বরং খাঁটি রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী সংগঠন ছিল। দু-তিন বড়–বড় উলামাই এর সঙ্গে ছিলেন— দেওবন্দী আলেমদের ব্যাপক অংশ কংগ্রেসের সাথে ছিলেন। জমিয়তে উলামা কংগ্রেসের সাথে ছিলেন। জিন্নাহ্ সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, বরং তিনি খাঁটি সেকুলার, পাকা ন্যাশনালিস্ট। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান ধারণার বিরোধী ছিলেন। উচ্চপর্যায়ের কংগ্রেস নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয় জিন্নাহ্কে 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি অভিহিত করেছিলেন এবং তার দেশপ্রেম ও সেকুলার কৃতীত্বের প্রশংসা করেছিলেন। বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেত্রী সরোজিনী নাইডু জিন্নাহ্কে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দূত বলেছিলেন। আর.এন.আগরবাল তার বিখ্যাত "দি ন্যাশনাল মুভমেন্ট" গ্রন্থে লিখেছেন যে, কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেতারূপে জিন্নাহ্ যখন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য প্রচেষ্টা করছিলেন, ঠিক সেইসময় সাভারকার দ্বি-জাতিতত্ত্ব পেশ করছিলেন। বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতা মদনমোহন মালব্য ইংরেজি দৈনিক "পাঞ্জাব ট্রিবিউনে" এ বিষয়ে একের পর এক প্রবন্ধ লিখেছেন যাতে তিনি সাভারকারের দ্বিজাতিতত্ত্বের জোরালো সমর্থন করেছিলেন। জিন্নাহ্ একজন দেশপ্রেমী ও ইংরেজ বিরোধী ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গান্ধীজী ইংরেজদের পূর্ণসমর্থন করেছিলেন। এ বিষয়ে বালগঙ্গাধর তিলক জিন্নাহ্কে সমর্থন করেছিলেন। জিন্নাহ্র প্রতি সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর অভিযোগ আরোপ করা হয়; অথচ খোদ জিন্নাহ্ গান্ধীজীর প্রতি এই অভিযোগগুলো আরোপ করে থাকেন। তিনি গান্ধীজীর প্রতি হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলার অভিযোগ আরোপ করেছিলেন— যেমন গান্ধীজী রামরাজ্যের কথা বলেন, গাভীর পবিত্রতার উপর জোর দেন। ১৯৩৭

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসী সরকারের বিদ্যামন্দির শিক্ষা পরিকল্পনাকে জিন্নাহ্ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বাস্তবরূপ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, অথচ এই পরিকল্পনার পশ্চাতে গান্ধীজীর সমর্থন ছিল। ১৯৩৭ সালের কংগ্রেসী বিদ্যামন্দির। পরিকল্পনা বর্তমানে সঙ্ঘ পরিবার ও মুরলী জোশীর গেরুয়া শিক্ষা পরিকল্পনার সূচনা ছিল বলা যায়। জিন্নাহ্ অখণ্ড ভারতের জোরালো সমর্থক ছিলেন।

কংগ্রেসের উচ্চপর্যায়ের নেতা লালা লাজপত রায় ১৯২৪ সালে দেশভাগের প্রস্তাব ও পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন তখন জিন্নাহ্ ও অন্যান্য মুসলমানরা তার তীব্র বিরোধীতা করেছিলেন। এতদ্বসত্ত্বেও লালা লাজপত রায় দেশপ্রেমী এবং জিন্নাহ্, সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী রূপে অভিহিত হলেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, ১৯২৪ সালে লালা লাজপত দেশভাগের যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের ১৯৪৭ সালের বিভাজন-পরিকল্পনা সেটারই কার্বন কপি ছিল। জওহরলাল নেহরু ও মাউন্টব্যাটেনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নেহরু তাকে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল করেছিলেন।

নিবন্ধকার জিন্নাহ্র অনুসারী ও সমর্থক নয়। জিন্নাহ্ সম্পর্কে এই ঘটনাবলী এই জন্য লিখতে হচ্ছে যে, তাকে সাম্প্রদায়িক ও দেশের শত্রু অভিহিত করে তার আড়ালে ভারতীয় মুসলমানদের গাদ্দার ও দেশভাগের জন্য দায়ী করা হয়। সেজন্য আজ জিন্নাহ্র তরফে এই প্রতিরোধটাই ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিরোধের সমার্থক মনে করতে হবে। প্রকৃত অর্থে জিন্নাহ্ যেমন দেশের শত্রু ছিলেন না, তেমনি ভারতীয় মুসলমানরাও দেশদ্রোহী নয়। ভারতীয় মুসলমানরা দেশের শান্তিপূর্ণ ও অনুগত নাগরিক অতীতে ছিল এখনও আছে। অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতি এই সত্যের জ্বলন্তসাক্ষী। বিখ্যাত গান্ধীবাদী-নেতা ও পণ্ডিত সুন্দরলাল লিখেছেন যে, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পাকিস্তানের সমর্থক ছিলেন না। পাকিস্তান তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, 'Jinnah was not in favour of Pakistan, was thrust upon him.'

প্রথম যুগে কংগ্রেসের কাজ ছিল ছোটোখাটো সুযোগ সুবিধা ও দাবির আবেদন ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করা। মুসলমানরা কংগ্রেসে যোগ দিয়ে তাকে হিম্মত, সাহস ও শক্তি দান করেছে, নিজেদের রক্ত দিয়ে তাকে সিঞ্চিত করেছে। কংগ্রেস ও গান্ধীজী হোমরুল অর্থাৎ ইংরেজদের কেন্দ্রীয় শাসনের ছত্রছায়ায় রাজ্যগুলোর স্বায়ত্তশাসন চাইছিলেন। কংগ্রেসী মুসলমানরা মাওলানা মুহাম্মদ জওহর, শওকত আলী, হসরত মোহানী প্রমুখ কংগ্রেসকে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য স্থির করে দেন এবং আওয়াজ তোলেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর বলেছিলেন যে, আমরা সেইধরনের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই যে, যেমনভাবে ভাইসরয় আমাদের জেলে বন্দী করে দিয়েছিলেন, আমরাও ভাইসরয়কে সেইভাবে বন্দী করতে পারি। খিলাফত আন্দোলনে গান্ধীজী ও কংগ্রেস পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন। সেই সময় হিন্দু-

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলিম ঐক্যের চমৎকার দৃশ্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ ও সাম্প্রদায়িকদের চোখে এ দৃশ্য খুব খারাপ লাগল, আর তাদেরই চক্রান্তের পরিণতিতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গেল। কংগ্রেসের মধ্যে প্রথম থেকেই মুসলিম বিরোধী এবং সাভারকার ও হিন্দু মহাসভার প্রতি সহমর্মী অনেক নেতা ছিলেন। এই গোষ্ঠীর প্রতি সর্দার প্যাটেলের সহমর্মিতা ছিল। মাওলানা আযাদ তার "ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম" গ্রন্থে এই সত্যকে স্বীকার করেছেন।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং মুসলিম জনগণ কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হল কেন?

উভয় বাংলা, উড়িষ্যা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করার ফলে একটি অংশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেস ও কংগ্রেসের বাইরের সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসীবাদী শক্তিদের এ-বিষয়টা খুবই খারাপ লাগল। তারা সাম্প্রদায়িক সুরে প্রতিবাদ ও হাঙ্গামা করল। অবশেষে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হল। কংগ্রেসী মুসলমানরা (বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিল।

১৯৩৭ সালে নির্বাচনের আগে উত্তরপ্রদেশে (যুক্তপ্রদেশে) কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সমঝোতা করল যে, উভয়ে মিলে যৌথ সরকার গঠন করবে এবং মুসলিম লীগের দুজনকে ক্যাবিনেট স্তরের মন্ত্রী করা হবে। নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল, তখন জওহর লাল নেহরু প্রতিশ্রুতি রাখলেন না। শুধু তাই নয় তিনি বিভ্রান্তিকর ও উত্তেজনাপূর্ণ বিবৃতি দিলেন যে, এখানে শুধু দুটো দলই আছে তা হল কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকার। নেহরুর এই প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও বিভ্রান্তিকর বিবৃতি কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে মুসলমানদের ক্ষুব্ধ করে তুলল। জিন্নাহ্ ও মুসলিম লীগ এই সুযোগকে দারুণভাবে কাজে লাগাল ও অত্যন্ত ফায়দা তুলল। ১৯৩৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যখন সমগ্র দেশে কংগ্রেসী সরকারীগুলোকে বরখাস্ত করল, তখন মুসলমানরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল এবং মুসলিমলীগ সেদিনটাকে "পরিত্রাণ দিবস" রূপে পালন করল। এটাই ছিল কংগ্রেসী সরকারের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ এবং এটাই ছিল তার পরিণতি।

মাওলানা আযাদ ও মাওলানা মউদূদী উভয়ের প্রস্তাব ও পরিকল্পনা ছিল দেশভাগের বিরুদ্ধে ও অখণ্ড ভারতের সপক্ষে, তারা উভয়ে দেশভাগের পরবর্তীকালে সংঘটিত হত্যালীলা, লুঠতরাজ, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও বরবাদী থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় অখণ্ড ভারতের নীতিকে সকলপক্ষই মেনে নিয়েছিলেন। মুসলিমলীগ ও জিন্নাহ্ পাকিস্তানের দাবি পরিত্যাগ করেছিলেন। এই চুক্তির পরপরই ১০ জুলাই ১৯৪৬ সালে বোম্বাইতে সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই ঐতিহাসিক চুক্তি মেনে না চলার (পাবন্দ না হওয়ার) কথা ঘোষণা করলেন। জিন্নাহ্ ও মুসলিম লীগ সেটাকেই প্রকাশ্যভাবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও প্রতারণা অভিহিত করল। পাকিস্তানের যে দাবি চাপা পড়ে গিয়েছিলেন, জওহরলালের ঐতিহাসিক ভুলের জন্য সেটাই দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে পুনরায় আবির্ভূত হল। জিন্নাহ্ ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ সালে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ডাক দিলেন, যার ফলে কলকাতাসহ অন্যত্র হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বেঁধে গেল, উভয় সাম্প্রদায়ের মানুষ নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হল এবং অবশেষে দেশভাগ হয়ে গেল। উভয় সম্প্রদায়ের দশ লাখ নারী-পুরুষ ও শিশু নিহত হল, হাজার হাজার মহিলা ও বালিকার ইজ্জত লুণ্ঠিত হল, এক কোটির বেশি-মানুষ দেশত্যাগী হয়ে মুহাজির বা শরণার্থী হল, কোটি কোটি টাকার সম্পদ ও সম্পত্তি লুণ্ঠিত, অগ্নিদগ্ধ ও বরবাদ হল। কিছু নেতৃবৃন্দের হিমালয় সদৃশ ভুলের জন্য এবং ক্ষমতা লাভের প্রতিফল আজও পর্যন্ত উপমহাদেশের কোটি কোটি জনসাধারণ ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছে।

১৯৩৭ সালে বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করল, তখন বিহারে ডা. সৈয়দ মাহমুদ এবং বোম্বাই প্রদেশে পার্সী গোষ্ঠীর মি. নারিম্যানকে মুখ্যমন্ত্রী হতে দেওয়া হল না, বরং হিন্দুদের মুখ্যমন্ত্রী করা হল। এটাও কংগ্রেসের ঘোষিত প্রতিশ্রুতির সরাসরি বিরুদ্ধাচারণ ছিল, কারণ ইতিপূর্বে কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল যে, রাজ্যে কংগ্রেস কমিটির যে সভাপতি হবে, মুখ্যমন্ত্রীপদে সেই বসবে। এই দুজনের অপরাধ ছিল যে, তারা হিন্দু ছিলেন না। শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারে এবং সর্দার প্যাটেল বোম্বাইতে একই ধরণের মুসলিম বিরোধী ভূমিকা পালন করেছিলেন। কংগ্রেসের এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী, সাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও কার্যকলাপের প্রতি মুসলমানরা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রা অত্যন্ত অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছিলেন। কংগ্রেসের অত্যাচার ও অবিচারের জন্য বহু বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষ কংগ্রেস দল ত্যাগ করল। মাওলানা আযাদ তার ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' গ্রন্থে এবং নিরপেক্ষ অমুসলিম ব্যক্তিবর্গও তাদের রচনায় এ সত্য ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন।

১৯২৮ সালে মোতিলাল নেহরু রিপোর্টের উপর জিন্নাহ্র সংশোধনী ও প্রস্তাবসমূহকে কংগ্রেস অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ভরে উড়িয়ে দিল। কংগ্রেসের এই ধরনের আচরণে নারাজ ও হতাশ হয়ে জিন্নাহ্ লন্ডনে চলে যান এবং সেখানে প্রিভিকাউন্সিলে ওকালতি আরম্ভ করেছিলেন। তিনি চৌধুরী রহমত আলীর পাকিস্তান প্রস্তাবকেও রদ করে দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে আল্লামা ইকবাল ও অন্যান্যরা তাঁকে 'হিন্দু মুসলিম বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য জোরাজুরি করে তাকে ভারতে ফিরিয়ে এনেছিলেন। গান্ধীজী ও জিন্নাহ্র মধ্যে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়ের চৌদ্দটি দফা চলল, কিন্তু কোনো আশানুরূপ সিদ্ধান্ত ও পরিণতিতে পৌছানো গেল না।

ভারত ভাগের পূর্বে সম্মিলিতভাবে যে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছিল,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাতে জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী, লিয়াকত আলী খান অর্থমন্ত্রী এবং সর্দার প্যাটেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের আরও অনেক মন্ত্রী ছিলেন। লিয়াকত আলী খান যিনি পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তিনি যে বাজেট পেশ করেছিলেন, সেটাকে 'দরিদ্রদের বাজেট' (Poor Men's Budget) অভিহিত করা হল। তাতে দরিদ্র ও মধ্যবর্তীশ্রেণির প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দান করা হয়েছিল এবং বনিকশ্রেণি বিশেষত পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের উপর অনেক ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হল, যার দরুণ এই গোষ্ঠী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হল। কংগ্রেস দলে সর্বদা পুঁজিপতি, বনিক ও ব্রাহ্মণদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তারা বিশ্বাস করে নিল যে, অখণ্ড ভারতে তাদের স্বার্থকে মুসলমানরা দারুণভাবে ক্ষুণ্ন ও ক্ষতি করে দিবে আর দরিদ্র জনগণ মুসলমানদের ভাল মনে করে তাদের সঙ্গী হয়ে যাবে। তারা স্বস্তি এতেই ভাবল যে, মুসলমানদের পৃথক করে দেওয়া হোক, যাতে তারা স্বাধীন ভারতে নিজেদের আর্থিক, সামাজিক ও ধর্মীয় আগ্রাসন চালু রাখতে পারে। এই সুদখোর পুঁজিপতিরা ইহুদী পুঁজিপতিদের মতোই ইসলামের বিনাসুদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকতেন।

লালকৃষ্ণ আদবাণী খুব ভালোভাবে জানতেন যে, বাবরী মসজিদ, পাকিস্তান এবং মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সম্পর্কে তাঁর বিবৃতির দরুন আর.এস.এস., বিশ্বহিন্দু পরিষদ প্রভৃতি সংগঠনে তার বিরুদ্ধে তুফান উঠবে, তা সত্ত্বেও তিনি এই বিবৃতি দিলেন এবং তার প্রতি কায়েম থেকে ঘোষণা করলেন যে, বিজেপি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আদবাণী যা বলেছিলেন সেটা বিজেপিকে লাভবান করা এবং কংগ্রেসের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানানোর উদ্দেশ্যে করেছেন। তার লক্ষ্য হল ২০০৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে এনডিএ'কে সঙ্গে নিয়ে বিজেপিকে শাসকদল এবং নিজেকে সর্বজনগ্রাহ্য প্রধানমন্ত্রী রূপে তুলে ধরা। তিনি যথার্থ আন্দাজ করেছেন যে, কট্টর সঙ্ঘপন্থী রূপে তার পরিচিতির জন্য তার দলের ক্রমহ্রাসমান জনসমর্থনের কারণে তার জনপ্রিয়তা থাকবে না। সেজন্য তাকে ভাবমূর্তি পরিবর্তন করে নরমপন্থী, ভাবসাম্যরক্ষাকারী ও সত্যানুসারী রূপে আত্মপ্রকাশ করা দরকার। পাকিস্তান সফরের মাধ্যমে তিনি এই কর্মকুশলতার সূচনা করেছেন। তার কর্মকুশলতার দ্বিতীয় দিক হল যে, তিনি ভারত বিভাজনে জিন্নাহ্র দায়িত্বের প্রশ্ন তুলে তিনি কংগ্রেসের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন ও তাকে জড়ানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাকে এসত্য গোপন করা উচিত হবে না যে, দ্বিজাতি তত্ত্বকে পূর্ণশক্তি দিয়ে যিনি পেশ করেছিলেন, তিনি হলেন বিধায়ক দামোদর সাভারকার। তিনি সঙ্ঘপরিবারের গুরু ছিলেন, তার সাম্প্রদায়িক সংগঠন। হিন্দুমহাসভাই তো আর.এস.এসের ও সঙ্ঘ পরিবারের পূর্বসূরী ছিল। সারা বিশ্ব জানে যে, মানবজাতি ও সমাজকে উঁচু-নিচু ও জাতপাতের ভিত্তিতে বিভাজন করাটা এই দেশের "প্রাচীন সভ্যতার" দান, যেটাকে আদবাণী

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জোরপূর্বক দেশ ও দেশবাসীর উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে, দেশভাগের আলোচনায় মুসলমানদেরও চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। জিন্নাহ্‌র আড়ালে মুসলমানদের দায়ী করার প্রোপাগান্ডা দ্বারা অখণ্ড ভারতের ধ্বজাধারী সঙ্ঘ পরিবার লাভবান হবে। কিন্তু পালের সেই হাওয়া যেন আস্তে আস্তে থেমে যাচ্ছে। হাফডজনের বেশি অমুসলিম বিশেষজ্ঞরা তাদের পুস্তকে সত্যকথা উল্লেখ করেছেন। গান্ধীজীর পৌত্র রাজমোহন গান্ধী 'A Study of Hindu-Muslim Encounter' গ্রন্থে লিখেছেন যে, দেশভাগের জন্য জিন্নাহ্ ও মুসলমানরা দায়ী অতি সামান্য।" মহারাষ্ট্রের পূর্বতন অ্যাটর্নী জেনারেল এইচ. এম. সারাভাই তার বিখ্যাত গ্রন্থ "Partition of India-Legend and Reality"-এ লিখেছেন "এটা সত্যকথা যে কংগ্রেস বিভাজন চাইছিল এবং জিন্নাহ্ বিভাজনের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু ভাল বিকল্প হিসাবে বিভাজনকে কবুল করেছিলেন।" বিখ্যাত গান্ধীবাদী ঐতিহাসিক ড. বিশম্ভরনাথ পাণ্ডের উক্তি হল— Nahru and Patel helped the British in India's Partition (দেশভাগের জন্য নেহরু ও প্যাটেল ব্রিটিশকে সাহায্য করেছিল)।" এই জাতীয় চিন্তাধারা অন্যান্য অমুসলিম লেখকরা তাদের পুস্তকে ব্যক্ত করেছেন। সঠিক ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর আলোকে এই অপবাদটা বিভ্রান্তকর ও ভিত্তিহীন যে, দেশভাগের জন্য কেবলমাত্র জিন্নাহ্ এবং মুসলমানরাই দায়ী ছিল। দেশভাগের জন্য প্রাথমিক ও বুনিয়াদীভাবে দায়ী হল হিন্দু ফ্যাসীবাদী ও সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমুহ। তাদের মধ্যে কংগ্রেস ও তার কিছু শীর্ষনেতৃবৃন্দও শামিল রয়েছেন। কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, মুসলমানদের অধিকার হরণ ও তাদের উপর অত্যাচার করাটাও বিভাজনের কারণ হয়ে উঠেছিল।

ভাষান্তর : ফায়জুলবাশার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কায়েদ-ই-আযমের উদ্দেশ্য কি ছিল সেকুলার পাকিস্তান?

জঙ্গ, করাচী-র প্রতিবেদন

গণতন্ত্রপন্থীদের এই দাবির প্রতি নতুন করে হাওয়া তোলা আরম্ভ হয়েছে যে, কায়েদ-ই-আযম (রহ.) পাকিস্তান নামে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলেন। সেকুলারিজমে ধর্মটা মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাষ্ট্রীয় বিষয়ের সাথে ধর্মের কোনো যোগ থাকে না। যারা পাকিস্তানকে এইরকমই একটা দেশ হিসেবে দেখতে চান, তারা নিজের অভিমত খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে থাকেন; তারা ইসলামের নামে স্লোগান দিয়ে জাতির প্রতি প্রতারণাকারীর চেয়ে ভালো। কেননা উন্মাদনা অবস্থায় যার মুখ থেকে সত্য কথা ব্যক্ত হয় তাহলে সেই মাদকাসক্ত ব্যক্তি ফকীহের চেয়ে ভালো।

তবে এই গোষ্ঠীর জোরালো দাবি যে, কায়েদ-ই-আযমও পাকিস্তানকে একটা সেকুলার রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ-কথাটি সত্যের একেবারেই পরিপন্থী। এ সম্পর্কে নিজের থেকে কোনো কিছু বলার চেয়ে খোদ কায়েদ-ই-আযমের কিছু কথা তুলে ধরা যাক যে, পাকিস্তান গঠনের পূর্বে কায়েদে আযম পাকিস্তানে ইসলামের অবস্থান সম্পর্কে কী বলেছিলেন। অনেকে কায়েদ-ই-আযমকেও একজন প্রতারক ও প্রবঞ্চক রাজনীতিবিদ মনে করে থাকেন যে, তিনি মুসলিম জনগণের ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগানোর জন্য এটা করেছিলেন, যাতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। অথচ তিনি পাকিস্তানকে ওইরকমই একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যেমনভাবে মুসলিম বিশ্বে আরও অনেক রাষ্ট্র ছিল আগে থেকেই। সেজন্য পাকিস্তান গঠনের পরবর্তী কিছু উদ্ধৃতি প্রথমেই উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে কায়েদ আযম কোনো রাখঢাক না করে পাকিস্তান গঠনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। তার বক্তব্য থেকে এ-কথাটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কায়েদ-ই-আযম কুরআন ও সুন্নতের কানুনের ভিত্তিতে এক ইসলামী রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে নিজ প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসার কথা আদৌও ভাবেননি। লক্ষ্য করুন :

> ১৩ জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে ইসলামীয়া কলেজ, পেশোয়ারে ভাষণ দিতে গিয়ে কায়েদ-ই-আযম বলেন, "আমরা একটুকরো ভূখণ্ডের জন্য পাকিস্তান দাবি করিনি, বরং এমন এক পরীক্ষাগার লাভ করতে চেয়েছিলাম যেখানে আমরা ইসলামের নীতিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাস্তবায়িত করতে পারি।"

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২৫ জানুয়ারি ১৯৪৮ করাচি বার অ্যাসোসিয়েশনে তাঁর ভাষণে বলেন, "আমি সেই সব লোকের কথা মোটেই বুঝতে পারি না, যারা জেনেশুনে বা দুষ্টুমতি হয়ে প্রোপাগান্ডা করেন যে, পাকিস্তানের সংবিধান শরীয়তের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হবে না। ইসলামের নীতিসমূহ সাধারণ জীবনযাত্রায় আজও ঠিক সেইভাবে প্রযোজ্য যেমনভাবে তেরশত বছর আগেও ছিল।"

সেই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকার জনগণের উদ্দেশে প্রচারিত এক বার্তায় তিনি বলেন, "পাকিস্তানের আইন প্রণয়ন সভাকে এখন পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। আমি জানি না এই আইনের শেষ পরিণতি কী হবে, তবে আমার বিশ্বাস যে সেটা গণতান্ত্রিক ধাঁচে হবে, যাতে ইসলামের বুনিয়াদী নীতিসমূহ গৃহীত হবে। এই নীতিগুলো আমাদের বাস্তবজীবনে ঠিক সেইভাবে কার্যকর হওয়ার যোগ্য (প্রযোজ্য) যেমনভাবে আজ থেকে তেরশত বছর আগে ছিল। ইসলাম ও তার আদর্শ আমাদেরকে গণতন্ত্রের সবক শিখিয়েছে।

ইসলাম মানুষের মধ্যে সাম্য, ন্যায় এবং প্রত্যেক মানুষের সাথে ইনসাফের ব্যবহার শিখিয়েছে, আমরা সেই উজ্জ্বল অতীতের ধারক, পাকিস্তানের আইন প্রণয়নকারী হিসাবে আমরা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন।"

কায়েদ-ই-আযমও ঠিক ইকবালের মতোই এই সত্যকে উপলব্ধি করতেন যে, "জুদা হো দ্বীন সিয়াসত তো রহজাতি হ্যায় চেঙ্গিজী"। অর্থাৎ রাজনীতি যদি ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে কেবল চেঙ্গীজীর স্বভাব অবশিষ্ট থেকে যায়। সেজন্যই তিনি পাকিস্তান প্রস্তাবের আগেই ১৯৩৮ সালে মুসলিম লীগের পাটনা অধিবেশনের সময় উলামাদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মে রাজনীতি ধর্ম থেকে পৃথক হোক বা না হোক, আমি এ-কথাটি ভালোভাবে উপলব্ধি করেছি যে, ইসলামে রাজনীতি ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং সেটা ধর্মেরই অঙ্গ। ...ইসলাম কেবলমাত্র কিছু বিশ্বাস ও ইবাদাতের নাম নয়, বরং সেটা হল রাজনৈতিক বিষয়, সমাজনীতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের সমষ্টি। আমাদেরকে সবগুলো সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে।"

কায়েদ-ই-আযমের এইসব বক্তব্য সত্ত্বেও যদি কেউ সুস্থ বুদ্ধিতে উপলব্ধি করে যে, তিনি পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র নয়; বরং সেকুলার রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করতে চেয়েছিলেন, যেখানে ধর্মের সাথে রাষ্ট্রীয় বিষয়ের কোনো যোগ থাকবে না, তাহলে এরূপ বিবেক ও বুদ্ধির প্রতি আমাদের সমর্থন নেই।

যাঁরা দাবি করেন যে, কায়েদ-ই-আযম পাকিস্তানকে সেকুলার রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করতে চেয়েছিলেন, তারা সাধারণভাবে তার ১১ আগস্ট ১৯৪৭ আইন প্রণয়ন সভার ভাষণের এই বক্তব্যটি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করেন, "আমরা এই বুনিয়াদী নীতির ভিত্তিতে এই দেশের (প্রশাসনের) সূচনা করছি যে, সকল ব্যক্তি এই দেশের

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নাগরিক এবং সমান পর্যায়ের নাগরিক... আমি মনে করি যে, যদি আমরা সকলে মিলে এই আদর্শকে সামনে রাখি, তাহলে সময় হলে দেখতে পাব যে, কোনো হিন্দু হিন্দু থাকবে না এবং কোনো মুসলমান মুসলমান থাকবে না।" তবে এই কথাগুলোকে কায়েদ-ই আযমের সমগ্র প্রচেষ্টা এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ও পরের বক্তব্য ও বিবৃতি থেকে পৃথকভাবে বিচার না করলে এই সত্যে উপনীত হতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, কায়েদ-ই-আযম এই কথাগুলো বলেছিলেন সেই প্রোপাগান্ডা নিরসনের জন্য যে, ইসলামী রাষ্ট্র হওয়ার দরুন পাকিস্তানে অমুসলিমদের বুনিয়াদী ও মৌলিক নাগরিক অধিকার থাকবে না। যদি কায়েদ-ই-আযমের এই কথাগুলোর ভাবার্থ সেটাই ধরা হয় যেটা গণতন্ত্রপন্থীরা বলে থাকেন, তাহলে উপরোল্লিখিত দ্ব্যর্থহীন ভাষার বক্তব্য যেগুলো ১১ আগস্টের পরের সেগুলো একেবারেই প্রতারণা ও ছলনায় পরিণত হয়, অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার চরম বিরোধী ব্যক্তিও তার সততা ও বিশ্বস্ততা স্বীকার করেন এবং তার প্রতি প্রতারণার অভিযোগ আনা কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তা ছাড়া, ১১ আগস্টের মাত্র তিনদিন পর ১৪ আগস্টের অনুষ্ঠানে যখন মাউন্ট ব্যাটেন তার ভাষণে এই আশা ব্যক্ত করলেন যে, পাকিস্তানে অমুসলিমদের সাথে সেইরূপ সহমর্মিতার আচরণ করা হবে, যার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন ভারতীয় মুগল শাসকদের মধ্যে আকবর। এই ভাবনার নিরসনের উদ্দেশ্যে কায়েদ-ই-আযম তৎক্ষণাৎ বলেন যে, অমুসলিমদের সাথে সাম্য ও সহমর্মিতামূলক আচরণ করার জন্য পাকিস্তানে কোন সেকুলার শাসককে আদর্শ করা হবে। তাঁর ভাষণে তিনি আরও বলেন, আকবর অমুসলিমদের সাথে যেরূপ ধৈর্য ও উত্তম আচরণ করেছেন, তা কোনো নতুন বিষয় নয়। এর বুনিয়াদী তেরশত বছর পূর্বে রাসুলুল্লাহ (সা.) শুধু কথার দ্বারা নয়, বরং পরাজিত ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে, তাদের ধর্ম ও বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে, অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার বাস্তব রূপ দিয়েছেন।

কায়েদ-ই-আযমের এই কথার পর এ-বিষয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, এগারো আগস্ট তিনি অমুসলিমদের প্রতি যে উত্তম আচরণের কথা বলেছিলেন তার ভিত্তি সেকুলারিজম নয়, বরং নবীর (সা.) "উসওয়া হাসানা" বা উন্নত আদর্শ ছিল।

১৯৪৬ সালে কায়েদ-ই-আযমের সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের আইনসভার কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবেও পাকিস্তানের উদ্দেশ্য খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, "যেহেতু উপমহাদেশে বসবাসকারী কোটি কোটি মুসলমান এক আকীদায় বিশ্বাস রাখেন, যা তাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে (শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি) গভীরভাবে পরিব্যপ্ত, যা কিছু আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, কিছু প্রচলিত রীতিনীতি এবং আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলমানরা এই শেষ সিদ্ধান্তে এসেছে যে, ভারতীয় মুসলিমদেরকে হিন্দুদের আধিপত্য থেকে নিরাপদ রাখার জন্য এবং নিজস্ব ধ্যানধারণা ও মতাদর্শ অনুযায়ী সামগ্রিক জীবনধারা গঠনের পরিপূর্ণ সুযোগ লাভের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে যে, উত্তর পূর্বে বাংলা ও আসাম এবং উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান সমন্বয়ে এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক।"

পাকিস্তান গঠনের পর সাংবিধানিকভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণের প্রশ্ন দেখা দেয়। সেই সময় প্রথম সংবিধান পরিষদের বৈঠকে, যেখানে পাকিস্তান আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন, ১২ মার্চ ১৯৪৯ সালে প্রস্তাব ও উদ্দেশ্য গৃহীত হয়, তাতে স্থায়ীভাবে সিদ্ধান্ত হয় যে, সেকুলারিজম নয়, বরং ইসলামী পদ্ধতিতে আইন প্রয়োগ করা পাকিস্তানের লক্ষ্য। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "পাকিস্তানের আইনসভার প্রতিনিধিবর্গ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যে, একটি স্বাধীন দেশ পাকিস্তানের জন্য এক সংবিধান প্রণয়ন করা হোক। ...যাতে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সাম্য, সহমর্মিতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিসমূহ ঠিক ইসলাম যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে, পরিপূর্ণভাবে সেটা লক্ষ্য রাখা হয়, যার ভিত্তিতে মুসলমানদের এমন যোগ্য করে তোলা যায় যাতে তারা ব্যক্তিগত, সামাজিক জীবনধারাকে কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণিত ইসলামী শিক্ষা ও তার চাহিদামতো গড়ে তুলতে পারে।"

....এইসব প্রকাশ্য ও স্পষ্ট ঘটনার প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন। পাকিস্তানের লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেন, তাহলে সেটা একেবারেই ভিত্তিহীন। যদি কোনো ব্যক্তির মন এটা চায় তাহলে একথাটা নিজের তরফে বলা দরকার, নিজের বন্দুক কায়েদ-ই-আযমের কাঁধে রেখে চালানোর অধিকার তার নেই।

অনুবাদ : ফায়জুলবাশার * সৌজন্যে : জঙ্গ-করাচি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেশ বিভাজন, অনুপ্রবেশ, আসাম আন্দোলন : ৯০ বছরের সংখ্যালঘু রাজনীতি

দীপঙ্কর নাথ চৌধুরী

ভারতীয় সংবিধান মতে সংখ্যালঘু মানেই একাধারে মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ এবং পার্সী সম্প্রদায়কে বোঝায়। কিন্তু আসামের রাজনীতিতে সংখ্যালঘু বলতে সরাসরি মুসলমান অর্থাৎ বাংলাভাষী মুসলমান সম্প্রদায়কে বোঝায়। ১৯৩৭ সালে আসামে প্রথম সংসদীয় রাজনীতির সূচনা। আর সে সময়ে অনুষ্ঠিত প্রথম আসাম বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘুরা রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অবশ্য সে সময়ে বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট জেলা ছিল আসামের অন্তর্ভুক্ত। ফলে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মোট ৩৫ জন বিধায়ক নির্বাচিত হন। সে সময়ের নির্বাচনে নির্বাচিতদের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার লোক। অবশ্য তিনি ছিলেন নির্দলীয় বিধায়ক, যিনি নির্বাচনের পরেই এসে যোগ দেন কংগ্রেসের সঙ্গে। আর তিনি হলেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফকর উদ্দীন আলি আহমেদ।

দেশের স্বাধীনতার আগে মুসলিম লীগই ছিল আসামের সংখ্যালঘু রাজনীতির নিয়ন্ত্রক। সে সময়ের রাজনীতিতে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ফকর উদ্দিন আলি আহমেদের মতো ব্যক্তিকেও কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। অবশ্য স্বাধীনতার প্রাক্কালে এই মুসলিম লীগই ছিল দুই ভাগে বিভক্ত। একটির নেতৃত্বে ছিলেন সৈয়দ সাদুল্লা, অপরটির নেতৃত্বে ছিলেন মৌলানা আব্দুল হামিদ খান। সে সময়ে মুসলিম লীগ থেকেও সাদুল্লা ছিলেন জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। আসামের জনসাধারণের জন্য তিনি ছিলেন যথেষ্ট সচেতন। ফলে কোনো এক সময় রোহিণী কুমার চৌধুরী, রূপনাথ ব্রহ্মের মতো নেতারাও তার সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হন। অধিক উৎপাদনের স্বার্থে ব্রিটিশের লাই প্রথার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। এমনকী অতি কৌশলে গ্রুপিং অর্থাৎ আসাম বাংলাকে একজোট করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তার ভূমিকা ছিল উল্কার মতো। অন্যদিকে মৌলানা আসানি মূলত বাঙালি মুসলমানদের কথাই চিন্তা করতেন।

দেশ বিভাজনের সময় আসামের সংখ্যালঘু রাজনীতিতে অভাবনীয় পরিবর্তন আসে। যারা ছিলেন মুসলিম লীগের উন্মাত্ত সমর্থক তারা একরাত্রের ভিতরেই হয় যান কংগ্রেস সমর্থক। মইনুল হক চৌধুরীর মতো জিন্নাহ্‌র ঘনিষ্ঠ মুসলিম লীগের নেতারাও কংগ্রেসে যোগ দেন। হয়তো সে সময়ের সংখ্যালঘু রাজনীতির পিছনে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছিল ভয়, শংকা এবং নিরাপত্তার প্রশ্ন। যে কারণেই হোক, যে কোনো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে কংগ্রেসের বিজয় হয় সহজসাধ্য। ফলে নিজের সাংগঠনিক ভোট বা সমষ্টির মানুষের সঙ্গে পরিচিত না থাকা সত্ত্বেও বরপেটা কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হল ফকর উদ্দিন আহমেদ। অন্যদিকে, দলগাঁও বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন যোরহাটের আনোয়ারা তাইমূর। আর সে সময়ের মুসলমান ভোট ছিল কংগ্রেসের জন্য নিশ্চিত। সে কারণেই দেবকান্ত বরুয়ার মতো ব্যক্তিও অত্যন্ত গর্ব করে বলতেন যে, আলি এবং কুলি থাকতে আসামে কংগ্রেসের কোনো বিপদ নেই। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের আগে পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এই বিষয়েই নিশ্চিত ছিলেন। অবশ্য, তার মধ্যেও আমজাদ আলি, জাহানুদ্দিন সাহাদাদ জোদ্দার, তাজউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ কংগ্রেস বিরোধী নেতারা লোকসভা এবং বিধানসভার জন্য নির্বাচিত হন।

অন্যদিকে দেশের জরুরিকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র দেশেই এক কংগ্রেস বিরোধী জোয়ারের সৃষ্টি হয়েছিল। সে সময় আসামকেও এই হাওয়া স্পর্শ করে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচন কেন্দ্রে এবং ১৯৭৮ সালের নির্বাচনে আসামের কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটে। সে সময় জনতা দলের প্রার্থী হিসেবে বেশ কয়েকজন মুসলমান নেতা বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ২৪ জন মুসলমান বিধায়ক নির্বাচিত হন তখন। সে সময় একাংশ লোকের ধারণা ছিল যে আসামের রাজনীতি অচিরেই সংখ্যালঘুদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। আবার অনেকের মতে বহিরাগত আন্দোলনের বীজ ১৯৭৮ সালের নির্বাচনে প্রথম বপন হয়েছিল। এই আন্দোলনের সূত্রপাতেই ১৯৭৭ সালের জনতা দলের বিসম্বাদী গোলাপ বরবরা সরকারের পতন ঘটে।

অনুপ্রবেশের সঙ্গে আসামের সংখ্যালঘু রাজনীতির বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আসামে আহোমদের আগমনের আগেই মুসলমানদের আগমন। যদিও উনবিংশ শতকের আগে পর্যন্ত এই জনগোষ্ঠীর কোনো নথি ছিল না। আসাম ব্রিটিশ অধীনস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ-রাজ্যে পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিরোধের সূচনা হয়। সে সময় হিন্দুদের বেশির ভাগই ছিলেন ব্যবসায়ী এবং মুসলমানদের বেশির ভাগ ছিলেন দরিদ্র কৃষক। জীবিকা অন্বেষণের প্রয়োজনেই তাদের আসামের মাটি আকর্ষণ করেছিল। তখন ব্রিটিশ সরকারও তাদের বিশেষ উৎসাহ প্রদান করে। দেশ বিভাজনের পরও পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহিরাগতদের স্রোত বন্ধ হয়নি। বিমলা প্রসাদ মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বহিরাগত মুসলমানদের বহিষ্কার করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু ফকর উদ্দিন আলি আহমেদ, মইনুল হক চৌধুরী এবং জমিয়ত উলেমার প্রতিবাদে এই পদক্ষেপ অর্ধেকে বন্ধ হয়ে পড়ে। সে সময় বহুসংখ্যক মুসলমান আসাম থেকে বিতাড়িত হন।

১৯৭৯ সালে আসাম আন্দোলন যখন ব্যাপক রূপ ধারণ করে সে সময় থেকেই সংখ্যালঘু রাজনীতি এক নয়া মোড় নেয়। ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে বর্তমান

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গোয়ালপাড়া জেলার জলেশ্বরে 'সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্র ইউনিয়ন'-এর জন্ম হয়। 'আমসু' নামে পরিচিত এই সংখ্যালঘু ছাত্র সংগঠনটি পরে ১৯৮৫ সালে আসাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দৃশ্যপট সম্পূর্ণ বদলে যায়। অন্যদিকে, আসাম আন্দোলন এবং অসম চুক্তির সমর্থকদের বিপুল সমাবেশে গোলাঘাট জেলায় অসম গণ পরিষদ দলের জন্ম হয়। আবার সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন চুক্তির প্রতিবাদে, সংযুক্ত সংখ্যালঘু মোর্চা (ইউএমএফ) নামক রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। ১৯৮৫ সালের নির্বাচনেই 'অসম গণ পরিষদ' প্রথমবারের মতো দিসপুরের মসনদ দখল করে। অন্যদিকে, সংখ্যালঘু মোর্চা ১৭ জন বিধায়কসহ একজন সাংসদকে নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তৃতীয় বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সে নির্বাচনে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মাত্র একটা বিধানসভা ছাড়া সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার সবটাতেই কংগ্রেস শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। অবশ্য, সে সময় বরাক উপত্যকায় 'অসম গণ পরিষদ' বা সংখ্যালঘু মোর্চার কোনো প্রভাব পড়েনি।

অসম চুক্তি বাতিলের দাবিকে ১৯৮৫ সালের নির্বাচনের পর এই সংখ্যালঘু দলটি মাত্র এক বছরের মধ্যেই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়। আর একমাত্র সাংসদের সঙ্গে মোট ১২ জন বিধায়ক যোগ দেন কংগ্রেস দলে। ১৯৮৭ সালে মোর্চার প্রতিষ্ঠাপক সভাপতি কালিপদ সেন আলফার গুলিতে নিহত হওয়ার পরই দলটি স্তব্ধ হয়ে পড়ে। আমসুও কংগ্রেসি ষড়যন্ত্রে দ্বিধাবিভক্ত হয়।

অন্যদিকে, আরও একটি সংগঠন জমিয়ত উলেমা হিতেশ্বর শইকীয়ার তৎপরতায় কংগ্রেসে বিলীন হয়ে যায়। ৩০ এপ্রিল ১৯৯২ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকীয়া আসামে ২০-৩০ লক্ষ বিদেশী রয়েছে বলে মন্তব্য করেন। আর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে সংখ্যালঘুরা কংগ্রেসের বিরোধী হয়ে ওঠে। এমনকী মুসলিম ফোরাম নামে অন্য একটি সংগঠন ৫ মিনিটের ভিতর সরকার ভেঙে দেওয়ার হুমকি দেয়। অন্যদিকে, মৌলানা আব্দুল হকের নেতৃত্বে জমিয়ত বৃহৎ সংখ্যক নেতা-কর্মীদের নিয়ে সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে এই জমিয়ত আবার কংগ্রেসের বিরোধিতা করে এবং অগপ নেতৃত্বকে সমর্থন করে। ফলে সে নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী ঝড়ে অগপ মোর্চা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে, এই অগপ মোর্চার শাসনকালে আইএসআই-র নামে মসজিদ মাদ্‌রাসা নির্মাণের অভিযোগ উত্থাপন হলে জমিয়ত উলেমা অগপ সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠে। ২০০১ সালের নির্বাচনে এই ধর্মীয় সংগঠনটি আবার কংগ্রেসকে সমর্থন করে। ফলে কংগ্রেস পুনঃক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এভাবে জমিয়তের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে যে সংখ্যালঘু রাজনীতিতে তারাই প্রধান নির্ণায়ক শক্তি।

বিগত ৯০ বছরের সংখ্যালঘু রাজনীতি অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, ভয়, শঙ্কা এবং নিরাপত্তার প্রশ্নেই সংখ্যালঘুরা রাজনৈতিক হাল নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জমিয়ত বর্তমানে যে ইউডিএফ নামের রাজনৈতিক দলটির জন্ম দিয়েছে তার পটভূমি শক্ত হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক আইএমডিটি আইন বাতিলের জন্যে। বিগত ২২ বছর যারা কংগ্রেসকে নিয়ে রাজনীতি করেছেন, তাদের ধারণা ছিল যে বিতর্কিত এবং সম্প্রতি বাতিল হওয়া এ-আইনটি সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচ ছিল। অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক আইএমডিটি আইন বাতিলের পরই সংখ্যালঘুদের প্রগতিশীল অংশ যথেষ্ট উৎসাহিত হয়েছিল। কারণ তাদের মতে, কংগ্রেসের মতো দলই এই আইএমডিটি আইন প্রণয়ন করেছে একমাত্র নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য।

একটা সময় ছিল যখন মৌলানা তৈয়বুল্লা, ফকর উদ্দিন আলি আহমেদ, আবদুল মতলিব মজুমদার, মহম্মদ ইদ্রিস, আতাউর রহমান, আবদুল মুহিব মজুমদার প্রমুখ নেতারা আসামের মুসলমানদের গৌরব ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে নেতৃত্বের এমনই অবক্ষয় হয়েছে যে বিধানসভা এবং লোকসভায় মুসলমান প্রতিনিধিত্বকে নিয়ে অনেক শিক্ষিত মুসলমানরাও বর্তমানে লজ্জাবোধ করেছেন। তবে আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনই বলে দিতে পারে কংগ্রেসের দুষ্ট রাজনীতিকে ধূলায় অবলুণ্ঠিত করতে বদর উদ্দিন অজমল এবং তাঁর নবগঠিত দল ইউডিএফ কতটুকু সক্ষম হবে।

বাংলা কাগজ

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্

উপাধি : কায়দ-ই-আযম

১৮৭৭ : জন্ম ২৫ ডিসেম্বর

১৮৮২ : শিক্ষাজীবন শুরু, মাদ্‌রাসাতুল আতফাল, করাচী। পরবর্তী শিক্ষা মাদ্‌রাসাতু ইসলাম, সিন্ধু।

১৮৯৩ : লন্ডন গমন।

১৮৯৬ : ব্যারিস্টার ডিগ্রি লাভ।

১৮৯৬ : কর্মজীবনের শুরু। আইনজীবী, মুম্বই হাইকোর্ট।

১৯০৬ : রাজনৈতিক জীবন শুরু। কংগ্রেস সভাপতি দাদাভাই নওরোজী-র সেক্রেটারি হিসেবে কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্যপদ।

১৯০৯ : ইমপেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত।

১৯১০ : কানপুরে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্মেলন সংগঠন।

১৯১৩ : মুসলিম লীগের সদস্যপদ গ্রহণ।

১৯১৫ : লন্ডন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টা আরও জোরদার।

১৯১৬ : মুসলিম লীগ সভাপতি।

১৯৪০ : লাহোর প্রস্তাব গৃহীত।

১৯৪৭ : ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৪৮ : ১১ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল।